তোমার জীবনে লভি এ জীবন

কৃষ্ণানুসরণ

কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্

ঘনশ্যাম দাস

প্রজ্ঞা

৭ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশঃ ১১ই জনু, ১৯৬৫

প্রকাশক ঃ
শ্রী অশোক রায়, প্রজ্ঞা প্রকাশনী,
৭ নং, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

মনুদ্রণ ঃ টেম্পল প্রেস, কলিকাতা-৪
চিত্রমনুদ্রণে—এডকো, কলিকাতা-৯

সূচীপত্র



वसुदेवसुतं देवं

कंसचाणूरमर्दनम्

देवकीपरमानन्दं

कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।

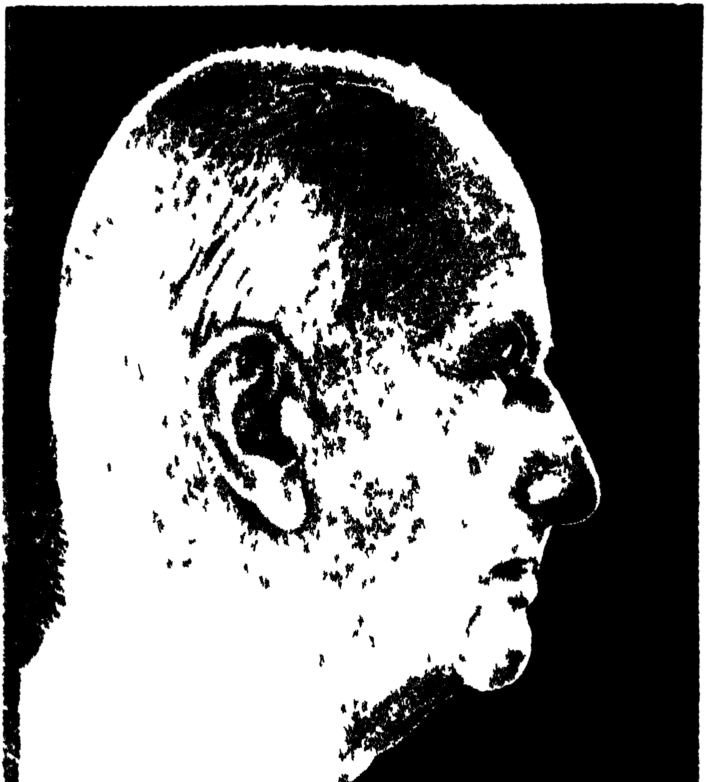
I salute Krishna, the Teacher of the Universe, the Divine son of Vasudeva, the destroyer of Kamsa and Chamura, the supreme joy of Devaki.

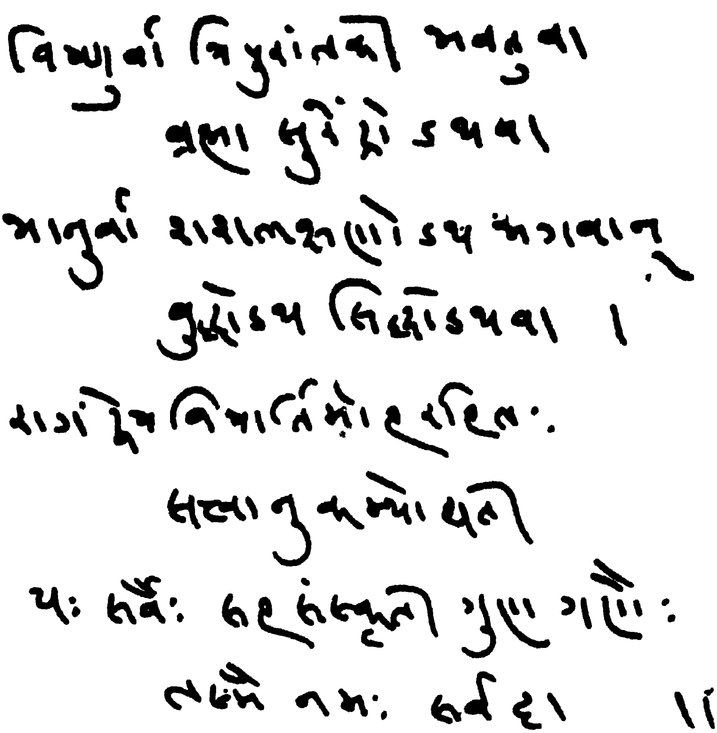
বন্দনা করি কৃষ্ণেরে যিনি জগদ্গুরু

বসুদেবের পুত্র যিনি

কংস ও চাণূর মর্দনকারী

দেবকীর পরম আনন্দদায়ী।





বিষ্ণু অথবা হোন্ তিনি ত্রিপুরারি
ব্রহ্মা ইন্দ্র অথবা হোন্ না কখনও তিনি মুরারি
সূর্য হোন্ বা শশলাঞ্ছন, ভগবান্ কিবা বুদ্ধ,
সিদ্ধ হোন্ বা হোন্ কেন না বা জগতে সুপ্রসিদ্ধ
প্রণাম মোদের রহিল নিয়ত তাঁরই উদ্দেশে শুধু ;
রাগদ্বেষের বিষ ও আর্তি মোহ হ'তে যিনি মুক্ত
সকল জীবের প্রতি করুণায় সদা যিনি উদ্যুক্ত—
এমনই সকল গুণগণে যাঁর চিত্ত সুসংস্কৃত ॥



পিছন পানে

কয়েক বৎসর পূর্বে হিন্দীতে আমি নিজের কিছু স্মৃতিকথা লিখেছিলাম। এই প্রয়াসের পিছনে কোনো কারণ ছিল, এমন আমার মনে হয়নি তখন। যা কিছু আমি লিখেছিলাম তা শুধু নিজের মনের আনন্দের জন্যই লিখে ফেলেছিলাম। আর মধ্যে কোনো সুসম্বন্ধ শৃঙ্খলাও ছিল না। হয়তো তার ঐটিই গুণ ছিল। যা হোক্, আমি যা কিছু লিখেছিলাম তা ছাপা হয়ে গেল এবং ছাপার পর যারা ঐটি পড়েন, তাঁদের ঐ লেখা ভালও লেগে যায়।

আমি বলেছি যে এই স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করার পিছনে কোনো কারণ ছিল না আমার তরফ থেকে, যদিও এ কথাও কত দূর সম্পূর্ণ সত্য, তাও আমি বলতে পারব না। কারণ, কিছু কিছু এমন মানসিক সংকল্প থাকে, যাদের কোনো হদিশই পাওয়া যায় না, যতক্ষণ না আমরা নিজেদের অন্তরের গভীরে অবতরণ করতে পারি।

মন এমন এক আশ্চর্য পাখী, যে না সে নিজে নিজের পুরো আয়ত্তে, না এর সম্পূর্ণ পরিচয় তার নিজের গোচর। মনের সংকল্প বিকল্প এমন দ্রুত বেগে ধাবমান যে নিজের কাছেও এর ঠিকানা মেলে না যে এ পাখী কোথায় না কোথায় উড়ে বেড়াচ্ছে!

সেই কারণে যতক্ষণ না আমরা সজাগ হয়ে এই মনের প্রত্যেকটি অন্ধি-সন্ধি আনাচ-কানাচ ভালমত যাচাই করছি, ততক্ষণ আমাদের পুরো সন্ধানও মেলে না যে আমাদের অজ্ঞাতসারে কত না কারণ, কত না বাসনা আমাদের ভিতর লুকিয়ে আছে, যারা আমাদের অকস্মাৎ জোর করে যেখানে-সেখানে অবিশ্রান্ত গতিতে যেন ঠেলে নিয়ে যায়। সেই জন্য আমার মনে হয় যে জ্ঞাতসারে না হোক অজ্ঞাতসারে আমার ঐ প্রয়াসের পিছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ থেকে থাকবে।

পুরানো মানুষদের সকলেরই একটি দুর্বলতা আছে। সেটি হল এই যে তাঁদের নিজেদের অতীতের দিকে যাত্রা করতে বড় রস লাগে। তার কারণও আছে। বৃদ্ধের সামনে এক উঁচু দেওয়াল। একটি কালো পর্দা সামনে ঝুলানো আছে। সেই দেওয়াল বা পর্দার ওপারে কি আছে, তা জানা নেই কারণ তা ইন্দ্রিয়গোচর নয়। বৃদ্ধ সে সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ। তার কাছে তাই যেটুকু পুঁজি তা শুধু নিজের অতীতটুকু। সে তাই নিজের অতীতেরই গাথা গেয়ে চলে আর তাতেই সে রস পায়।

বৃদ্ধের অতীত যখন বর্তমান ছিল সেই সময় সেই বর্তমানের গর্ভে লুকিয়ে ছিল এক ভবিষ্যৎ। কিন্তু তখন যা ভবিষ্যৎ ছিল তা এখন অস্ত-গামী হয়ে অতীতে পরিণত হয়েছে। তাই এখন বৃদ্ধের কাছে শুধু অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে অতীত অথবা এক জর্জরিত বর্তমান। সেই বর্তমান-কেও এমন এক সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমিত করে দিয়েছে যে তার বাইরে বা তাকে ছাপিয়ে যা কিছু দৃশ্য, বৃদ্ধের কাছে তা অদৃশ্যই হয়ে আছে। তাই তার কাছে আর উল্লাস বা উৎসাহের কোনো উপকরণই অবশিষ্ট নেই।

আর অপরদিকে জোয়ানের সামনে রয়েছে একেবারে ঠাসা রত্নভাণ্ডার ভবিষ্যতের। তাই সে ভবিষ্যতের স্বপ্নলহরীর মধ্যেই সতত সঞ্চরণ করে থাকে, মনের নানা রঙীন স্বপ্ন দেখে, পরিকল্পনা রচনা করে আর সেই সব সুখ-স্বপ্নের প্রবাহে ডুব দিয়ে দিয়ে উল্লসিত হতে থাকে।

যুবা ও বৃদ্ধের মনের ছবির মধ্যে এই দিন-রাতের মত পার্থক্য। যুবার কাছে ভবিষ্যৎ আছে, বৃদ্ধের কাছে আছে শুধু অতীত। বৃদ্ধ আর ভবিষ্যতের কোনো স্বপ্ন রচনা করতে পারে না। কিন্তু তারও তো কিছু রসের খোরাক চাই। তাই সে অতীতে বিচরণ করেই রস সঞ্চয় করে থাকে।

বৃদ্ধের অবস্থা যেন এক চিত্রকরের মত। সে ছবি আঁকে। আবার পিছু হটে এসে দূর থেকে আবার সেই ছবিটি দেখে এবং তাতে আরও নতুন নতুন রং লাগায় এবং মনে মনে খুশি হয়। আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আরও একটু রং লাগিয়ে আবার পিছু হটে এসে যাচাই করতে চায় রংটা ঠিক লেগেছে কিনা, ছবিটা পুরো সুসজ্জিত হয়েছে কিনা। বৃদ্ধের ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়া তাই ঐ মনোভাবের অনুরূপই হয়ে থাকে।

আসলে আমিও তো সেই পুরানোরই দলে, তাই আমারও আপনা-আপনি সেই অতীতেই রস পাওয়া তো বাধ্যতামূলক বা স্বাভাবিক। সেই রসই সম্ভবত আমাকে এই স্মৃতি কথা লিখতে প্রেরণা দিয়ে থাকবে। সেইটিই বোধহয় ছিল এর পিছনে মূল কারণ—এইটি মেনে নেওয়াই মনে হয় যুক্তিযুক্ত হবে।

যা হোক্—আসল কথা হল লেখা ছাপা হয়ে গেল এবং পাঠকদের তা পছন্দও হল।

তখন আবার বন্ধুদের আগ্রহ হল যে আমার জীবনবৃত্তান্তই বা আমি লিখব না কেন?

কোন আমি ?

এই আগ্রহ আমার মনে সংকল্প-বিকল্পের এক নতুন তরঙ্গ জাগিয়ে দিল।

সব চেয়ে প্রথম তো এই প্রশ্ন জাগল যে, আমি যে আমার জীবন-বৃত্তান্ত লিখব, সে কোন্ 'আমি'র ? আমি বালক ছিলাম, অজ্ঞ ছিলাম। তার পর যুবক হয়ে এখন বৃদ্ধও হয়ে চলেছি। 'এক রাত্রে আমি জন্মেছিও বটে এবং মরেও গিয়েছি।' আমার তো কয়েকবার মৃত্যুও ঘটে গিয়েছে, আবার কয়েক-বার জন্মও হয়ে গিয়েছে। কখনও আমি সুস্থ ছিলাম, কখনও বা রুগ্ন। কখনো শান্ত প্রসন্ন, কখনো বা উদ্বিগ্ন, চিন্তিত—যেমন বলে 'ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্ট'। নতুন নতুন রং এসেছে জীবনে, আবার তারা চলেও গিয়েছে। তা হলে সে কোন্ 'আমি' ছিল, যার কাহিনী আজ আমি গাইব ?

এই প্রশ্ন কোনো কোনো বন্ধুর কাছে সম্ভবত 'ভারিক্কি' পণ্ডিতিপনা বলে বোধ হয়ে থাকবে। কিন্তু যখন কোনো লেখক নিজের চিন্তারাজিকে লিপিবদ্ধ করতে বসে, তখন অন্তত তার মাথা তো পরিষ্কার থাকা চাই। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে সংকটে পড়েছে যে-লেখক সে লিখবেই বা কি ?

একে যেন নিজেরই চুল ছেঁড়া বলা যেতে পারে। এমন বলাতে লোকে হয়তো আমাকে উপহাস করবে, কিন্তু তবু আমি নাচার। যে-প্রশ্নের আমি সম্মুখীন, তার সমাধান কি করে করি ? যা হোক্—এই তো হল এক বাধা। প্রশ্নের যতক্ষণ নিরসন না হচ্ছে, ততক্ষণ তো গাড়ী আর এগুতে থাকবে না।

দ্বিতীয় আর এক প্রশ্নও জাগে যে নিজের জীবন-বৃত্তান্ত লেখার উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য কি ? কেবল মনের আনন্দ ? কোনো কোনো বন্ধু এমনও বললেন যে আমার জীবন-কথা আধুনিক নতুন স্তরের মানুষের পক্ষে এক দীপ-শিখার কাজ করবে।

মনের আনন্দের কথাটায় কিছু সত্য আছে ঠিকই এবং আমিও তার সঙ্গে

একমত। কিন্তু অন্যের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ হতে পারে, এমন মনে করাটা আমার পক্ষে মূঢ়তা বা মূর্খামি হবে। মনের আনন্দজনক এবং শিক্ষাপ্রদ—এ দুটি যেন কিছু দূর পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণের মত দুই বিপরীত মেরুনিবাসী। এ দুটিতে পুরো মিল নেই। মনের আনন্দের জন্য নিজের জীবনের মিষ্ট সুখকর ঘটনারই স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু সে—জাতীয় লেখা গভীরতার দিক দিয়ে অনেক পিছনে পড়ে থাকে। তাতে খুব জোর কিছু বিনোদন, কিছু মনের তৃপ্তি মাত্র মিলতে পারে: বিফলতা এবং তিক্ততার যে অনুভব তা অন্যের কাছে সতর্ক বা সাবধান হবার প্রেরণা দিতে পারে কিন্তু তা নিজের কাছে নিজেকে কখনই আনন্দের খোরাক দিতে পারে না।

এই দুটি কারণের লক্ষ্যও ভিন্ন ভিন্ন। এই কারণে মনের আনন্দজনক কথা তো আমি নিজের জন্য সুরক্ষিত করে রাখতে পারি। কিন্তু আমার জীবন-বৃত্তান্ত শিক্ষাপ্রদ হবে কিনা, এ বিষয়ে আমার পুরোপুরি সন্দেহ আছে।

কথাটা হল এই যে নিজের চরিত্র-লেখক কোনো ব্যক্তি, সে যতই না কেন সম্মানিত বা শ্রদ্ধেয় হোক্ না কেন, যদি মনে করে যে আমার আত্ম-কথা অন্য সব লোকের পক্ষে দীপশিখার কাজ করবে বা জনগণকে পথ দেখাবে, তা হলে সে নিজের জীবনের এক মিথ্যা মূল্যায়নই করছে বলতে হবে এবং নিজেকে নিজে প্রতারণাও করছে।

আমি একবার মহামনা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়কে বলেছিলাম: 'পণ্ডিতজি, আপনি আপনার একটি জীবন-চরিত লিখুন।' মালবীয়াজীর জীবন আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি সজ্জন, ক্ষমাশীল, সুপণ্ডিত এবং চরিত্রবান্ একটি মানুষ ছিলেন। আমার মনে হত তাঁর মধ্যে এমন অনেক গুণ আছে, যা লোকের কাছে অনুকরণীয়। এই কারণেই আমার তাঁকে এই সাগ্রহ অনুরোধ।

উত্তরে পণ্ডিতজি বললেন: 'ঘনশ্যামজি (আমাকে এই নামেই তিনি ডাকতেন), জীবন-চরিত পড়তে হয় তো শ্রীমদ্ভাগবত পড়ো। আমার জীবনে কী-ই বা আছে?' এই কথাগুলি আমার অন্তরে এমন গেঁথে গেল ঠিক যেমন কোনো তীর লক্ষ্যস্থলে বিঁধে যায়।

তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল এবং তা আমার মনের উপর স্থায়ীভাবে অঙ্কিত হয়ে গেল। যদি শিক্ষাপ্রদ চরিত্র পড়তে হয় তো পৌরাণিক নানা চরিত্র পড়লেই তো হয়।

অনেক শিক্ষাপ্রদ চরিত্র পুরাণসমূহে যেন ঠেসে ঠেসে ভরে দেওয়া আছে।

হাজারও বছর ধরে মানুষ এই সব চরিত্র পড়ে আসছে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লাভবান্‌ও হয়ে আসছে।

ব্যাসদেব বেদগুলির সম্পাদন করেছেন এবং সেই অনুভবের আধারেই সাধারণ লোকের মঙ্গলের জন্য মহাভারতের রচনা করেছেন এবং তারপর ভাগবতের। তাঁর এই সমগ্র প্রয়াস শুধু জনকল্যাণের জন্যই।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে ব্যাসদেব অনেক মহাপুরুষের চরিত্র তো লিখলেন কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কোনও বিবরণ দেননি কোথাও।

ব্যাসদেবকে তেমন প্রেরণা দেবার বোধহয় কোনো লোক মেলেনি যে তাঁকে বলতে পারত, 'ভগবান্‌! আপনি আপনার জীবন-চরিত লিখুন'। যদি তেমন কারও আগ্রহ হত তা হলে তাকেও ব্যাসদেব সেই উত্তরই দিতেন যা মালবীয়জি আমাকে দিয়েছিলেন।

না তো ব্যাসদেব নিজের সম্বন্ধে কিছু লিখলেন, না উপনিষদের রচয়িতারা নিজেদের কোনো ইতিহাস রচনা করে গেলেন। এই যে নিস্পৃহতার মনোভাব প্রাচীনকালে হাজারো বছর ধরে চলে এসেছে তারই অনুসরণ করেছেন ভগবান্‌ বুদ্ধ, আচার্য শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব এবং অন্যান্য আচার্যগণও। তুলসীদাস, কবীর, মীরাও তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এই ধারা বা রীতি বিগত পাঁচশো বছরে বদলে গিয়েছে।

যখন লিপ্‌টন কোম্পানী বলল যে আমার চা সর্বশ্রেষ্ঠ, তখন থেকে সাধারণ মানুষও নিজের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ঢোল পিটাতে সুরু করল (অর্থাৎ এখন সুরু হয়ে গিয়েছে বিজ্ঞাপনের যুগ)! আজকালকার আত্মজীবনী লেখকদের এই হল দৃষ্টিভঙ্গী।

আত্মজীবনী লেখকদের মধ্যে অধিকাংশেরই এখন এই মনোভাব যে নিজের একটি সুন্দর ছবি খুব সাজিয়ে-গুজিয়ে পাঠকদের সামনে তুলে ধরবে, যা তাদের মুগ্ধ করবে এবং তাদের প্রশংসার প্রমাণ-পত্র অর্থাৎ সার্টিফিকেট লুটে আনবে।

কিন্তু পাঠকরাও নিরেট বোকা নয়। তারাও এখন বেশ সজাগ, সচেতন হয়ে উঠেছে। তাদের অত সহজে ধাপ্পা দেওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও আত্মজীবনীকারদের লোকৈষণার কামনা তো তেমনি বজায় আছে। আর তাঁরা এই মোহের বশবর্তী হয়ে এটাও ধরে নেন যে আমি যা লিখব, তা নিশ্চয়ই পাঠকদের স্বীকৃতি লাভ করবে। এই কারণে নিজের কাহিনী লিখতে গিয়ে লেখক নিজের দুর্বলতার উপর পরদার আড়াল দিয়ে তা লুকিয়ে ফেলতে চায় আর নিজের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সাধারণ গুণকেও বাড়িয়ে-চাড়িয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে লিখে থাকে। এইরকম আত্মচরিত শিক্ষাপ্রদ হতে পারে, এমন মনে করা নিতান্ত মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়।

জীবনী-প্রসঙ্গে

য়ুরোপ ও আমেরিকার কিছু লেখক বিশিষ্ট পুরুষদের আলাদা জীবনীও লিখেছেন এবং তাতে তাঁরা সেই জীবন কাহিনীর নায়কদের প্রায় যথাযথ চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। দুর্বলতার উপর পর্দা টানার প্রয়াস করেননি। গুণ ও দোষ সব কিছুরই বিচার-বিবেচনা করেছেন। এমন চরিত্র সত্যই পঠনীয় কারণ তাতে পাঠকের পক্ষে নায়কের ভাল ও মন্দ দুদিকেরই পরিচয় লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু এ সাহিত্যও সাময়িক বা তাৎকালিকই হয়ে থাকে। কিছু কাল পরে কেবল ইতিহাসেই তার স্থান থেকে যায়, তা-ও মাত্র দু-চারজন গোণা-গাঁথা চরিত্রের।

চার্চিল একজন মহান্ ব্যক্তি ছিলেন। আমারও তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট সম্পর্ক ছিল। আমার উপর তাঁর গভীর প্রভাবও পড়েছিল। আমার মত হচ্ছে যে চার্চিল না অলিতে-গলিতে জন্মান, আর না সব যুগেই প্রাদুর্ভূত হন। কিন্তু আমিও তো চার্চিলকে ততটুকুই পেলাম যতটুকু তাঁকে আমি নিকট সম্পর্ক থেকে দেখেছি। চার্চিলের তো আর এক মূর্তিও ছিল। লর্ড মোরন চার্চিলের নিজস্ব ডাক্তার ছিলেন। তিনি চার্চিলের কথা লিখেছেন, তা কিন্তু তেমন সুন্দর নয়। লর্ড মোরনের সঙ্গে চার্চিলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই-জন্য তিনি তাঁর দোষগুলিও জানতেন। তিনি তাঁর দোষগুলির বর্ণনাও দিয়েছেন। ফলে পাঠকদের সামনে তাঁর দুটি দিকই এসে গিয়েছে। এ জাতীয় জীবন-চরিতের স্থায়িত্ব যদি না-ও হয় তবুও তা নিশ্চয়ই মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে থাকে।

রুজ্‌ভেল্ট্‌ও একজন মহান্ পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর চরিত্র-লেখক এ কথাও বলেছেন যে রুজ্‌ভেল্ট্‌ বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অন্য এক মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির মানদণ্ড

অনুসারে তো তিনি ব্যভিচারী পুরুষ ছিলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের এ সব দোষে চমকে উঠতে বা নজর দিতে নেই, কারণ অস্থি-মাংসের এই পিন্ডটি গুণ ও দোষ দুয়েরই খনি। আমাদের ঋষি-মুনিরাও এ সব দুর্গুণ বা দোষ থেকে মুক্ত ছিলেন না।

বলা হয়েছে—

'জগৎকর্তা এই জড়-চেতন বিশ্বকে গুণদোষময় করেই সৃষ্টি করেছেন, সাধু-সজ্জনেরা হাঁসের মত তার থেকে গুণরূপ দুধটুকুই নিয়ে থাকেন, জলের বিকারকে পরিহার করে'।

এই কারণে তাঁদের দোষকে উদারতার দৃষ্টি দিয়ে উপেক্ষা করাই উচিত। তাঁদের গুণকে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। চার্চিল ও রুজভেল্টের গুণগুলিরই সমাদর করেছে সমাজ।

কিন্তু আসলে আমার যা বলার ছিল তা হল এই যে চার্চিল বা রুজভেল্ট্ যদি নিজেদের আত্মকথা লিখতেন তা হলে নিজেদের দোষগুলিকে খেয়ে বসতেন অর্থাৎ ঢেকে রাখতেন এবং তার ফলে আমরা তাঁদের আসল চরিত্রের জ্ঞান থেকে বঞ্চিতই থেকে যেতাম। এই সব বই থেকে সেই সব ব্যক্তিদের চরিত্র সম্বন্ধে পাঠকদের জিজ্ঞাসা বা কৌতূহল মিটে যায় সন্দেহ নেই, কিন্তু তারপর সেই সব বই কেবল আলমারীর শোভা হয়েই থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত এ সব চরিত্রের কোনো স্থায়ী মূল্য থাকে না।

আবার এমন কিছু কিছু লেখক আছেন যাঁরা নিজেদের দুরাচারের, যাকে বলে একেবারে পেট ভরে উজাড় করে, বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে রুসোর নাম সবচেয়ে আগে মনে পড়ে। তিনি ফ্রান্সের একজন উৎকৃষ্ট বিচারক ছিলেন। তিনি নিজের 'স্বীকৃতি' লিখেছেন এবং তাতে আগাগোড়া নিজের ব্যভিচারসমূহের নগ্ন চিত্র জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন। কিন্তু এত বড় এক পুঁথি তিনি কেন লিখতে গেলেন, আমাদের সংস্কৃতির দৃষ্টিতে, তা এক আজব কান্ড বলেই মনে হয়।

যা হোক্ রুসোর ব্যাপার রুসোই জানেন। এমনও বলা হয়ে থাকে যে তাঁর মনের ভিতরের বিক্ষোভই তাঁকে এই সব জঞ্জাল লিখতে বাধ্য করেছিল। কেউ কেউ আবার তাঁকে ধূর্ত ও লম্পটও বলেন। এমন কি সাহিত্যিক দৃষ্টিতে তাঁর রচনা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, যাকে আমরা টলাতে পারি না।

আলেকজান্ডার, জুলিয়স সীজর, হ্যানিবাল, অ্যাটিলা প্রভৃতির জীবনীও ইতিহাসের পন্ডিতেরা লিখেছেন। সেগুলিও কতটা তথ্যাভিত্তিক, তা বলা সম্ভব নয়। ঠিক সেইরকমই নেপোলিয়ন, হিটলার, মুসোলিনী প্রভৃতির

জীবনীও প্রকাশিত হয়েছে এবং সেগুলিরও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিবাদ বা সন্দেহ জাগতে পারে। তবে এই সব মানুষের জীবনী লেখার পিছনে লেখক-দের এইটিই উদ্দেশ্য যে জন-সমাজকে এই বলে সজাগ ও সতর্ক করে দেওয়া যে জোর-জুলুম করে নিজের সত্তাকে কায়েম করতে গিয়ে মদান্ধ হয়ে একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি কেমনভাবে ন্যায়-অন্যায়ের বিবেক বিসর্জন দিয়ে বসে এবং নিজের সত্তাকে অসৎভাবে কাজে লাগাতে পারে। পাঠকের এ শিক্ষাও মিলে যায় যে দুর্জনের দুর্গতি এবং সজ্জনের সুগতি অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দেশে শ্রুতি-স্মৃতি সব শাস্ত্র ডেকে ডেকে যেন জোর গলায় এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে এসেছেন এবং ইতিহাসও এরই সাক্ষী।

সক্রেটিস ও সেন্ট্ ফ্রান্সিস অফ্ অ্যাসিসিরও জীবনী আছে, কিন্তু তারও কোনো সত্য ভিত্তি আছে কিনা না তা শুধুই কিম্বদন্তী, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু তাঁদের জীবন-চরিত প্রামাণিক হোক্ বা না হোক্, তাঁদের বাণী তো প্রামাণিক বটেই। আর এই বাণীগুলিই তাঁদের জীবন-চরিতও।

তুলসীদাস, সুরদাস, মীরা, কবীর, সন্ত তুকারাম, সমর্থ রামদাস, জ্ঞানদেব ইত্যাদি ভক্তদেরও বাণীই তাঁদের জীবনী। এই বাণীগুলির উদ্দেশ্য হল শুধু এই যে সাধকদের যাতে উপকার হয়, জনসাধারণের নৈতিক স্তর যাতে উন্নত হয়। এই সব সাধু সন্তেরা নিজেদের জীবনী লিখে বৃথা নিজের শক্তি ক্ষয় করেননি। এ তাঁদের নিস্পৃহ স্বভাবেরই প্রকাশ।

এই সমগ্র বিশ্লেষণ থেকে সার কথা এই দাঁড়াচ্ছে যে যত যত জীবনী লেখা হয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটিই আলাদা আলাদা কারণেই লেখা হয়েছে। আলেকজান্ডার ইত্যাদির জীবনী কোনো উদ্বোধক সাহিত্য নয়, তবে বোধ-জনক নিশ্চয়ই এই কারণে যে অত্যাচারীদের কুকর্মের দিগ্‌দর্শন করিয়ে এ সবের মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্তকে পুষ্ট ও সুদৃঢ় করা হয়েছে যে পাপের পতন অবশ্যম্ভাবী।

জীবনী—গুণদোষের খনি

এতখানি বিশ্লেষণ করার পরেও এটা স্বীকার করতেই হয় যে আধিভৌতিক অর্থাৎ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আলেকজাণ্ডার প্রভৃতির বা অন্য নীতিবিশারদ নেতাদের বা উদ্যোগপতিদের, শিল্পপতিদের জীবনীরও মহত্ত্ব আছে, যাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। বর্তমানে যে সামান্য সৈনিক হয়ে বা নীতিজ্ঞ হয়েও নেতৃত্ব করতে চায় তার কাছে এই সব জীবনী থেকে প্রচুর মাল-মশলা মিলে যায়। ঠিক তেমনি যে অর্থ উপার্জন করে যশস্বী হতে চায়, তার কাছেও ফোর্ড বা কারনেগীর জীবনী থেকে অনেক সার্থক ইঙ্গিত মিলে যায়।

কিন্তু এ সমস্ত সাহিত্যই হল সাময়িক। এর কোনো স্থায়িত্ব নেই। এর কোনো নিত্যত্ব অর্থাৎ চিরন্তনত্ব নেই। পরিণামে এই সব বিশ্ববিজয়ীদের, বা অর্থপতিদের উদ্যোগের ফলও শেষ পর্যন্ত অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর বলেই প্রমাণিত হয়েছে। আলেকজাণ্ডারের বিজয় পরিণামে নিষ্ফলই প্রমাণিত হয়েছে। ফোর্ড, কারনেগী প্রভৃতি অঢেল অর্থ উপার্জন করেও নিজের যশকে স্থায়িত্ব দিতে পারেন নি। অনিত্য বস্তুর নাশ তো হয়েই থাকে।

সেই কারণে আমাদের নীতিশাস্ত্রে এই জাতীয় সাহিত্যকে কোনো স্থায়ী স্থান দেওয়া হয়নি। বেদান্ত বা ভারতীয় নীতিশাস্ত্র—যাকে ভাগবত ধর্মও বলা হয়ে থাকে,—যুদ্ধে জয় বা অর্থপ্রাপ্তির যশ বা গৌরবকে উপেক্ষা করেনি। কিন্তু তার উপযোগিতা স্বীকার করতে গিয়ে আমাদের নীতিশাস্ত্র একটি সর্ত বেঁধে দিয়েছে যে এই সব প্রচেষ্টা যদি লোককল্যাণ বা লোকসংগ্রহের জন্য হয়, তা হলেই তা গ্রাহ্য। আর যদি কেবল আসক্তি বা লোলুপতার বশে সাম্রাজ্য স্থাপন করাই লক্ষ্য হয় বা ধন সংগ্রহ করে নিজে কুবের হব এই বাসনাই থাকে তা হলে সে-কর্ম অর্থহীন, নিষ্ফল এবং সর্বথা ত্যাজ্য।

এর তাৎপর্য হল এই যে মহাভারতের যুদ্ধ এবং হিটলারের মহাযুদ্ধ—এই দুইয়ে কোনো সাদৃশ্য নেই।

একটির পিছনে সদ্ উদ্দেশ্য ছিল, যে-কারণে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথ পরিচালন করে ধনঞ্জয়কে প্রেরণা দিয়েছিলেন। আর অপর এই জাতীয় যুদ্ধের পিছনে শুধু ছিল দুর্বাসনা, যাতে শুধু কেবল যোদ্ধৃবৃন্দের ও সংসারের বিনাশ ঘটিয়েছে এবং জগতের কোনো কল্যাণই সাধিত হয়নি।

সেইজন্য আমাদের নীতিশাস্ত্রের মতে সেই জীবন-বৃত্তান্তই সার্থক, যা থেকে কল্যাণপ্রদ শিক্ষা লাভ করা যায়। এই সব জীবন-বৃত্তান্তেরই স্থায়িত্ব চির সুস্থির এবং তার প্রমাণও এই যে হাজারো বছর ধরে এই জাতীয় সাহিত্যের প্রচলন অবাধিতরূপে এই ভারতভূমিতে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তার দ্বারা জনগণের কল্যাণও সাধিত হয়েছে।

অর্জুনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার সময় শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে এই যুদ্ধ তুমি অনাসক্ত হয়ে, লাভক্ষতির দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে শুধু নিজের কর্তব্য মনে করেই করো। তা হলেই কেবল তুমি এর দোষ থেকে মুক্ত হতে পারবে। এর শেষ পরিণাম মঙ্গলই হয়েছিল।

সক্রেটিস্ প্রভৃতির জীবনী ও তাঁদের বাণী জনকল্যাণের জন্য লিখিত হয়েছে এবং তা সুরক্ষিতও করা হয়েছে। এই সব সৎপুরুষের শুভ বিচার সমাজকে প্রেরণা দিয়েছে এবং মানুষের মনুষ্যত্বকে উন্নীত করেছে।

ব্যাসদেবও যা কিছু লিখেছেন তা লোক কল্যাণের জন্যই লিখেছেন। ভক্ত-দের চরিত্রকেও ব্যাসদেব জন-কল্যাণের জন্যই একটু বেশি রং চড়িয়ে চিত্রিত করেছেন।

কামেরায় যে ছবি ওঠে, তা মোটামুটি সঠিকই হয়ে থাকে। কিন্তু বিশিষ্ট শিল্পী তাকে যেন অবজ্ঞা বা তিরস্কারের দৃষ্টিতেই দেখে থাকেন এবং হেয় বা তুচ্ছ মনে করেন আর শিল্পকলার মধ্যে তাকে কোনো স্থানই দেন না। তাঁদের যা বক্তব্য তা একদিক থেকে সঠিকও বটে যে মানুষের শরীরটুকুর ছবিই তার সম্পূর্ণ চিত্র হতে পারে না। একজন ব্যক্তি শুধু মাত্র পঞ্চভূতের ভৌতিক মূর্তি তো নয়, তার ভিতর মন বুদ্ধিও আছে তার আত্মাও আছে। পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক সত্তার সমষ্টি। কেবল মাত্র পার্থিব দেহের ছবি ব্যক্তির সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে প্রকট করতে পারে না কখনও। সেই কারণে যখন কোনো উচ্চস্তরের শিল্পী কারুর ছবি আঁকেন, তখন সেই মানুষটির স্বভাব ও তার আত্মার ঝলকও তাতে প্রতিফলিত করার প্রয়াস করে থাকেন এবং তা যথার্থও বটে। তার এই ভাবনাকে অনুসরণ করেই প্রাচীন

ঋষি-মুনিরা পৌরাণিক চরিত্রকে কেবল ভৌতিক দৃষ্টি দিয়ে নয় কিন্তু প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেই লিখেছেন।

এই কারণে ঋষিগণ যে সব চরিত্র অঙ্কিত করেছেন তাতে আরাধ্যদেবের শরীরের বর্ণনা তো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও নগণ্য কিন্তু তাঁদের আচরণের উপরই বিশেষ করে রং লাগান হয়েছে অর্থাৎ উজ্জ্বল করে তুলে ধরা হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে। ময়ূর মুকুট, পীতাম্বরের বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রংয়েরও বর্ণনা আছে তবে তা আবার একটু বিভ্রান্তিকরও বটে। শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম বর্ণের কথা বলা হয়েছে, আবার নীল পদ্মের মত বর্ণ বলা হয়েছে, মেঘবর্ণও বলা হয়েছে। এ সবই অলৌকিক বর্ণ, যা সাধারণত ঠিক কল্পনায় আসে না।

কিন্তু ঋষি-মুনিরা আসলে প্রাধান্য দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকে। ঋষিদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র পাঠ করে ভক্তদের ভক্তি জেগে উঠুক, তারা সৎপথে প্রেরিত হোক, এবং লোক-কল্যাণের প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে শক্তিশালী হয়ে উঠুক।

এইজন্য যে-সব দোষকে সাধারণ মানুষ দোষের মধ্যে অন্তর্গত বলে ধরে থাকে, সেই সব দোষগুলিও ঋষিরা গুণ হিসাবেই দেখিয়েছেন। এই রীতি-টিকেই নিজস্ব করে নিয়েছেন ব্যাস ও তুলসীদাস নিজেদের রচনায়। কালি-দাসও রঘুবংশে রঘুর দেহের সামান্যমাত্র বর্ণনা করে শেষে তাঁর চরিত্রকেই মহত্ত্ব দান করেছেন অর্থাৎ প্রধান রূপে ফুটিয়েছেন।

এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার জিনিস, কারণ পৌরাণিক চরিত্র-লেখক-দের একমাত্র লক্ষ্য ছিল শুধু লোক-কল্যাণ। সেইজন্য উপাস্য বা আরাধ্যের দৈহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে তাঁরা বিশেষ মহত্ত্ব দেননি। লোককল্যাণের জন্য আরাধ্যদেবের চরিত্রটিকে কাট-ছাঁট করে সম্পূর্ণ করে তোলার প্রয়াসই করেছেন তাঁরা। এইরূপ করার পূর্ণ অধিকার বা স্বাধীনতা তাঁদের ছিল। তবে সে-অধিকার কেবল ব্যাস এবং তুলসীদাস পর্যন্তই সীমিত থাকা উচিত।

কিন্তু তাই বলে নিজের আত্মজীবনী যে লিখবে তার এই স্বাধীনতা নেই যে সে তার নিজের খুশি মতো কেটে ছেঁটে সুন্দর করে একটি ছবি সাজিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করবে।

এখন এই বিশ্লেষণের পর কার এতখানি বুকের পাটা যে আত্মজীবনী লেখার দুঃসাহস সে করবে এবং তাতে সময় খোয়াবে?

তাই মালবীয়জীর সেই কথা একেবারে সঠিক পুরো ওজনদার কথা যে "জীবন-চরিত পড়তে হয় তো ভাগবত পড়ো"। আমি তার সঙ্গে আর একটু জুড়ে দিতে চাই, ভাগবতও পড়ো আর মহাভারতও।

কে পান করে নালার জল যখন ভরা আছে অমৃতের ভাণ্ড? যদি নির্মল গঙ্গাজল পাওয়া যায় তা হলে নোংরা পুকুরের জল কেন খেতে যাবে? এমন উদাত্ত চরিত্রদের ছেড়ে অন্য সব সাময়িক এবং অনিত্য জীবন-সাহিত্য থেকে জনগণের কী-ই বা উপলব্ধি বা প্রাপ্তি ঘটবে?

ভাগবত-ধর্ম না নারায়ণীয় ধর্ম

পণ্ডিত মালবীয়জি বলেছিলেন জীবন-চরিত পড়তে হয় তো ভাগবত পড়ো। এই প্রসঙ্গটির আর একটু আলোচনা প্রয়োজন মনে হচ্ছে।

হিন্দুরা মনেন যে বেদ অনাদি, স্বয়ংসম্বদ্ধ এবং অপৌরুষেয়। যদি 'বেদ' শব্দের অর্থ একটু ব্যাপকরূপে গ্রহণ করা যায় তা হলে তা ঠিকই আছে। কেননা, 'বেদ' শব্দের অর্থ হল 'জ্ঞান' এবং জ্ঞান অনাদি ও অপৌরুষেয়।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন বা এডিসন বিদ্যুৎকে প্রত্যক্ষরূপে দেখালেন কিন্তু তার আগেও তো বিদ্যুতের অস্তিত্ব ছিলই। সেই হিসাবে বলা যায় বিদ্যুৎ অনাদি এবং অপৌরুষেয়। ঠিক তেমনই বেদও অনাদি এবং অপৌরুষেয়।

কিন্তু বেদের যদি সংকুচিত অর্থ গ্রহণ করে কেবল সংহিতার মধ্যেই তাকে সীমিত বলে মানি, তা হলে সে-হিসাবে ইতিহাসের পণ্ডিতগণ তো সেই সংকলনের কালও নির্ণয় করে দিয়েছেন। সেইজন্য তাঁদের হিসাব অনুসারে বেদের সংহিতাসমূহ অনাদি নয়। কিন্তু এর সবটাই অনুমান মাত্র। যদিও আমরা বলতে পারি না যে এ অনুমান সর্বথা অমূলক।

শাস্ত্র অনুসারে বেদের সংকলন এবং তাদের সম্পাদন করে চারটি সংহিতাতে বিভাগ করার কৃতিত্ব ভগবান্ বেদব্যাসের। তাঁর এই প্রয়াসের ফলে বেদবিদ্যা সাধারণ লোক এবং সমাজের পক্ষে সুগম ও সুলভ হল তা নিশ্চয়ই কিন্তু এই সম্পাদন করা হয়ে গেলেও ব্যাসদেবের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হল না। তার কারণ এই সংকলনের পরেও বেদ সাধারণ অশিক্ষিত সমাজের বোধের বাইরের ক্ষেত্র হয়েই রয়ে গেল। সর্বসাধারণকে সরল সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বেদের জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করানোই ব্যাসদেবের সব চেয়ে প্রিয় লক্ষ্য বা ধ্যেয় বিষয় ছিল এবং তারই উদ্দেশ্যে, সেই লক্ষ্য পূর্তির জন্যই পরে তিনি মহাভারতের রচনা করেছিলেন।

বলা হয় যে তিনি বিশাল বদরিকাশ্রমের কোনো এক নিভৃত একান্ত স্থলে বসে এই মহাভারত রচনা করেছিলেন। মহাভারত কবে রচিত হয়েছিল, তা সঠিক বলা কঠিন, তবে ইতিহাসের পণ্ডিতরা বলে থাকেন যে মহাভারতের কাল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী বা তারও অনেক আগের। প্রারম্ভে এই গ্রন্থের নাম ছিল 'জয়', পরে 'ভারত' নামটি চালু হয়ে যায় এবং তার পরে কলেবর বৃদ্ধি হয়ে এই গ্রন্থ 'মহাভারত' এই নামে প্রখ্যাত হয়ে গিয়েছে।

মহাভারত আসলে এক অনুপম গ্রন্থ—এ কথা সর্বসম্মত। এর মধ্যে বেদান্ত এবং লোকশাস্ত্র দুইয়েরই সমন্বয় ঘটেছে। ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র—সব কিছুরই সমাবেশ ঘটেছে এতে। দেবর্ষিরা মূল্যায়নে ওজনদাঁড়িতে এক দিকে রাখলেন চার বেদ আর এক পাল্লায় মহাভারত, ওজন করা হলে দেখা গেল মহাভারতই ভারী। এ কথা কবির কল্পনা হলেও এতে সত্য আছে। ব্যাসদেব একে 'সূক্ষ্মার্থন্যায়যুক্ত এবং অনেক সময়ান্বিত' বলে বর্ণনা করেছেন। এ কথাও বলেছেন: 'যা কিছু মহাভারতে আছে তার সব কিছুই অন্য গ্রন্থে যত্র তত্র পাওয়া যেতে পারে কিন্তু যা মহাভারতে নেই, তা আর কোথাও পাওয়া যাবে না'। 'যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ'।

সংসার-যাত্রার যাত্রীদের যাত্রার প্রসঙ্গে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সেই সব কঠিন দুরূহ পরিস্থিতি উপস্থিত হলে মহাভারতে বর্ণিত বিশিষ্ট পুরুষেরা সেই পরিস্থিতিতে কিরকম আচরণ করেছিলেন, সেই সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কিভাবে তার সমাধান করেছিলেন পাঠকদের তা উপলব্ধি হয় এবং যে-প্রেরণা ও শিক্ষা সেই বিবরণ থেকে জিজ্ঞাসুরা পেয়ে থাকে তা অন্য পুরাণে পাওয়া কঠিন।

এটি সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে মহাভারত এমন এক অদ্ভুত পুরাণ ও ইতিহাসের কাব্য, যার তুলনা না সংস্কৃত না অন্য কোনো ভাষায় দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ পাওয়া যেতে পারে। সংসার-যাত্রাকে সুগম করবার জন্য যে কোনো মানুষের যা কিছু সহায়তা ও অবলম্বন প্রয়োজন, তার সব কিছুই মহাভারতের ভাণ্ডার থেকে পাওয়া যেতে পারে।

মহাভারত ভাগবত-ধর্মের প্রতিপাদক গ্রন্থ। ভাগবত ধর্মকে নারায়ণীয় ধর্ম নামেও বলা হয়ে থাকে। শান্তিপর্বের শেষে এই নারায়ণীয় বা 'ভাগবত ধর্মের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এর প্রাচীন পরম্পরারও সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। গীতাতেও ব্যাসদেব বলেছেন যে পূর্বকালে বিবস্বান্, মনু, ইক্ষ্বাকু প্রভৃতিরা এই ভাগবত ধর্মের অনুশীলন করেছিলেন এবং পরে তা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই নারায়ণীয় ধর্ম যখন লুপ্ত হতে চলেছিল তখন

মহাভারতের কালে আবার এর উদ্ধার করা হয়, এ কথা মহাভারত ও গীতা দুইয়েতেই বলা হয়েছে। এই জীর্ণোদ্ধারের কৃতিত্ব শুধু শ্রীকৃষ্ণেরই প্রাপ্য। সেইজন্য মহাভারত পাঠ করবার আগে নারায়ণ এবং নর উভয়কে নমস্কার করার বিধান দেওয়া হয়েছে—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

এইটি হল নমস্কারের প্রসিদ্ধ শ্লোক, যেটি প্রারম্ভে পাঠ করে তবেই মহাভারত পাঠ করার বিধান।





ভক্তি ও ভাগবত

কথিত আছে যে নর ও নারায়ণ, এই দুজন ঋষি ছিলেন। পরে আবার তাঁরাই কৃষ্ণ ও অর্জুন হয়ে অবতার গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের অবতার হওয়ার কারণও বলা হয়েছে এইটিই যে এই লুপ্ত এবং জীর্ণ ভাগবত ধর্মের অর্থাৎ প্রবৃত্তি-মার্গ বা নিষ্কাম কর্মের - যাকে কর্মযোগও বলা হয়ে থাকে - পুনরুত্থান করা। এই ভাগবত ধর্ম বা নারায়ণীয় ধর্মকে শাশ্বত ও ঐকান্তিক ধর্ম বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। শান্তি-পর্বে এই ধর্মের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে

নারায়ণপরো ধর্মঃ পুনরাবৃত্তিদুর্লভঃ।

প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ধর্মো নারায়ণাত্মকঃ

এই প্রবৃত্তিমার্গ নারায়ণীয় ধর্ম পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধক এক।

প্রবৃত্তিধর্মের তাৎপর্য হল সংসার ত্যাগ না করে আমরণ স্বার্থ ও কামনাশূন্য হয়ে অনাসক্তভাবে কর্তব্য কর্ম করে নিজের স্বধর্ম পালন করে যাওয়া। কর্মকে যেন কেউ কখনও ত্যাগ না করে [illegible] নিজের যে কর্তব্য-কর্ম, যা লোক-কল্যাণের [illegible] নিহিত বা নির্দিষ্ট, তার বিলোপ যেন না ঘটে। কর্মকে যজ্ঞ বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে যজ্ঞে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাই [illegible] করা। সার কথা হচ্ছে এই যে এই ভাগবত ধর্ম প্রবৃত্তিমার্গ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মের প্রতিপাদক এবং ভগবানের কৃপায় এই লুপ্ত ধর্মকে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় স্থাপন করেন।

মহাভারতের পাঠকগণের এবং বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণের আচরণ থেকে আমাদের এই কর্মযোগ সম্বন্ধে আশ্চর্য শিক্ষা লাভ হয়। সেই জন্য এই মহাগ্রন্থের পাঠ থেকে দুঃসময়ে জনসমাজ অনেক সাহস শক্তি ও ধৈর্যের অবলম্বন লাভ করে।

ভাগবতও ভাগবত ধর্মেরই প্রতিপাদক কিন্তু তাতে আর মহাভারতে এই হচ্ছে প্রভেদ যে মহাভারতে কর্মযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ভক্তিকে গৌণ স্থান দেওয়া হয়েছে। ভাগবতও নিবৃত্তি ধর্মের পৃষ্ঠপোষক নয়। তা-ও প্রবৃত্তিমার্গ এবং ভাগবত ধর্মেরই প্রতিপাদক সন্দেহ নেই কিন্তু তাতে ভক্তির উপর বিশেষ আগ্রহ বা ঝোঁক লক্ষ করা যায়।

এইভাবে মহাভারত এবং ভাগবত এই দুটি গ্রন্থ পড়লে কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ এই দুইয়েরই সম্যক জ্ঞান লাভ হয়ে যায়।

গীতা এই সম্পূর্ণতার দিকে আরও এগিয়ে গিয়েছে। কর্মযোগ এবং ভক্তি দুই-ই শেষ পর্যন্ত জ্ঞান লাভেরই সাধক বা সহায়ক। গীতাতে তাই এই দুইয়ের সঙ্গে জ্ঞানযোগকে সম্মিলিত করে জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি তিনেরই সমন্বয় সাধিত হয়েছে। গীতার এইখানেই সব চেয়ে বড় মহত্ত্ব বা মাহাত্ম্য।

যদিও গীতাতে কর্মযোগের উপরই আগ্রহ বেশি তবুও গীতায় কথিত কর্মযোগীর সঙ্গে ভক্তের আচরণে খুব বিশেষ পার্থক্য নেই। গীতা মহাভারতেরই অংশ, সেই কারণে সাধকগণের স্বধর্মাচরণে প্রেরণার জন্য মহাভারত এক অমূল্য গ্রন্থ।

কিন্তু এই অসাধারণ গ্রন্থটি লেখার পরও ব্যাসদেবের পূর্ণ তৃপ্তি হল না, তিনি সন্তুষ্টি লাভ করতে পারলেন না। তার কারণ মহাভারতও জনসাধারণের পক্ষে কঠিন ও দুর্বোধ্য হয়ে গেল। সেই সময়ের সমাজের মানসিকতা সম্বন্ধে আমরা প্রচুর অনভিজ্ঞ, তবে অনুমান করা যায় যে সেই সময়ের সমাজ সত্য ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্ধকারে পথসন্ধানে বিভ্রান্ত অবস্থায় দোদুল্যমান ছিল। সেই সময় এমন এক নতুন গতিবেগ সঞ্চার করার প্রয়োজন ছিল, যা সেই সমাজকে আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে এনে তার উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে।

বেদ সকলের বোধগম্য ছিল না, তাই তা পুরোহিতদের হাতে চলে গেল। নানা ধরনের যাগযজ্ঞেতেই যেন সমস্ত কর্তব্যের অবসান বলে মনে করা হতে লাগল। মহাভারত যদিও নীতি এবং ব্যবহারের অনুপম ভাণ্ডার এবং সুগমও বটে কিন্তু তবু তার মর্মও জনসাধারণের সকলের পক্ষে সুবোধ্য নয়। এই কারণটি উপলব্ধি করে ব্যাসদেবের মনে হল যে মহাভারতের চেয়েও আরও এক সরল সাহিত্য রচনা করা যাক, যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে এবং তাদের আচার-বিচারকে এক নতুন দিকে পরিচালনা করে তাদের নৈতিক উন্নতির সহায়ক হবে।

ব্যাসদেব নিজের এই অতৃপ্তি অসন্তোষের কথা নারদের কাছে প্রকাশ করলেন। ব্যাসদেব বললেন: 'নারদ! আমি মহাভারত তো লিখলাম কিন্তু

এতে শান্তি বা তৃপ্তি লাভ করতে পারলাম না।' তাতে নারদ বললেন: 'ভগবন্! আপনি মহাভারত লিখে লোকেদের পথ দেখবার জন্য প্রচুর উপকরণ দিয়েছেন, তাদের কল্যাণও করেছেন কিন্তু মহাভারতে আপনি কর্ম-যোগের উন্নত শিক্ষা দিয়েছেন কর্তব্য-অকর্তব্যের পথও বুঝিয়েছেন অথচ ভক্তিকে অবহেলা করেছেন। সাধারণ মানুষের না আছে বল বা শক্তি না আছে উপকরণ, না আছে তেমন বুদ্ধি বা আত্মবল, যার দৌলতে সে উচ্চ চিন্তাকে বিচার করে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে এবং তদনুসারে আচরণও করতে পারে। সেইজন্য তেমন মানুষ, যার কোনো সংস্কার বা শিক্ষা নেই, মহাভারতের চরিত্র থেকে কী শিক্ষা নেবে কী-ই বা গ্রহণ করবে আর কোন্ ক্ষেত্রেই বা তার অনুকরণ করবে এবং কোন্ আচরণকেই বা আদর্শ বলে মনে করবে বা ধরে নেবে? এইরকম সাধারণ সামান্য মানুষের জন্য ভক্তিই এক-মাত্র ঔষধ, যা নিম্নের চেয়েও নিম্ন শ্রেণীর মানুষকে উন্নত করতে পারে। এ পথ বড় সরল, সুগম, সহজ। এতে কোনো বাধা-বিঘ্নও নেই। তাই আপনি এমন কোনো একটি ভক্তি-গ্রন্থ লিখুন যাতে সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধাকে উদ্বুদ্ধ করে তাকে ভগবানের ভক্তির দিকে পরিচালিত করে।'

ব্যাসদেব নারদের এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করলেন।

ভজন ও ভক্তবৃন্দ

ভাগবত কবে লেখা হয়েছিল, সেটি বিবাদগ্রস্ত বিষয়। তবে বলা হয় পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্বে ভাগবত প্রচলিত ছিল। এমনও হতে পারে যে তার পূর্বেও এর অস্তিত্ব ছিল। ভাগবতও মহাভারতেরই মত ভাগবত ধর্মেরই প্রধান গ্রন্থ।

ভাগবত ধর্মের জনক হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকেই উল্লেখ করা হয়। ভাগবত ধর্ম অথবা পঞ্চরাত্র বা সাত্বত ধর্মের ব্যাখ্যা জ্ঞানী-গুণীরা করেছেন। এই শব্দটি প্রায় দু হাজার বছর বা তারও আগে থেকে প্রচলিত কিন্তু তার আসল তাৎপর্যের সঙ্গে সেই কালের লোকেরাই পূর্ণরূপে পরিচিত ছিলেন। বর্তমান সমাজের পক্ষে তার যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করা কঠিন।

যে সময় মহাভারত এবং ভাগবত ধর্মের উদয় হয় বলে যথা আগে উল্লেখ করা হল তখন বৈদিক ধর্মের মর্ম বা তাৎপর্য হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছিল। যেন দেহটা অর্থাৎ তার বাইরের কাঠামোটা সব ছিল কিন্তু তার আত্মা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বেদ কেবল পুরোহিতদের [illegible] হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যজ্ঞ শুধু হিংসা ও সোমপানের মধ্যেই [illegible] অবাধে হতে [illegible]য়েছিল।

এই পতনকে সামলানোর জন্য বেদ-পরম্পরাকে [illegible] ধাক্কা বা আঘাত দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সবপ্রথম এই ধাক্কা দেন ভগবান বুদ্ধ। এই ধাক্কার ফলে বেদের সঙ্গে বেদান্তের শিকড় বা মূলও শিথিল হয়ে গেল। তারপর শক, হূণ এবং যবনদের আক্রমণে বেদব্যবস্থা পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে গেল, সমাজও যেন দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। সেই অবস্থাকে সামলাবার জন্য অনেক চেষ্টা হল। সেই সব প্রয়াসের মধ্যে সব চেয়ে বড় প্রয়াস হল ভাগবত ধর্মের পুনর্গঠনের। এই সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে মহাভারত

ও ভাগবত-কথিত বৈদিক মার্গকে নবীন রূপ দিয়ে সঞ্জীবিত করার জন্য ভগবান ব্যাসদেবের প্রয়াসই ছিল সর্বোত্তম। যেমন বৈদিক ধর্মের অবক্ষয় ঘটল তেমনি বৌদ্ধ মতও শ্রমণ বা সন্ন্যাসীদের সম্পাত্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সমাজকে সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে যেন টেনে নিয়ে গেল।

ভাগবত ধর্মের উদয় এই পতনোন্মুখ অবস্থাকে সামলে নিল। মহাভারত, গীতা এবং ভাগবতের প্রভাবে ভাগবত ধর্ম গভীর শিকড় নিল কায়েম হল।

বৈদিক মার্গ বা পথকে পুনরুজ্জীবিত করার মূল অংশীদার হলেন আদি শঙ্করাচার্য। শঙ্করাচার্য অতি উচ্চ স্তরের জ্ঞানী ও বিচারশীল মানুষ ছিলেন। শঙ্করাচার্য এবং বৌদ্ধ মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য ছিল এই যে বুদ্ধের আত্মা এবং পরমেশ্বরের উপর বিশেষ আস্থা বা দৃষ্টি দেননি। সন্ন্যাসের উপরই বুদ্ধদেব আগ্রহ ছিল। শঙ্করাচার্যেরও সন্ন্যাসের উপর আগ্রহ তো ছিল কিন্তু তিনি সেই আদি শঙ্করের আত্মজ্ঞানের উপরই সবচেয়ে জোর দিয়েছেন।

মায়া দ্বারা মোহিত মানুষ দেহকেই 'আমি' বলে বুঝে থাকে। অন্তরাত্মা যে কেমন করে সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে সে বিষয়ে তার কোনো জ্ঞানই নেই। এই অজ্ঞানের দ্বারা সেই মানুষ জন্ম মরণচক্রে আবদ্ধ হয়ে থাকে এবং কেবল আত্মজ্ঞান লাভ হলে তবেই এই বন্ধন থেকে মুক্তি পায়।

আদি শঙ্কর ভাষ্যকে যে অবহেলা করেননি, তা তাঁর চতুর্থ অধ্যায়ের থেকেই বোঝা যায়। কর্মযোগের প্রতিও বেশ তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ ছিল বলে অনেকের বিভ্রান্তি হয় কিন্তু মনে রাখতে হবে ভারতের চার কোণে চারটি মঠস্থাপন যা তিনি করেছিলেন, তা বড় সামান্য কর্মযোগ নয়। সব সত্ত্বেও অনেকে শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে মনে করেন। সে যাই হোক এ বিষয়ে অন্তত কোনো সংশয় নেই যে বুদ্ধের পর এত বড় জ্ঞানী ও বিচারশীল ব্যক্তি আজ পর্যন্ত আর কেউ হননি। শঙ্কর বেদান্ত এবং ভাগবত-ধর্মে এমন এক প্রভাবের সৃষ্টি করেছিলেন যে তার ছাপ ভারতীয় জীবনে চিরতরে অঙ্কিত হয়ে রয়ে গিয়েছে।

আদি শঙ্কর নিবৃত্তির উপরই বেশি জোর দিয়েছেন। কর্মযোগের প্রতি অর্থাৎ স্বধর্মাচরণের প্রতি তাঁর আগ্রহ কম ছিল, অনেকে এইরকম মনে করেন। কিন্তু ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয় না।

শঙ্করের পর রামানুজ, মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য, নিম্বার্কাচার্য প্রভৃতি আচার্যগণও ভাগবত ধর্ম স্থাপনের উপরই জোর দিয়েছেন। এঁরা সকলেই

ভক্তি মার্গকেই প্রচার করেছেন, তবু এঁদের সকলেরই নিবৃত্তি-মার্গের উপরই ঝোঁক বেশি ছিল। এর পরে আরও অনেক ভক্ত জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

যেমন, দাক্ষিণে আলবার ভক্ত জন্মেছিলেন, বাংলায় শ্রীচৈতন্য এবং মহারাষ্ট্রে জ্ঞানেশ্বর ও তুকারাম, সমর্থ রামদাস প্রভৃতি অনেক ভক্ত এসেছেন, সুরদাস কবীর, নানক, নরসী মেহতা, মীরা, দাদু, রৈদাস প্রভৃতিকে ধরলে আরও অনেক ভক্ত ও সন্ত জন্মেছেন।

এই সব সন্ত এবং ভক্তগণ পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যেই একের পর এক জন্মগ্রহণ করে এই ঘনায়মান অন্ধকারের উপর যেন এক প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত করলেন এবং যে অন্ধকার ক্রমশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল তার শিকড়টি যেন শিথিল করে দিলেন।

সে যুগে না ছিল ডাক না ছিল তার বিভাগ। খবরের কাগজের তো কথাই নেই। এইরকম যোগাযোগের কোনো সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও ভক্ত-সন্তদের বাণী দেশের কোণায় কোণায় পোঁছে গেল, এ-ও ঈশ্বরেরই এক অলৌকিক মহিমা। সাধুসন্তদের এক প্রচলিত রীতি ছিল তীর্থযাত্রা করে বেড়ান এবং সেই যাত্রা উপলক্ষ্যে ভ্রমণ করতে করতে জনগণকে মঙ্গলময় বাণী পোঁছে দেওয়া। যখন তীর্থযাত্রায় বেরুতেন পথে ভজন-কীর্তন চলতে থাকত। সঙ্গে এক চলমান কীর্তন গোষ্ঠীও থাকত এবং যেখানে গিয়ে পোঁছুতেন সেখানকার গ্রামীণ জনগণও সেই ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে মিশে যেত, মিলে যেত। এই বিরাট জনসমাবেশ সারা রাত ধরে ভজনকীর্তন করত। এই রীতিতেই জনগণের মধ্যে ভক্তির প্রবাহ অব্যাহত হয়ে থাকত।

এই সব সন্ত-ভক্তগণ প্রচলিত ভাষায় সরল পদের মাধ্যমেই ভজনগুলি রচনা করেছিলেন, যেগুলি গেয়ে গেয়ে জনগণের মধ্যে ভক্তিভাব জাগ্রত হয়ে চলতে থাকল। এই পদগুলির জনপ্রিয়তার দরুণ এক মুখ থেকে অন্য এক মুখে তা অতি দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এই ধরনের রীতি অবলম্বন করে সন্তগণ এই অন্ধকারে নিমজ্জমান বিকৃত পরিস্থিতিকে সামাল দিলেন, এবং ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের পর বুদ্ধ, মহাবীর শঙ্কর এবং অন্যান্য আচার্যগণ যা বুঝে উপলব্ধি করেছিলেন সে সবের 'যোগক্ষেম' অর্থাৎ সুরক্ষার কৃতিত্ব এই ভক্ত-সন্তগণেরই প্রাপ্য। যা ছিল গীতা ও বেদান্তে তারই প্রতিবিম্ব বা প্রতি-ধ্বনি ছিল যেন এই সব ভক্তদের ভজন।

ভক্তদের এই সব পদাবলী যদিও মূলত ভক্তিরসাশ্রিত কিন্তু তবু এই সরল পদগুলির মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে তাঁরা বেদান্তের গূঢ়তত্ত্বও পোঁছে দিয়েছেন এবং শিখিয়েছেন।

তুলসীদাস তো এক আশ্চর্য কাণ্ডই করে বসলেন। ঘরে ঘরে রামকথা গুঞ্জরিত হয়ে উঠল।

একনাথ রামভক্তির আবেশে বলে উঠলেন: 'একমাত্র জনার্দনের ভাবই ঠিক, যা দেখো সবই রামের মত'। কবীর বেদান্ত শোনালেন: 'চোখ বুজব না, হেসে হেসে সুন্দর রূপ দেখব।' নানক বলছেন: 'স্তুতি নিন্দা দুই-ই ত্যাগ করে নির্বাণ পদ খুঁজে থাকে নানক বলে এ খেল বড় কঠিন। অতি বিরল কেউ গুরুর মুখ চেনে।' আবারও বলছেন: 'ফুলের মধ্যে যেমন গন্ধ বাস করে, আয়নার মধ্যে যেমন ছায়া বা প্রতিবিম্ব, তেমনি করে হরি নিরন্তর এই ঘটের অর্থাৎ দেহের মধ্যেই বাস করে থাকেন, সেখানেই খোঁজো তাঁকে ভাই।' 'কেন বনে খুঁজতে যাব?' নরসী মেহতা বলছেন: 'স্নান পূজা তীর্থ দান বেদ পাঠ এ সবই পেট ভরবার নানা ফিকির। তত্ত্বদর্শন ছাড়া এ সব হল তেমনই, যেমন [illegible] খাওয়া না।' মীরা বলছেন: 'যেদিকেই দেখি শ্যাম, তুমিই রাম'।

এইভাবে এই সব ভজনের দ্বারা সন্তগণ ভক্তি এবং বেদান্ত-জ্ঞান দুই-কেই জনগণের হৃদয়ে ভরে দিয়েছেন। এইভাবেই ধর্ম সংরক্ষিত হল।

এ এক অদ্ভুত অতুলনীয় ঘটনা, যার [illegible] সারা ইতিহাস খুঁজলেও পাওয়া কঠিন।

এই সব ভক্তবৃন্দ ভক্তি এবং নিবৃত্তির [illegible] উপর জোর দিলেও ভাগবত ধর্মকেও এগিয়ে নিলেন, যার মূলে ছিল কর্ম-যোগ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম এবং ভক্তির সংমিশ্রণ। এর ফলে ভাগবতের পরিণাম এই দাঁড়াল যে বর্তমান কালে ভারতীয় দর্শনে কর্মযোগ, জ্ঞান-যোগ এবং ভক্তিযোগ তিনটিই সমান সমাদর লাভ করে জনগণের কাছে এক উজ্জ্বল আলোক-বর্তিকারূপে আজও কাজ দিচ্ছে।

শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধ্ব আদি ও সন্তগণ ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রচারক হওয়া সত্ত্বেও সম্মিলিতরূপে সমাজের [illegible] সাধন করে এসে-ছেন। লোক-কল্যাণের নিগূঢ় [illegible]।

ব্যাসদেব ভাগবতে সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব বা বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে-ছেন যে বুদ্ধকে অবতাররূপে স্বীকৃতি দিয়ে এবং [illegible] উচ্চ স্থান দান করে মত-বিরোধের সব [illegible] দূর করে দিয়েছেন। এটা ভারতীয় সমাজের সব চেয়ে বড় উপকার হয়েছে। এইভাবে ভারতবর্ষের আচার্যগণের এবং সন্তগণের সম্মিলিত প্রয়াসে [illegible] আর্যধর্ম আজ হাজার হাজার বছর পরেও পূর্বাপর [illegible] জীবন্ত হয়ে। ভারতীয় সংস্কৃতির এই সুপ্ত শক্তি আমাদের আশাকে জোরদার করে থাকে।

কিন্তু ইতিহাসে ডুব দেওয়া আমাদের লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হল ভাগবত ধর্মের মূল ইতিহাস এবং তার প্রগতিকে প্রস্তুত করা এবং তার যথাযথ অনুধাবন করে উপলব্ধি করা।

ভাগবতও ভাগবত-ধর্মেরই প্রবর্তক। এতে ভক্তদের অনেক কথা আছে, ভক্তদের এবং শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক চরিত্রের বর্ণনা আছে। এর সমস্ত প্রয়াস সেই সমস্ত অবরুদ্ধ বা অবনত মানসিক স্তরকে সামনে রেখে এই দৃষ্টিতে করা হয়েছে যাতে ব্যক্তির হৃদয়ে ভক্তির প্রবল জাগরণ ঘটে, স্বধর্ম ও স্বকর্মে নিযুক্ত হবার প্রেরণা সে লাভ করে এবং ভগবানের প্রতি তার শ্রদ্ধা বাড়ে। ভক্তদের আকর্ষণীয় জীবন-বিবরণের পসরা এই কারণেই ভাগবতে সাজিয়েছে।

যোগ ও বিয়োগ

গীতা 'আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী' এদের সবাইকেই ভগবানের আরাধনাকারীর মধ্যে পরিগণিত করেছেন। এরা সবাই উপাসক তারাই ভাল। তবে এদের মধ্যে জ্ঞানীকেই সর্বোত্তম বলেছেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে বেশির ভাগই তো 'আর্ত' এবং 'অর্থার্থীর' কোঠায় পড়ে। যার যা হয় সে-ই হয় নিজের 'যোগ' অর্থাৎ প্রয়োজন পূরণের জন্য অথবা 'ক্ষেম' অর্থাৎ যা পেয়েছে তা রক্ষা করার জন্য ভগবানে তাঁর শরণ নেবে। এদের সবাইকেও গীতার প্রবক্তা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ উদারই বলেছেন কেননা যে কোন উদ্দেশ্যই হোক না কেন, ভগবানের স্মরণ সব অবস্থাতেই শ্রেয়স্কর, মঙ্গলজনক।

কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন: 'কৃষ্ণ! যখন যখন আমার বিপদ ঘটেছে তখন তখন আমি তোমাকে ডেকেছি এবং তুমি সামনে এসে দাঁড়িয়েছ সেই জন্য আমার কাছে তো সুখের চেয়ে দুঃখই বেশি প্রিয়।' এমনও কথা আছে যে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে অনুযোগ করে বলেছেন: 'কৃষ্ণ! যখন কৌরবের সভায় আমার লাঞ্ছনা অবমাননা ঘটছিল, তখন তুমি এত দেরী করে এলে কেন?' কৃষ্ণ উত্তর দিলেন: 'সে তো তোমারই দোষ। তুমি নিজের পতিদের কিম্বা ভীষ্মদের উপর ভরসা করে আমাকে তো স্মরণই করনি। সব শেষে যখন আমাকে স্মরণ করলে তখন তো আমি সঙ্গে সঙ্গে এসেই পড়লাম'। এলাম ছুটতে ছুটতে (ভক্তের ডাকে ভগবান) এই ভাবে ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

আর্তের মধ্যেও ভগবানের খোঁজ থাকে, জ্ঞানী তো লাখের মধ্যে বিরল একজনই হয়ে থাকে। সেই কারণে 'অজ্ঞ' যে, তাকে কিছু ফলের প্রয়োজন

না দেখালে ভক্তি শেখানো যায় না। ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণসমূহে আকর্ষক এবং আলৌকিক বর্ণনার এই হ'ল তাৎপর্য। ভক্তিও তো শেষ পর্যন্ত বাসনা ক্ষয় ক'রে মানুষকে জ্ঞাননিষ্ঠার দিকেই টেনে নিয়ে যায়।

এইজন্য ব্যাসদেব চরিত্রদের বিবরণ দিতে জেনে শুনে অতিশয়োক্তি করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল মানুষদের সৎপথে আকৃষ্ট করা। অজামিল মাত্র 'নারায়ণ' এই নামটুকু উচ্চরণ করেছিল। সে চির জন্মের পাপী ছিল, তা সত্ত্বেও নামের উচ্চারণ মাত্রই তার মৃত্যুর সময় বিষ্ণুর পার্ষদ এসে পৌঁছে গেলেন এবং যমদূতদের সেখান থেকে মেরে মেরে তাড়িয়ে দিলেন! এ সব কথা ঠিক যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু ব্যাসদেব তো সাধারণ মানুষের মনকে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, সেজন্য যা কিছু অলৌকিক বা যুক্তিবিরুদ্ধ কথা লিখেছেন, তার সব কিছুই শুধু জন-কল্যাণের জন্যই লেখা হয়েছে। এই রহস্যটি যদি আমরা ঠিক মত বুঝে নিতে পারি তা হলে আমাদের কাছে সমালোচনার আর বিশেষ কিছু উপকরণ ব উপাদান থাকে না।

কিন্তু আমাদের এ কথাও জানা দরকার যে ভাগবত কেবল অলৌকিক বা অতিশয়োক্তি-প্রধান চরিত্রদের নিয়ে লেখা একটি গ্রন্থ নয়। ভাগবতের গভীর অধ্যয়ন থেকে আমাদের এই সুস্পষ্ট জ্ঞান জন্মে যায় যে আসলে ভাগবত হল ভাগবত ধর্মেরই এক অমূল্য গ্রন্থ। গীতার মত এ-ও কর্ম এবং ভক্তির সমন্বয় ক'রে মানুষকে অধ্যাত্ম পথেই টেনে নিয়ে যায়। এইভাবে গভীরে ডুবলে উপলব্ধি হবে যে ভাগবত আসলে বেদান্তেরই একটি গ্রন্থ। এতে গূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্ব ভরা আছে। ভক্তদের কথার মাঝে মাঝে বেদান্তের এক অটুট ভাণ্ডারও মিলে যায় এর মধ্যে।

উদাহরণস্বরূপ কপিল-দেবহূতির সংবাদটি নেওয়া যায়। কর্দম ঋষির পত্নীর নাম ছিল দেবহূতি। তাঁরই গর্ভে জন্ম লাভ করেন প্রখ্যাত আচার্য কপিল। কর্দম ঋষি তো কপিলের জন্মের পর পূর্ব সংকল্প মত বনে চলে গেলেন আর এদিকে কপিল নিজের মা দেবহূতির কাছে থাকতে লাগলেন। কিছু কাল পরে দেবহূতিরও বৈরাগ্য দেখা দিল এবং তিনি পুত্র কপিলকে মহাপুরুষ জেনে তার কাছে এলেন ও বললেনঃ 'হে পুত্র! আমার সংসারে বিরাগ এসে গিয়েছে, এখন তুমি নিজে উপদেশ দিয়ে আমার মহামোহ ও অজ্ঞান দূর করো।' তখন কপিল নিজের মা'কে উপদেশ দিয়ে তার মহামোহ দূর করলেন।

এই যে উপদেশ তা অত্যন্ত উদাত্ত ও জ্ঞানবর্ধক। নিজের মা'কে উপদেশ দিতে গিয়ে কপিল বললেনঃ 'মাগো! বিষয়ের আসক্তিই হল বন্ধন কিন্তু বিষয়ে অনাসক্তি সৎপুরুষের সঙ্গ দ্বারা দূর হয়ে যায়। সৎসঙ্গ থেকে ঈশ্বরে প্রীতি ও ভক্তি বৃদ্ধি পায়। তার থেকে বৈরাগ্য আসে এবং

ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। আত্মাই ঈশ্বর। আত্মা এবং পরমাত্মায় কোনো ভেদ নেই। আত্মা হচ্ছে নির্গুণ। তা সবের মধ্যে সমান। দেখায় বিভক্তের মত কিন্তু আসলে অবিভক্ত। এ হল প্রকৃতির পারে। এ হল অকর্তা। এ স্বরূপত ঈশ্বরই এবং স্বতন্ত্র। সকলের সাক্ষী এবং কেবল সুখস্বরূপ। এই যে দ্বৈত, এ অজ্ঞানের দরুণ আমাদের কাছে ভাসিত বা প্রকাশিত হচ্ছে। যেমন জলের ভিতরে সূর্যের প্রতিবিম্ব জল থেকে অলিপ্তই থাকে, ঠিক তেমনই আত্মা বা পরমাত্মা মানুষের সুখ-দুঃখ এবং অন্যান্য কর্ম থেকে সর্বথা অলিপ্ত। মাগো! ইন্দ্রিয়দের নিগৃহীত করে ভগবানে ভক্তি করো। ফলাসক্তি ত্যাগ করে স্বধর্মাচরণ করো। যেমন অগ্নির উৎপাদনকারী অরণি বা কাঠ নিজেও জ্বলে ছাই হয়ে যায় তেমনি ভগবানে ভক্তি এবং নিষ্কাম যোগের দ্বারা সমগ্র বাসনাপুঞ্জ ভস্ম হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। স্বধর্মের আচরণ করো, যা ভগবান্ দেন তাতেই সন্তোষ লাভ করো। পবিত্র ভোজন করো। অহিংসা প্রভৃতি সম-ধর্ম পালন করো।'

এখানে একটি জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যে কপিল কর্মযোগের বিরোধ করেননি। উপদেশ দিয়েছেন যে নিষ্কাম বুদ্ধিতে স্বধর্মাচরণ করো। এই ভাবের উদাত্ত উপদেশে দেবহূতির মোহ দূর হয়ে গেল।

কপিল যা বললেন তাতে কর্ম, জ্ঞান ভক্তি তিনেরই সমন্বয় রয়েছে। এর পর কপিলও বনে চলে গেলেন।

ধ্রুব-চরিত্র এবং রন্তিদেবের কথাও এই গোত্রীয়। তার দ্বারা আত্মোন্নতি সাধিত হয়। যে সব লোক ভ্রান্তিবশতঃ মনে করেন যে ভাগবত কেবল রাসলীলা, বস্ত্রহরণ লীলা, মাখন চুরি ইত্যাদি কাহিনীতেই ভরা, তাঁদের উচিত ভাগবতের বেদান্তে ডুব দেওয়া।

এ কথাও জানা উচিত যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং রাস ক্রীড়া শুধু সেইটুকু কালের মধ্যে সীমিত যতটুকু সময় গোকুলে ছিলেন।

ভাগবতকার বলেছেন যে যখন শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র সাত বৎসর। কংস বধের সময়ও, হরিবংশের মতে তার বয়স ছিল সাতই। রাস-ক্রীড়া বস্ত্রহরণ লীলা ইত্যাদিও তাঁর বাল্যাবস্থারই কাহিনী, যা গোকুলে ঘটেছিল। পরিবর্তী কালের নানা পদাবলীতে যে-রাধার এত কাহিনী গড়েছে, ভাগবতে সে-রাধার নামগন্ধও নেই।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে ভক্ত কবিরা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যা কিছু পদ রচনা করেছেন এবং যা যুগ যুগ ধরে গাওয়া হয়ে আসছে, তার সবই সেই সময়েই নিবদ্ধ যখন কিনা শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে ছিলেন। যেমন 'একাদের মত

আমায় পার করো, হে নন্দের দুলাল!' 'বাস করো আমার নয়নে, হে নন্দলাল!' 'রাধে রাধে শ্রীবর প্রিয়', 'এমন অনুরাগ বেড়ে উঠল বৃন্দাবনে গোপীরা নাচতে লাগলেন', মীরা বলছেন: 'শ্যামলকে যেন পাই বররূপে', নন্দদাসজি বলছেন: 'নন্দদাসের জীবন বা প্রাণস্বরূপ হল গিরিধারি গোকুল গ্রামের ছেলে কানাই।' জয়দেব বিরচিত পদেও যমুনা, গোকুল এবং বৃন্দাবনে গোপীদের সুর ঝঙ্কৃত। এ সমস্ত রচনাই ব্রজবাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা বা স্তুতিমূলক।

গোকুল ছাড়ার পর শ্রীকৃষ্ণের যে চরিত্র তা কবিদের পদ থেকে প্রায় লুপ্তই হয়ে গিয়েছে। 'ময়ূর মকরাকৃতি কুণ্ডল', 'বাঁশি', 'মাখন-চুরি' এ সবই শ্রীকৃষ্ণ গোকুলেই যেন ফেলে এলেন। গোকুল থেকে চলে যাবার পর মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ নন্দ, যশোদা, গোপ-গোপী এবং ব্রজের সমস্ত জীবনই যেন ভুলে গেলেন। তা সত্ত্বেও কবিরা গোকুলের জীবনকেই তাঁদের রচিত ভক্তি-পদাবলীতে প্রাধান্য দিলেন কেন? এর রহস্য বোঝান সম্ভব নয়।

কংস-নিধনের পর বসুদেব ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিজত্ব সংস্কার সুসম্পন্ন করালেন। প্রচুর উৎসব হল, দান ধ্যান করা হল, ব্রাহ্মণদের খাওয়ান হল এবং তার পর দুই ভাইয়ের বিদ্যাশিক্ষার জন্য সন্দীপন মুনির পাঠশালায় পাঠিয়ে বেদ-বেদাঙ্গ, কাব্য এবং অন্যান্য সব শাস্ত্র পড়ান হল। গোয়ালার জীবন, তার যে ধারা, তার যে সামাজিক রীতিনীতি তা মথুরা যেতে যেতেই শেষ হয়ে গেল এবং ক্ষত্রিয় জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়ে গেল। এইভাবে পূর্ব জীবনের উপর যেন একটি পর্দা ফেলে দেওয়া হল। ব্রজ-ধাম সম্পূর্ণ বিস্মৃতির মধ্যে যেন ঢাকা পড়ে গেল।

দীর্ঘকাল পরে বিরাট সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। সেই গ্রহণের সময় সারা দেশের লোক কুরুক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করছিলেন। বড় বড় ঋষি-মুনিরাও এসেছিলেন। কুন্তী এবং পঞ্চপাণ্ডবও সেখানে এসেছিলেন। কিন্তু একটি বিশেষ ঘটনা এই ঘটেছিল যে নন্দ, যশোদা এবং অন্যান্য ব্রজবাসিগণও সেখানে এসেছিলেন। যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে শ্রীকৃষ্ণও এসেছেন, তখন দীর্ঘকাল পরে কুরুক্ষেত্রে ব্রজবাসিগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন ঘটল। অতীতকে যেন পুনরুজ্জীবিত করে তুলল এই ঘটনা। এই অবসরে পুরাতন স্মৃতি যেন আবার জেগে উঠল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই সব স্মৃতির প্রতি যেন উদাসীনই রয়ে গেলেন। তিনি গোপীদের বললেন: 'ওগো গোপীগণ! আমি গোকুল ছাড়ার পর থেকে এত ব্যস্ত আছি যে আবার গোকুলে যাওয়া তো অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সেজন্য আমার বড় কষ্ট হয়।' তিনি সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। গোপীরাও কিছু কড়া কড়া কথা শোনালেন কিন্তু তাতেও শ্রীকৃষ্ণের সেই পুরানো স্মৃতিকে যেন ফিরিয়ে

আনতে পারলেন না তার টানে। অতীতের যেন কোনো ছাপই পড়ল না তাঁর উপর। গোপীদের সম্বোধন ক'রে তিনি বললেনঃ 'হে গোপীরা! যোগ আর বিয়োগ এ সব ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন। ঈশ্বরই সুখ আর শান্তির একমাত্র কারণ। বাইরের এ দেহ মিথ্যা। আসলে এর ভিতরে যে আত্মা আছে, তাই সত্য আর সব অনিত্য। প্রাণমাত্রে একই সত্য সর্বদা বিরাজমান। এক প্রাণী আর এক প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন। আত্মা আর পরমাত্মায় কোনো ভেদ নেই। এই রহস্যটি জানা হয়ে গেলে না আছে মানুষের সংযোগ, না আছে বিয়োগ, কেন না যা অবিভক্ত তার আবার বিয়োগ হবে কেমন করে? এই সত্যকে জানা এবং উপলব্ধি করাই পরম পুরুষার্থ। তোমরা কেন মনে করছ যে তোমাতে-আমাতে বিয়োগ বা বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে?'

এইরকম জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে গোপীরাও পুরানো সব ঘটনার কথা ভুলে গেলেন। গোপীদের জ্ঞান তো দিলেন শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এই সম্মিলনে পুরানো সেই লীলার চর্চাকে উল্লেখ পর্যন্ত কোথাও করলেন না। না সেই পুরানো সব স্মৃতি তাঁকে আকৃষ্টও করল। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে গোকুল ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা যেন ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গেল। এটি বিশেষভাবে বুঝবার জিনিস।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

শ্রীকৃষ্ণের জীবন ছিল পৃথিবীর ভার মোচনের জন্য অর্থাৎ অসাধুদের বিনাশ করা, সাধুদের রক্ষা করা এবং ধর্মের পুনঃ সংস্থাপন করা। পুরাণ-সমূহে বলা হয়েছে পৃথিবীর ভার মোচনের জন্য ভগবান সময়ে সময়ে অবতার গ্রহণ করেন। যখন যখন প্রবলের বল বৃদ্ধি পায় এবং সেই সব শক্তিমান বলিষ্ঠ লোক নিজেদের শক্তির অপপ্রয়োগ বা অসদ্ ব্যবহার ক'রে প্রজাবর্গকে কষ্ট দিতে থাকে তখন তাদের সেই পাপকর্ম পৃথিবীর ভার হয়ে দাঁড়ায়। প্রজাবর্গের সেই সন্তাপ দূর করার নামই হচ্ছে পৃথিবীর ভার হালকা করা।

রাবণের সন্ত্রাস থেকে মুক্ত করার জন্য রাম অবতার গ্রহণ করলেন। কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুঃশাসন, শকুনি, দুর্যোধন এবং এইরকম আরও অনেক অত্যাচারীদের অত্যাচারে পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি লাভ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের জীবন এই সব অত্যাচারীদের নির্মূল করতেই কেটে গেল। অত্যাচারী-দের শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারও শেষ হয়ে থাকে। কিন্তু মন্দের সঙ্গে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি অনেক ভালেরাও শেষ হয়ে গেলেন। কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ নিজেরাও নিজেদের বিনাশ কামনা করেছিলেন। 'গমের সঙ্গে ঘুণও (তাতে লাগা পোকাও) পিশে যায়'—এই হ'ল স্বাভাবিক নিয়ম। দুর্যোধনের সঙ্গের ফল ভীষ্মের মত তপস্বীকেও ভোগ করতে হল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ—এ'রা সব মহাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁরা সবাই ধর্ম-সংকটের দ্বারা গ্রস্ত বা অভিভূত ছিলেন। মন ছিল পাণ্ডবদের দিকে, দেহ ছিল কৌরবদের দিকে। লড়াই লড়লেন কৌরবের পক্ষে অথচ বিজয় কামনা করতেন পাণ্ডবদের। এই কারণে তাঁদের জীবন ছিল দুঃখময়। সেই কারণেই এই সব সৎ মানুষেরাও নিজেদের বিনাশ কামনা করতেন। আর

সেই বিনাশকে ডেকে আনতে এঁরা সবাই কৃষ্ণের সহযোগিতা করলেন। এ এক অদ্ভুত কথা কিন্তু মহাভারত গ্রন্থও তো অদ্ভুত এবং তার এই এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য বা অপূর্বতা। এই দৃষ্টিকোণ অনুসারে মহাভারতের যুদ্ধে ভূমিভার অনেকটা হালকা হয়ে গেল। অত্যাচার এবং অত্যাচারীদের উপর মর্মভেদী আঘাত হানা হল। অত্যাচারীদের তরফে যারা মিলিত হয়েছিল তাদেরও বিনাশ ঘটল।

কিন্তু দ্বারকাতে যাদবদের শক্তি মহাভারত যুদ্ধের পরেও ক্ষীণ হল না। তাদের শক্তিমদমত্ততার দরুণ তঁদের তরুণদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা, অহঙ্কার, অত্যাচারের মনোভাব কায়েম হয়েই ছিল। মদিরাপানে উন্মত্ত যাদব সমাজ পাপ-পুণ্যের ভেদও ভুলে গেল। প্রজাদের উপর অত্যাচার চলছিল। শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুই জানতেন। তিনি এ-ও বুঝেছিলেন যে যাদবকুলও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তবে নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করেই তাদের বিনাশ ঘটবে। কেননা বলিষ্ঠ যাদবদের বিনাশ করবার মত শক্তি যাদবকুলের বাইরে খুঁজতে গেলে নজরে পড়ছিল না। এ শক্তি যাদবকুলের মধ্যেই নিহিত ছিল এবং ঘটলও তাই। নিজেদের মধ্যেই লড়াই-ঝগড়া ক'রে যাদবরা শেষ হয়ে গেল।

যখন যাদবদের বিনাশ ঘটল তখন শ্রীকৃষ্ণ উপলব্ধি করলেন যে তাঁর জীবনের মূল উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়ে গেল, জীবনধারণের কারণও পরিসমাপ্ত হল। যাদবদের কলহের পর শ্রীকৃষ্ণের মনে হতে লাগল যে তিনি নিজেও আর বেশিদিন দেহকে রাখবেন না। তিনিও যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এর বিবরণ পরে আবার আসবে। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের এই সংকল্পের কথা টের পেলেন এবং উদাস মনে তাঁর কাছে গেলেন, তখন তিনি উদ্ধবকে অত্যন্ত সারগর্ভ উপদেশ দিলেন। সেটি প্রত্যেক মুক্তিকামী মানুষের পড়ার ও হৃদয়ে গ্রহণ করার যোগ্য।

শ্রীকৃষ্ণ বললেনঃ 'উদ্ধব! এ সংসারে আমার কার্যকাল এখন শেষ হয়ে গিয়েছে। আজ থেকে সাতদিন পরে যাদব বংশ নাশ হয়ে যাবে এবং দ্বারকাও সমুদ্রে ডুবে যাবে। এইজন্য আমার নির্দেশ হল যে আমার দেহত্যাগের পর তুমি এক জায়গায় বেশি দিন থেকো না। সমস্ত আসক্তি ত্যাগ ক'রে সমদৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করতে থেকো। উদ্ধব! ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জগৎ দৃশ্যমান বলে উপলব্ধি হয় তা কেবল মনোময় এবং বিনাশশীল। জগৎ হ'ল এক অখণ্ড অদ্বৈত, সুতরাং যা কিছু ভেদ দেখা যাচ্ছে এ সবই ভ্রম। ইন্দ্রিয়দের বশীভূত ক'রে আপন আত্মার মধ্যেই এই সারা জগৎ অবস্থিত বলে জানো এবং আত্মাকে ঈশ্বর বলে উপলব্ধি করো। বেদের তাৎপর্যকে উপলব্ধি করার নাম জ্ঞান, আর আত্মাকে অনুভব করা হল

বিজ্ঞান। এই অনুভব লাভ হবার পর আর কোনো বিষয় মানুষকে পীড়িত করে না।'

উদ্ধব বললেনঃ 'ভগবন্! আমি সংসারে পরিবারে আসক্ত রয়েছি, তাই আপনি আমাকে যেভাবে চলতে বললেন তা আমার পক্ষে বড় কঠিন।' এই শুনে তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে এক সুদীর্ঘ উপদেশ দিলেন এবং বললেনঃ 'তুমি দত্তাত্রেয়ের মত নিজেই নিজের গুরু হয়ে সংসার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। নিরন্তর স্বধর্ম পালন করো, নিষ্কাম হয়ে কর্তব্যবোধে বর্ণ, আশ্রম এবং কুলধর্ম নিরন্তর পালন ক'রে চলো। কাম্য কর্ম সব ত্যাগ করো, তবে অন্য স্বধর্মোচিত সব কর্ম আমার আশ্রয় গ্রহণপূর্বক করে যাও। মৎপরায়ণ হয়ে পূর্ণরূপে যম-নিয়মাদির পালন করো। যাগ-যজ্ঞের ফল বলা হয়েছে স্বর্গ-প্রাপ্তি কিন্তু সে সবই বিনাশশীল, অতএব তার থেকে মনকে বিরত করা উচিত। যদি মনের উপর নিয়ন্ত্রণ করা তোমার কাছে দুঃসাধ্য মনে হয় তা হলে ভক্তিভাবে আমার উপাসনা করো। তার দ্বারাই তোমার মনের উপর অধিকার বাড়তে থাকবে। আমারই জন্য জীবন ধারণ করো অর্থাৎ পরোপকারের জন্যই কর্ম করো। সৎসঙ্গের দ্বারাই বিষয়ের ত্যাগ হয়ে থাকে। আত্মাকে পরমাত্মা জেনে তাতেই মনকে সুস্থিত করো। এর থেকেই তোমার বিবেক জন্মাবে এবং তুমি সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তৃষ্ণারহিত হয়ে থাকো এবং নিস্পৃহ হও। নানা সাধনের মধ্যে ভক্তিরই বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে।'

এইভাবে নানা উপদেশ দিয়ে উদ্ধবের মনকে শান্ত ক'রে ভগবান্ বললেনঃ 'উদ্ধব! এবার তুমি বদরিকাশ্রমে যাও, সেখানে গিয়ে নিস্পৃহ হয়ে থাকো, শীত-উষ্ণতা সহ্য করো, স্বভাবকে সত্ত্বে সুস্থিত করো, চিন্তন করো, মনন করো। এইভাবে তুমি সব দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।' উদ্ধব অনেক প্রণাম, নমস্কার ক'রে ভগবানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বদরিকাশ্রমে চলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই উদাত্ত, বিস্তৃত উপদেশ সকলের মনন, চিন্তন এবং আচরণের যোগ্য।

এইরকম সংবাদ পড়বার পর ভাগবত-পাঠকদের উপলব্ধি হবে যে ভাগবত রাস-ক্রীড়া বা বাল্য-লীলার গ্রন্থ নয় কিন্তু প্রধানত বেদান্তেরই গ্রন্থ। লীলাগুলি কেবল বাইরের পালিশ বা চমক, যা সাধারণ লোকেদের আকৃষ্ট করার জন্য বেদান্তের উপর মুড়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র।





নাম-সাধনা

ভারতীয় রীতি অনুসারে সাহিত্যে রোচক, ভয়ানক এবং যথার্থ, এই তিন রকম বিবরণের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ব্যাসদেবের এই হল বাহাদুরি বা কারিগরি যে তিনি রোচক কাহিনী রচনা ক'রে তার মধ্যে বেদান্তের গূঢ় রহস্য পুরে দিয়েছেন। এর দ্বারা জন-সমাজকে ভক্তির দিকে প্রেরিত ক'রে তাঁদের ধার্মিক শ্রদ্ধাকে উদ্বুদ্ধ করে দিয়েছেন এবং সঙ্গে বেদান্তের শিক্ষাও দিয়ে রেখেছেন। যাঁদের অধ্যাত্ম বিষয়েই রুচি তাঁরা এই সব অলৌকিক কাহিনীগুলিকে অবহেলাও করতে পারেন অথবা যেমন মাটি থেকে সোনা সঞ্চয় করা হয় তেমনিভাবে এই সব অলৌকিক কাহিনীগুলির ভিতর লুকানো রত্নসমূহের সঞ্চয়ও করতে পারেন। আচার্য কাউকেই বাধ্য করেন না যে তারা বেদান্তের অবহেলা করুক এবং শুধু অলৌকিক কাহিনীগুলি মাত্র পড়ে এই সব অতিশয়োক্তির সমালোচনা করুক। থালায় অনেক রকম জিনিস সাজিয়ে রাখা হয়েছে, অনেক রকমের খাবার দেওয়া হয়েছে, তার সবগুলিই মঙ্গলদায়ক অর্থাৎ উপকারী। আপন আপন রুচি অনুসারে ভক্ত ভাগবত থেকে তার পছন্দমত খাদ্য বার ক'রে নিয়ে তার রস আস্বাদন করতে পারে।

আমি বলেছি যে ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ আরাধ্য, উপাস্য এবং পূজ্য। ভাগবতের কৃষ্ণ শুধু ভক্তির জন্যই। তাঁর অনুকরণ করা অসম্ভব কারণ শ্রীকৃষ্ণ যদি ঈশ্বর হন তা হ'লে ঈশ্বরের অনুকরণ কে করতে পারে? 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। তাই ভগবানের আবার অনুকরণ কিভাবে সম্ভব? ঈশ্বরের তো শুধু উপাসনাই হতে পারে।

কিন্তু মহাভারতের কৃষ্ণ পূজ্য তো বটেই আবার সেই সঙ্গে অনুকরণীয়। সংসারের নানা জটিল সমস্যার সমাধানে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র আমাদের

বিশেষ সহায়ক। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে নিজেই তাঁকে অনুকরণ বা অনুসরণ করার জন্য আমাদের উৎসাহিত করেছেন।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ একজন মহাপুরুষ এবং নীতিবিশারদ এবং সেই যুগের শব্দাবলী অনুসারে তাঁকে যোগেশ্বর, বুধ, ধীর, কবি, প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। যেমন 'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ'। এই জন্য মহাভারতের কৃষ্ণ-চরিত্রের বিশেষ মহত্ত্ব আছে। তাঁর জীবন-চরিত্র, তাঁর অনুকরণ, তাঁর উপদেশ সংসার-পথযাত্রীদের অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। তা ঠিক ঠিক বোঝা এবং গ্রহণ করা, সেইভাবে আচরণ করা এবং কঠিন সমস্যা উপস্থিত হলে তার অনুকরণ করার চেষ্টা করা—এই সব মানুষের সংসার-যাত্রাকে অনেক সুগম ও সরল করে দেয়।

এই সমস্ত উক্তি বা কথন এই কারণে অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ যে ভগবান্ আসক্তি ত্যাগ করে এবং লোক-সংগ্রহের জন্য সব অবস্থায় প্রত্যেক মানুষকে স্বধর্মাচরণের শিক্ষা দিয়েছেন।

বৈদিক যজ্ঞ ছিল মাত্র কর্মকাণ্ড, বিশেষত পশুবলি এবং সোমরসের বারবার দিয়ে তাকে আকর্ষক করে তোলা হয়েছিল এবং তাতে নিষ্কাম কর্মকে গৌণ স্থান দেওয়া হয়েছিল। ওদিকে আবার সাংখ্যের আগ্রহ ছিল কর্ম-সংন্যাসের উপর। এই দুই পথ থেকেই মানুষকে সরিয়ে এনে ঠিক পথে প্রবর্তিত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ভাগবত ধর্মকে পুনরায় জাগিয়ে তুললেন। ভাগবত ধর্ম হল নিষ্কাম কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ, এই দুইয়ের সম্মিশ্রণ বা সমাহার এবং গীতার এই হল প্রধান বিষয়। সেই লুপ্ত ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ে ভগবদ্‌গীতায় ভগবান অর্জুনকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে এই 'যোগ' অর্থাৎ এই ভাগবত ধর্ম, কর্মযোগ, যা আমি তোমাকে বলছি তা কিন্তু নতুন কিছু নয়।

"যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥"

"তিনলোকে কোনো কাজই আমার আর করা বাকি নেই। এমন কোনো জিনিস নেই যা আমি প্রাপ্ত নই বা যা, কিছু করলেই তবে আমি পাব। তা সত্ত্বেও আমি নিরন্তর কর্ম করেই চলেছি। কেননা, যদি আমি প্রমাদ ও আলস্য ত্যাগ করে কর্ম না করি তা হলে লোকে আমার অনুকরণ করে অলস হয়ে যাবে। তার পরিণাম এই দাঁড়াবে যে সংসার লুপ্ত বা বিনষ্ট হয়ে যাবে। প্রজার পতন হবে। সেইজন্য যেমন অজ্ঞ লোক আসক্ত হয়ে কর্ম করে থাকে তেমনি জ্ঞানীদেরও উচিত আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করা। যারা অজ্ঞানী তাদের বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে কর্তব্য থেকে তাদের বিচলিত করা কখনও

উচিত নয়।” এখানে ভগবান স্বয়ং তাঁর অনুকরণ করার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

আরও বলেছেনঃ “পূর্ব কালে এই যোগ আমি বিবস্বানকে বলেছিলাম এবং বিবস্বান্ মনুকে আর মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। এই ধারা বা পরম্পরা চলে আসছিল, তারপর কালক্রমে তা লুপ্ত হয়ে যায়। সেই প্রাচীন যোগকেই আমি আজ তোমাকে বলছি, কেন না তুমি হচ্ছ আমার বন্ধু এবং ভক্তও।” এই লুপ্ত ভাগবত ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার কথা এখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

এখানে অর্জুনকে লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ ‘সখা’ এবং ‘ভক্ত’ এই দুটি শব্দেরই ব্যবহার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতারের মত অর্জুনকে এখানে সম্বোধিত করেননি। এক বন্ধুর মতই উপদেশ দিয়েছেন। না অর্জুন কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার মনে করে তদনুসারে সম্বোধন করেছেন। অর্জুনও কৃষ্ণকে বন্ধু মনে করেই তার আদেশ বা উপদেশ শুনেছেন। সমগ্র মহাভারত পড়লেই বোঝা যাবে যে পান্ডব এবং শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র সম্বন্ধই কুটুম্ব বা আত্মীয় পর্যায়েরই ছিল। কথাবার্তা এবং ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধুর মত এবং নিজের পরিবারের মতই আগাগোড়া দেখা যায়। যখন যখন বিপত্তি ঘনিয়ে এসেছে, শ্রীকৃষ্ণ পান্ডবদের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন, তাদের ব্যবহারিক পরামর্শ দিয়েছেন এবং তাদের সহায়তাও করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ পান্ডবদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে রেখেছিলেন যে যখনই প্রয়োজন হবে অসঙ্কোচে আমাকে তলব কোরো। মহাভারতের কৃষ্ণের পান্ডবদের সঙ্গে ব্যবহার বন্ধুর মতই ছিল, যোগেশ্বরের মত তিনি আচরণ করেননি। ভাগবত আর মহাভারতের কৃষ্ণের এই ভেদ বা পার্থক্য অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ, যা উপলব্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন।

কিন্তু বাস্তবে শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতেরই হোন বা মহাভারতেরই হোন, ভক্তিমার্গের পথিকের কাছে তিনি সব সময়ই সব অবস্থাতেই উপাস্যরূপেই প্রতিভাত হয়েছেন। রাম এবং কৃষ্ণের নিরন্তর নাম-স্মরণ মুক্তিকামী সাধকদের চিরকালই জোরালো সাহায্য দিয়ে এসেছে। শ্রীকৃষ্ণ নিজের অনুকরণ করার জন্য জন-সমাজকে আহ্বান তো জানিয়েছিলেন, কিন্তু জনগণ তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। এ অনুকরণ তাদের কাছে ‘বিক্লিষ্ট’, ‘শোকঠকানো গোছের’ বলে মনে হয়েছে এবং ভক্তিমার্গই তাদের কাছে সরল ও সুগম বলে বোধ হয়েছে। সেইজন্য তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করে কৃষ্ণকে উপাস্যরূপেই তারা দেখেছে।

কিন্তু কৃষ্ণের জীবনকে উপেক্ষা করে কেবল [illegible] করা এক দিক

দিয়ে ভুল। এটা বোঝা উচিত যে কর্মযোগ ছাড়া ভক্তি নিষ্ফল এবং ভক্তি ছাড়া কর্মযোগও কোনো কাজের নয়।

অন্তকালে রাম-রাম বলে দেহত্যাগ করাই সাধকের ধ্যেয় বা লক্ষ্যরূপে গৃহীত হয়েছে। গান্ধিজীও 'হে রাম' বলেই প্রাণ ত্যাগ করেন। গান্ধিজী ভক্ত ছিলেন কিন্তু কর্মযোগীও ছিলেন।

এ এক আশ্চর্য অকল্পনীয় ব্যাপার যে রাম বা কৃষ্ণের ইতিহাস কেউ জিজ্ঞাসা করে না। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ রাস-লীলা প্রসঙ্গে বা রাস-পঞ্চাধ্যায়ীতে কি বলেছেন, ভক্তের তা নিয়ে কোনো মাথা-ব্যথা বা লেন-দেন নেই। না এ বিষয়ে ভক্তরা কোনো আশঙ্কা বা সন্দেহ কোথাও প্রকাশ করে থাকেন। নরসিংহ মেহতা বলেন যে কৃষ্ণ ছাড়া সব কিছুই মিথ্যা। তুকারাম, মীরাবাঈ এবং অন্যান্য ভক্তরাও এই কথাই বলেন। নামের সহায়তায় লক্ষ লক্ষ লোক পার হয়ে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও কোটি কোটি সংসার সাগর পার হয়ে যাবে। এ হল শ্রদ্ধার এক অকল্পনীয় কাহিনী। এ এক চমৎকার ব্যাপার, যার সবটা শ্রদ্ধারই মাহাত্ম্য।

ভগবান বলেছেন, যখন যখন ধর্মের হ্রাস হয় তখন তখন আমি দেহ ধারণ করে ধর্মকে পুনরায় স্থাপন করে থাকি। এর তাৎপর্য হল এই যে যখন যখন সমাজ নীচের দিকে ঢলে পড়ে, তখন তখন সেই গোলমেলে পরিস্থিতিকে সামলে দেবার জন্য এক বিশেষ শক্তির উদ্ভব হয়, যা পতনোন্মুখ সমাজকে ফের উপরের দিকে তুলে ধরে।

শ্রীকৃষ্ণের পরে বুদ্ধ, তার পরে আদি শঙ্কর এবং তার পরে অন্যান্য আচার্য ও ভক্তরা জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক কালেও গান্ধীরূপে এক দৈবী শক্তির বিকাশ ঘটেছিল এবং সেই শক্তি আমাদের পতনোন্মুখ নৈতিক অবস্থাকে আবার উঁচু করে তুলে ধরেছে।

স্বরূপের উপলব্ধি

রাম এবং কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলে মানা হয়। কিন্তু আসল অর্থে তো সব মানুষই ঈশ্বরের অবতার। প্রত্যেক প্রাণীর জন্ম এক বিশেষ কারণকে উপলক্ষ্য করেই হয়ে থাকে। ঈশ্বর যাকে দিয়ে যে কাজ করাতে চান তাকে তিনি নিজের নিমিত্ত করে নেন। 'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্'। 'সব কিছু আমি নির্ধারিত, নির্দিষ্ট করে রেখেছি, তুমি শুধু নিমিত্ত হয়ে যাও'। সেই নিমিত্তের জন্যই প্রাণীর জন্ম হয়ে থাকে।

কিম্বদন্তী এই যে ভগবান্ কৃষ্ণ ষোল কলায় পরিপূর্ণ অবতার ছিলেন, কিন্তু রাম গোড়াতে বারো কলারই ছিলেন। সীতা স্বয়ম্বরের পর পরশু-রামের সঙ্গে রামের যে বিবাদ-বিসম্বাদ হ'ল তারপর পরশুরামের চারটি কলা শ্রীরামে এসে মিলে গেল। এইভাবে শ্রীরাম ষোল কলায় পূর্ণ অবতার হয়ে গেলেন এবং পরশুরাম কলাবিহীন হয়ে তপস্যা করার জন্য বনে চলে গেলেন। এই সব অবিশ্বাস্য চটকদার কথার ভিতরে কিন্তু গূঢ় অর্থ লুকিয়ে আছে। তাৎপর্য হল এই যে প্রত্যেক প্রাণীই আংশিক রূপে ঈশ্বরেরই অবতার। তা সে আংশিক এক কলারই হোক্ বা পরিপূর্ণ ষোল কলারই হোক্। সে একটি উদ্দেশ্য বা কারণে আসে বা প্রকট হয় এবং যখন তার কাজ শেষ হয়ে যায় তখন ঈশ্বর তাকে তুলে নেন।

মানুষ তো কোন্ ছার। প্রাণীমাত্রেই সেই এক ঈশ্বরের অবতার। কেন না সমগ্র বিশ্বে 'দুই' বলে কিছু নেই, আছে কেবল 'এক'ই এবং এই সারা চরাচর নামরূপাত্মক জগৎ অনেক ভাবে 'বিভক্ত' দেখা গেলেও স্বরূপত এক 'অবিভক্ত'ই আছে। কেবল চরাচর জগৎই বা কেন, সমস্ত সূক্ষ্ম ক্রিয়াসমূহ এবং চিন্তাধারাও সেই এক পরব্রহ্মেরই অন্তর্গত।

গীতায় বলা হয়েছেঃ

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥

অর্পণরূপ যে কর্ম সে-ও ব্রহ্ম। যা অর্পণ করা হচ্ছে সে-সব সামগ্রী বা বস্তুও ব্রহ্ম, হোমের আগুনও ব্রহ্ম আর যে হবনকর্তা সে-ও ব্রহ্ম। এই বিচার ধারা অনুসারে এ-ও বলা চলে যে এই কাগজ, কালী, লেখনী বা কলম এবং লেখক সবই ব্রহ্ম।

আরও এগিয়ে গীতায় নিজের বিভূতি বর্ণনা করবার সময়ও ভগবান্ এই ভাবেরই কথা বলেছেন যে পাণ্ডবদের মধ্যে ধনঞ্জয় হচ্ছি আমি এবং যাদবদের মধ্যে কৃষ্ণ হচ্ছি আমি, স্থাবরদের মধ্যে হিমালয় নদীর মধ্যে গঙ্গা এবং সরোবরের মধ্যে সাগর হচ্ছি আমিই। জুয়ার মধ্যে ছলনা হচ্ছি আমি, মৎস্যগণের মধ্যে মকর হচ্ছি আমি। সংক্ষেপে বক্তব্য হল এই যে সারা বিশ্ব একই ব্রহ্মের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ঈশ্বরের অতিরিক্ত এ বিশ্বে না আছে কোনো বিন্দু বা শূন্য স্থান, না আছে তার থেকে ভিন্ন, আলাদা কোনো বস্তু। এই বিচারধারার গভীরে যখন আমরা ডুব দিই তখন বুঝতে পারি যে ঈশ্বর থেকে ভিন্ন কোনো বস্তুই নেই। তাকে বাদ দিয়ে কোনো জায়গায়ই খালি বা শূন্য নেই। তা হলে আবার অবতারেরই বা কে আর কে-ই বা অবতারের ভক্ত সব একই সত্তা।

কিন্তু অব্যক্তের এই ভক্তি বড় দুষ্কর। এই যে অব্যক্ত তা ইন্দ্রিয়গোচর নয়। এইজন্যই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে অব্যক্তের প্রতি ভক্তি বড় কঠিন। সেই কারণে সাধকগণ ঈশ্বরকে শরীরধারী সাজিয়ে নিজেদের অভ্যুদয় বা উন্নতির জন্য এই সরল সহজ পথকেই নিজস্ব করে দিয়েছেন। এমন কি গীতায় এ-ও বলেছেন যে মোহের বশবর্তী হয়েই জীব আমাকে দেহধারী মনে করে।

এত সব সত্ত্বেও এই দেহধারী অবতারের প্রতি ভক্তিতে মন ঢেলিয়ে দেওয়া বা বুদ্ধি ভেদ ঘটানোর বিষয়ে ভগবান্ নিষেধই করেছেন। কেননা, অজ্ঞ জনদের বুদ্ধি ভেদ ক'রে দিলে তাদের শ্রদ্ধা শিথিল বা দুর্বল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বা আশংকা দেখা দেয়।

কৃষ্ণ বললেনঃ

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥'

'দ্রোণ, ভীষ্ম আদি সকলকে আমি আগেই মেরে রেখেছি, তুমি চিন্তা কোরো না লড়াই করো। যুদ্ধে তুমি অবশ্যই জয়ী হবে'।

এ কথার তাৎপর্য এই নয় যে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই সব মহারথীদের যুদ্ধের আগেই শেষ ক'রে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ এ কথাও বলেছিলেন: 'যখন যখন ধর্মের গ্লানি দেখা দেয় তখন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য আমি নিজেকে নিজে সৃষ্টি করি।' এখানেও 'আমি' কথাটিকে ব্যাপক অর্থে নেওয়া উচিত। এই সব 'আমি' ব'লে চিহ্নিত বাক্যগুলি দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই উক্তি, সে কথা ঠিক কিন্তু এই সব বাক্যের পিছনে যে শক্তি আছে, তা দেবকীনন্দন কৃষ্ণের নয় কিন্তু বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের।

সময়ে সময়ে এই 'আমি'র ব্যবহার করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র বিরাট বিশ্বের প্রতিনিধিত্বই করেছেন।

যখন ভগবান্ বললেন যে, আমি ধর্মের সংস্থাপনের জন্য এবং সাধু পুরুষদের রক্ষা করবার জন্য নিজেকে নিজে সৃষ্টি করি, [illegible] এরও গূঢ় অর্থই গ্রহণ করা উচিত। দুষ্টদের দমনের জন্য ভগবান নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেন তাতে সেই পরমেশ্বরের কোনো চেষ্টা বা প্রয়াস [illegible] হয় না। এই বিশ্বের বিধানই এমনভাবে বাঁধা হয়ে গিয়েছে যে, [illegible] গ্রহ নক্ষত্র, তারকাগণ আপন আপন কাজ আপনা থেকেই করে চলেছে। তার পিছনে কোনো প্রয়াস বা সজ্ঞান চেষ্টা নেই।

গ্রীষ্মকালে যখন তাপমান উগ্র হয়ে ওঠে এবং আকাশ থেকে যেন আগুন ঝরতে থাকে তখন সেই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকে এবং ঈশ্বরের বিধান অনুসারে বর্ষার আগমন ঘটে থাকে। বর্ষা এনে পৌঁছে দেবার জন্য ঈশ্বরকে কোনো হুকুম বা আজ্ঞা দিতে হয় না।

ঠিক সেইরকমই যখন অধর্মের বৃদ্ধি হয় তখন সেই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া রূপে এমন কোনো এক শক্তির প্রাদুর্ভাব ঘটে যা অধর্মকে দূর ক'রে ধর্মের সংস্থাপনা ক'রে থাকে। বিধির এই চক্র আপনা-আপনি চলে। সেই কারণে ভগবান্ যখন বললেন 'আমি অবতার গ্রহণ করি', তখন তার গূঢ় তাৎপর্য হ'ল এই যে এই বিধির বিধান অনুসারে পাপের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ উলটো আর এক ক্রিয়া উৎপন্ন হয় যা পাপকে করে নাশ এবং ধর্মকে করে রক্ষা। পাপকে নাশ করার এক শক্তি আপনা-আপনি প্রাদুর্ভূত হয়। বিশ্বের এই নিয়ম আপনা-আপনি চলেছে। তাই যখন ভগবান্ বললেন যে 'আমি নিজেকে নিজে সৃষ্টি করি' তখন এর গূঢ় ও ব্যাপক অর্থ হ'ল এই যে প্রকৃতির নিয়ম হল স্বয়ংসিদ্ধ, যা বিশেষ কারণের জন্য এক শক্তিকে জন্ম দেয় বা উৎপন্ন করে। ঈশ্বরকে এজন্য কোনো প্রয়াস বা চেষ্টা করতে হয় না।

কৃষ্ণ যখন বললেন যে এই কর্মযোগ আমি বিবস্বান্‌কে বলেছিলাম, তিনি মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন, যা কালান্তরে লোপ পেয়ে গিয়েছিল এবং তাকেই আবার আমি এখন বলছি তখন সেখানেও 'আমি' বলতে বিশ্বরূপ ব্রহ্মেরই সংকেত বা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অর্জুন তাতে জিজ্ঞাসাও করলেন যে 'আপনি যা বলছেন, তা কেমন ক'রে সম্ভব? কারণ তাঁরা সবাই তো আপনার অনেক আগেই জন্ম নিয়েছিলেন, তখন তো আপনি উৎপন্নও হ'ননি।' তখন কৃষ্ণ জানালেন যে তোমার এবং আমার অনেক জন্ম হয়ে গিয়েছে। সে সব তুমি জানো না, আমিই জানি।' অর্থাৎ ঈশ্বর আগেও ছিলেন, এখনও আছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন। তাঁরই সৃষ্টি করা এক বিশেষ শক্তি কোনো এক উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য উৎপন্ন হয়ে চলে এবং নিরন্তর কাজ করতে থাকে। এ শক্তি আগেও প্রাদুর্ভূত হয়েছিল, এখনও আবার হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজন দেখা দিলে আবার হবে।

'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'—ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনিই ব্রহ্মই হয়ে যান। কৃষ্ণ ছিলেন ব্রহ্মবিৎ। সেইজন্য তিনি ব্রহ্মস্বরূপই ছিলেন। এই অর্থে যদি আপনি এবং আমি ব্রহ্মবিৎ হয়ে যাই তা হলে আমরাও ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কৃষ্ণ যে ভাষায় কথা বলেছিলেন, সেই ভাষাতেই বলতে পারি। ব্রহ্মবিৎ হলে শুধু কৃষ্ণ নয় কিন্তু আমরা সবাই ঈশ্বরের অবতার ব'লে গণ্য হতে পারি।

প্রখ্যাত বাগ্মী সন্ন্যাসী, স্বামী চিন্ময়ানন্দজি মানুষের এক বিচিত্র শ্রেণী বিভাগ উপস্থাপিত করেছেন। সবাই ঈশ্বরের অবতার তো বটেই কিন্তু যারা তমোগুণী মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন এবং তামস আবরণ দিয়ে আবৃত, তারা হল সব পাশবিক মনুষ্য। যারা রাজস মালিন্য দিয়ে ঢাকা তারা মানুষী মনুষ্য। কিন্তু যারা সত্ত্বে অবস্থিত তারা ঈশ্বরীয় মনুষ্য। ঈশ্বরীয় মনুষ্যই আসলে অবতার —তা সে কৃষ্ণই হোন বা অন্য কোনো সত্ত্বগুণসম্পন্ন মানুষই হোন।

গীতা-ধ্যানে ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণ স্তুতি করতে গিয়ে 'কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্‌' এইভাবে সংবোধন করে বন্দনা করেছেন। আর সঞ্জয় কৃষ্ণকে 'যোগেশ্বরঃ' বলেছেন। এইভাবে ব্রহ্মবিৎ হওয়ার দরুণ কৃষ্ণ 'জগদ্‌গুরু' এবং 'যোগেশ্বর' ছাড়াও দেহধারী হয়েও ব্রহ্মই ছিলেন। যে ব্রহ্মবিৎ হয় তার এই অধিকার জন্মে যায় যে সে বলতে পারে 'অহং ব্রহ্মাস্মি।'

শাস্ত্রও বলছে 'তৎ ত্বম্‌ অসি।'

এই দৃষ্টিতে কৃষ্ণ দেহধারী হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মবিৎ হওয়ার দরুণ ঈশ্বর

ছিলেন। আমরাও যদি ব্রহ্মকে জেনে যাই তা হলে ঈশ্বরের অবতার হয়ে যাই। ব্যাপক অর্থে অবতার বলতে এই বুঝতে হবে।

কিন্তু এ সব নিছক বাক্য-বিলাসের বিষয় নয়। এর উপলব্ধি বা অনুভূতি যার হয় সেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলার অধিকারী। অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত তো আছে শুধু 'নমঃ শিবায়', তাঁর প্রতি প্রণতি-নিবেদন। অনুভূতি হলে পরে হয়ে যায় 'শিবোহম্', তাঁর সঙ্গে একাত্মতা।

এই বিভক্তকে যখন আমরা অবিভক্তরূপে দেখি এবং সমগ্র বিশ্বকে নিজের অন্তর্গত বলে অনুভব করি তখন যে-কথা কৃষ্ণ বলেছেন আমরাও বলতে পারি যে হিমালয় বা মকর বা অশ্বত্থ গাছ সব আমিই।

কিন্তু এইরকম অধিকারী হবার পর কোনোরকম বলাই আর সাজেনা বা আসেনা। এমন অনুভূতিসম্পন্ন মানুষদের মৌনভাবই তাঁদের 'ঈশ্বরত্ব'কে প্রকট করে বা জানিয়ে দেয়।

বলার কথা হল এই যে দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুই ঈশ্বরের অবতার। কৃষ্ণ থেকে আমরা ভিন্ন বা আলাদা নই। কৃষ্ণও আমাদের থেকে ভিন্ন নন। তরঙ্গ সমুদ্র থেকে ভিন্ন নয়। সমুদ্রও তরঙ্গ থেকে ভিন্ন নয়। তরঙ্গ বলতে পারে সমুদ্রও আমিই। কনক এবং কুণ্ডল, সোনা ও মাকড়ি একই জিনিস। অনেকের মধ্যে এককে দেখলে আমরা ঈশ্বরত্ব লাভ করে যাই।

অবতার-রহস্য

পূর্বেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন দুজনেই পূর্ব জন্মে ঋষি ছিলেন বলা হ'য়ে থাকে। এ'রা দুজনে একই কারণে অবতার গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর দুজনেই দেহ বিসর্জন করেছিলেন।

এরই সমর্থনে মহাভারতে এক অত্যন্ত আকর্ষণীয় কাহিনী আছে। যুদ্ধ-সমাপ্তির পর বিজেতা পাণ্ডব দুর্যোধনের শিবিরে গেলেন। প্রাচীন রীতি ছিল যে বিজয়ের পর বিজেতা পরাজিত শত্রুর শিবিরে গিয়ে এক রাত্রি বাস করত। এই রীতি অনুসরণ করে সব পাণ্ডবরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শঙ্খধ্বনি করতে করতে কৌরব-শিবিরে গিয়ে পৌঁছুলেন। সেখানে পৌঁছুবার পর শ্রীকৃষ্ণ সব পাণ্ডবদের শান্ত হয়ে দাঁড়াবার জন্য আদেশ করলেন এবং অর্জুনকে বললেন: 'অর্জুন! তুমি নিজের গাণ্ডীব এবং সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রথ থেকে নীচে নেমে এসো।' অর্জুন বুঝতে পারলেন না যে কেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে রথ থেকে নীচে নামতে বলছেন। যা হোক তা সত্ত্বেও তাঁর আজ্ঞা মান্য করে রথ থেকে নেমে এলেন। তাঁর নেমে আসার পর শ্রীকৃষ্ণও ঘোড়ার লাগাম ও চাবুক ফেলে দিয়ে সেই সোনার রথ থেকে নেমে গেলেন। যেমনি শ্রীকৃষ্ণ রথ থেকে নীচে নেমেছেন অমনি হনুমান, যে কিনা রথের ধ্বজার উপর বসে ছিল, আকাশে উড়ে গেল এবং অর্জুনের রথ আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। অর্জুন এবং সব পাণ্ডব-বন্ধুগণ এই দৃশ্য দেখে একেবারে স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে গেলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলতে লাগলেন: 'কৃষ্ণ! এ কী হচ্ছে?' অর্জুনের যে রথ শত্রুদের হৃদয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করত তা এখন শুধু এক বিরাট ভস্মস্তূপে পরিণত হল। অর্জুনের চোখে জল এসে গেল। তিনি বললেন: 'কৃষ্ণ! এ আমি কী দেখছি? যে-রথ আমাকে স্বয়ং অগ্নি দিয়েছিলেন, যার উপর চড়ে আমি খাণ্ডব বন দহন করেছিলাম, শত্রুদের নিধন

করেছিলাম তা কিনা এক ক্ষণের মধ্যে ভস্মীভূত হয়ে গেল! আমাকে বলুন, কেন এরকম হল?'

শ্রীকৃষ্ণ বললেনঃ 'অর্জুন! এ রথের কাজ এখন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এই রথ সবরকম অস্ত্র-শস্ত্রের আঘাত সহ্য করেছে। ব্রহ্মাস্ত্রকে পর্যন্ত এ সহ্য করতে পেরেছে। এ আগেই পুড়ে যেত, কিন্তু আমি এর উপর অধিষ্ঠিত ছিলাম। এখন এর কার্যকাল পূর্ণ হয়েছে, তাই আমিও এর উপর থেকে নেমে এসেছি। যখন এর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে তখন এর ধ্বংসও ঘটে গেল।' 'আমি অধিষ্ঠিত বা আসীন ছিলাম' এটি বড় মরমী কথা।

"প্রত্যেক বস্তুরই উদ্ভব কোনো কারণবশে ঘটে থাকে। সেই কারণ বা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেলেই তার বিনাশ হয়ে যায়। মানুষেরও সেই একই গতি। সংসার-যাত্রার জন্য প্রত্যেক প্রাণী একটি কাজ নিয়ে আসে। সেই কার্য সিদ্ধ হয়ে গেলে পর সে সংসার থেকে বিদায় হয়ে যায়, কারণ তখন আর তার বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন থাকে না। তোমার এবং আমারও সেই একই গতি ঘটতে চলেছে। তুমি আর আমি দুজনেই এক বিশেষ কারণেই অবতীর্ণ হয়েছি। সেই কারণ বা উদ্দেশ্য সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দুজন চলে যাব। যতক্ষণ সেই কারণ বা উদ্দেশ্য পূর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণই আমরা দুজন বর্তমান আছি। সেই সময়ও আসবে যখন আমরা দুজনও চলে যাব। তবে এখনও সে-সময় আসেনি।"

এই কাহিনী আমাদের এই কথাই বলছে বা শেখাচ্ছে যে প্রত্যেক শক্তি একটি কার্য নিয়েই জন্মায় এবং কার্য-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তার বিসর্জন ঘটে যায়। অবতারবাদকে বুঝবার জন্য এই বিশ্লেষণ এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কেননা সংকুচিত বা সংকীর্ণ দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা বুদ্ধিকে বিচলিত বা বিভ্রান্ত করে দেয়। অবতার একটি বিশেষ কারণের জন্য হয়—ধর্মের সংস্থাপন, সাধুদের রক্ষণ, দুষ্টের বিনাশ। এই কারণের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ-রূপ অবতার হয়েছিলেন এবং কার্য সমাপন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহ-ত্যাগ ঘটল।

অবতার ঈশ্বরের প্রতীক মাত্র। প্রতীক অর্থাৎ 'প্রতি+ইক'। পাষাণের মূর্তিও প্রতীক। পাষাণের মূর্তি ভগবান্ নন। যতক্ষণ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না হয়, ততক্ষণ সে-মূর্তি পাষাণ মাত্রই থাকে। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পর পাষাণের পশ্চাতে যে-ভাবটি স্থাপিত করা হয়, তা-ই সেই মূর্তিকে ঈশ্বরের প্রতীক করে তোলে। মূর্তি খণ্ডিত হলে বা ভেঙে গেলে কেবল পাষাণই থেকে যায়।

মূর্তির অন্তরালে যে ঈশ্বর-ভাবনা পূজক তারই পূজা করে থাকে। অবতারের পিছনেও যে সাক্ষাৎ পূর্ণ ব্রহ্মের ভাবনা তাকেই সামনে রেখে ভক্ত অবতারের পূজা এবং তাঁর প্রতি ভক্তি করে থাকে। রাম কে ছিলেন? কৃষ্ণ কে ছিলেন? ভক্তের সে-সব খোঁজে কোনো দরকার নেই। অবতারবাদ কেবল শ্রদ্ধা ও ভাবনার ক্ষেত্র মাত্র। সেই ভাবনা ও শ্রদ্ধার বলের দ্বারাই মানুষ ঊর্ধ্বে উঠে। সেই ভক্তিকেই প্রধান মনে ক'রে ভক্তগণ মহাভারতের কৃষ্ণের অনুকরণকে গৌণ বলে মেনে নিয়েছেন এবং নিজেদের ভক্তিতেই অটল থেকেছেন।

পাষাণের প্রতিমা বা অবতার এ সব সেই পরমেশ্বরেরই প্রতীক, যিনি সকলের কর্তা, হর্তা এবং নিয়ন্তা। ভাবনা এবং শ্রদ্ধা দ্বারা প্রতীকে ঈশ্বরত্ব আরোপ করে প্রকারান্তরে ভক্ত সেই পরমেশ্বরেরই উপাসনা বা আরাধনা করে থাকেন, যিনি সকলের চরম লক্ষ্য বা ধ্যেয়। যে ফল নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনায় লাভ হয় প্রতীক উপাসনাতেও তা-ই পাওয়া যায়।

গীতায় ভগবান বলেছেন, মানুষ হল শ্রদ্ধাময়। যার যেমন শ্রদ্ধা থাকে প্রতীকও ঠিক তেমনই হয়ে থাকে। তা সে প্রতীক পাষাণের মূর্তিই হোক বা অবতারই হোক।

"যারা শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে অন্য দেবতাদের পূজা করে তারাও আসলে আমারই পূজা করে এবং তারা আমারই পূজার ফল লাভ করে থাকে। কেননা সব যজ্ঞের ও শুভ কর্মের ভোক্তা এবং স্বামী তো একমাত্র আমিই।"

'কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।' (৭·২০)
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ (৭·২১)
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥ (৭·২২)

আপন আপন প্রকৃতির নিয়মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের ভজন করেন।

যে ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্বক যে রূপের উপাসনা করতে চায়, তার শ্রদ্ধাকে আমি তাতেই সুস্থির করে দিই।

সেই শ্রদ্ধা দ্বারা যুক্ত হয়ে সে সেই দেবতার আরাধনা করে। কিন্তু সে আমারই দেওয়া বা বিহিত ফল লাভ করে থাকে।

স্বল্প বুদ্ধির মানুষরা অব্যক্ত ও অবিনাশী আমাকে ব্যক্ত বলে মনে করে বসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষে তারা ঈশ্বরের পূজার ফলই পেয়ে থাকে।

প্রতীক-উপাসনা

মহাভারতে একটি কাহিনী আছে যে নিষাদরাজের একটি ছেলের, যার নাম ছিল একলব্য, ধনর্বিদ্যা শেখার জন্য উদগ্র লালসা ছিল। ধনুর্বিদ্যা শেখার জন্য সে দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করলঃ 'ভগবন্! আমাকে আপনি ধনুর্বিদ্যা শেখান।' আচার্য বালকটিকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'তুমি কে?' বালকটি উত্তর দিলঃ 'আমি নিষাদরাজের ছেলে।' এই শুনে দ্রোণাচার্য বললেনঃ 'তুমি হচ্ছ শূদ্র, তাই আমি তোমাকে এ বিদ্যা শেখাতে পারব না।' বালক এ কথা শুনে দুঃখিতও হল না, নিরাশও হল না। সে বনে গিয়ে দ্রোণাচার্যের একটি মৃন্ময় মূর্তি তৈরী করল এবং তাকেই নিজের গুরু বলে ধরে নিয়ে অন্য কারুর সাহায্য ছাড়াই ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করতে লাগল। অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও তৎপরতার সঙ্গে সে নিরন্তর অভ্যাস করতে লাগল এবং শেষে ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠল।

একদিন পাণ্ডব বালকেরা সেই বনের দিকে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে একটি কুকুর ছিল যে ঐ নিষাদ বালকটিকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। তখন সেই নিষাদ কুকুরটির উপর এমন কৌশলে বাণ বর্ষণ করল যে কুকুরটি মরল না কিন্তু তার মুখটি বাণ দিয়ে ভরে বন্ধ হয়ে গেল। পাণ্ডবরা যখন এই দৃশ্য দেখলেন তখন অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং তাঁরা এই সমস্ত কাহিনী ফিরে গিয়ে আচার্যকে বললেন। তাঁরা এ-ও বললেন যে এমন নিপুণ ধনুর্ধারী তো আমরা দেখিনি কোথাও। আপনি আমাদের ধনুর্বিদ্যা শিখিয়েছেন বটে কিন্তু এতটা দক্ষতা অর্জন করাননি।

তাই শুনে দ্রোণাচার্য তাঁদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সেই বালকের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'বৎস! এ বিদ্যা

তুমি কার কাছে শিখেছ?' সে উত্তর দিল: 'আমার গুরু হলেন দ্রোণাচার্য, তাঁর কাছ থেকেই আমি এই বিদ্যা লাভ করেছি।' দ্রোণাচার্য অবাক হলেন কারণ তিনি কখনো তাকে ধনুর্বিদ্যায় দীক্ষা দিয়েছিলেন বলে মনে করতে পারলেন না।

আরও অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল যে সে একটি মৃণ্ময় মূর্তিকে দ্রোণাচার্যের প্রতীক হিসাবে তৈরী করে তার কাছ থেকেই এই বিদ্যা লাভ করেছে।

এর তাৎপর্য হল এই যে প্রতীককেও শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পূজা করলে সেই প্রতীকে এক বিশিষ্ট শক্তির আবির্ভাব হয়, যা উপাসককে তার বাঞ্ছিত ফল দিয়ে থাকে।

"যে যজন্তি পিতৃন্ দেবান্ গুরূংশ্চৈব অতিথীংস্তথা।
গাশ্চৈব দ্বিজমুখ্যাংশ্চ পৃথিবীং মাতরং তথা।
কর্মণা মনসা বাচা বিষ্ণুমেব যজন্তি তে॥"

দেবতা, পিতা, গুরু, ব্রাহ্মণ, অতিথি এবং গাভীর পূজনকারী প্রকারান্তরে বিষ্ণুরই পূজা করে থাকেন। এ প্রতীকের মাহাত্ম্য নয়, শ্রদ্ধার চমৎকারিতা।

"গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম"

গুরুকে প্রতীক করেও সাক্ষাৎ ব্রহ্মের উপাসনা হয়ে থাকে।

ধর্মব্যাধ মাংসের ব্যবসা করত। এটি তার পেশা ছিল, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে সে পিতা-মাতার সেবা করেই ব্রহ্মাত্মৈক্য লাভ করেছিল। পিতা-মাতাকে প্রতীক করে সে ঈশ্বরেরই পূজা করত।

গুরুকেও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলা হয়েছে। এর ফলেও ঠিক তাই মিলে যায় যা সাক্ষাৎ ব্রহ্মের পূজা থেকে পাওয়া যায়।

এই শ্রদ্ধার দরুণ ফলদাতা 'পর' কেউ নয় কিন্তু 'স্বয়ং'ই অর্থাৎ নিজেই।

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥"

এখানে অগ্নিকে ভগবানের প্রতীক বলে গ্রহণ করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে যে হে অগ্নি! আমাকে শুভ পথে নিয়ে চল এবং কলুষিত পথ থেকে সরিয়ে আনো। এই সব উক্তি এই তথ্যকেই জানিয়ে দিচ্ছে ও বোঝাচ্ছে যে প্রতীক একটি অবলম্বন এবং প্রতীকের পূজাও আমাদের শ্রদ্ধার দরুণ ভগবানেরই পূজায় পরিণত হয় এবং শেষে ভগবানেরই পূজার ফল উপাসক পেয়ে যান।

বেদান্তের ভাষায় এর অর্থ হল এই যে আত্মা স্বয়ং নিজের কাছে নিজেই প্রার্থনা করে আপন শুভ বৃত্তিদের জাগ্রত করে অভীষ্ট ফল লাভ করে থাকে। কেন না,

'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"

এই সমগ্র সৃষ্টি ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত। এই পরিস্থিতিতে প্রার্থনাকারী এবং যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে দুই একই অভিন্ন শক্তি। তারা ভিন্ন নয়। তাৎপর্য হল এই যে ফলদাতা ও ফলগ্রহীতাও একই, দুই নয়। কিন্তু এই ফল শ্রদ্ধাপূর্বক অনন্যভাবে উপাসনার ফলেই লাভ হয়ে থাকে।

আসলে তো গীতাকার এ কথাও বলেছেন যে ঈশ্বর কোনো পক্ষেই নেই অর্থাৎ না তো তিনি সাধুদের প্রতি পক্ষপাত করে থাকেন আর না তো দুষ্কৃতদের দণ্ড দিয়ে থাকেন—'নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ', 'সমোহং সর্বভূতেষু'। তবু সাধুদের কল্যাণ হয়ে থাকে এবং দুষ্টদের বিনাশ ঘটে থাকে। কিন্তু ঈশ্বর এর জন্য কোনো পরিশ্রম বা প্রয়াস করেন না। এ তো প্রকৃতিরই এক অটল নিয়ম যে ভালোর ভালো এবং মন্দের মন্দ হয়ে থাকে। এই নিয়মানুসারেই ব্যক্তিমাত্রেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। ভালোর কেন ভালো হয়, মন্দের মন্দ হয় কেন, এ হল প্রকৃতি বা ভগবানের নিয়ম। 'স্বভাবস্তু প্রবর্ততে'—এতে তর্ক-বিতর্ক অপ্রাসঙ্গিক।

ভক্তদের ভক্তি জাগাবার জন্য এবং তার দ্বারা মানুষের বাসনা ক্ষয় করিয়ে উন্নত মার্গে প্রেরিত করার জন্য এই শুভ উদ্দেশ্য নিয়েই ঋষিগণ ঈশ্বরকে জেনে বুঝে দেহধারী করে দিয়েছেন। আমরা এর সমালোচনা করতে পারি না। যদিও এইভাবে দেহধারী বলে মেনে নেওয়াকে গীতাকার মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেনঃ 'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।' অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হওয়ার দরুণ প্রাণীদের এই মোহ এসে যায় যে আমি দেহধারী।

একে 'মোহ'ই বলো বা শ্রদ্ধাই বলো এই হল উপরে উঠবার প্রথম সোপান। এর প্রয়োজনীয়তাও আছে। স্বর, ব্যঞ্জন এ সব পাণিনির ব্যাকরণ নয়। কিন্তু পাণিনি বুঝবার এ-হল প্রথম সোপান। এই প্রথম সোপানের মহত্ত্ব আছে। কিন্তু এই প্রথম সোপানে আটকে থাকাও জীবের কর্তব্য নয়, তাকে এগিয়ে যেতে হবে। তা সত্ত্বেও প্রথম সোপান অতিক্রম না করলে আগের সোপানগুলিতে আরোহণ করা কি করে সম্ভব?

শেষ কালে গিয়ে ভক্তি এবং কর্মযোগ দুই-ই জ্ঞানের প্রাপ্তিতে পরিসমাপ্ত হয়ে যায়। জ্ঞানই সিঁড়ির শেষ সোপান। তা সত্ত্বেও প্রথম সোপানের মহত্ত্ব বা মাহাত্ম্য কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

বেদান্তের ভাষায় ভক্তির অর্থ তা নয় যা ভাবুক ভক্তরা করে থাকেন। ভক্তির মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে গীতাকার বলেছেনঃ

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

অর্থাৎ যে মানুষ অনন্যভাবে আমার চিন্তা করে, আমার উপাসনা করে এবং সম্পূর্ণভাবে আমাতে সংযুক্ত, 'যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা'—তাদের যোগ এবং ক্ষেম দুই-ই আমি রক্ষা করে থাকি। 'যোগ' বলা হয় যা প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই বস্তুকে আর 'ক্ষেম' বলা হয় তাকে রক্ষা করাকে। এই দুইয়েরই তদারক ভগবান্ ভক্তের জন্য করে থাকেন। কিন্তু আর এক জায়গায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যেমন আগে উল্লেখ করা হয়েছে, যে ভগবান্ কারও পক্ষ নেন না, কাউকে দণ্ডও দেন না। তা সত্ত্বেও এ দুটি বাক্য কিন্তু পরস্পরবিরোধী নয়। এটিরও তাৎপর্য বোঝা উচিত। (স্বভাবস্তু প্রবর্ততে)

কিন্তু যেখানে ভগবান যোগ এবং ক্ষেম দুইয়েরই রক্ষা করার অঙ্গীকার করেছেন, তাতে যে সর্ত লাগিয়ে দিয়েছেন তা ভুলে যাওয়া প্রমাদজনক বা অন্যায় হবে। সর্তটি এই যে ভক্তকে অনন্যভাবে উপাসনা করতে হবে। উপাসনা নয়, 'পর্যুপাসনা' করতে হবে। 'নিত্য' যদি 'যোগযুক্ত' হয়, ইন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য কায়েম হয় তা হলেই উপাসনা সফল হয় এবং তারই ফল-স্বরূপ যোগক্ষেমের নির্বাহ হয়ে থাকে।

তাৎপর্য হচ্ছে এই যে ভগবান্ আমার থেকে আলাদা নন, আমার ভিতরেই আছেন কিংবা বলতে পারো যে আমি নিজেই ভগবান্। নানক বলেছেনঃ 'ফুলের মধ্যে যেমন গন্ধ বাস করে, আয়নার মধ্যে যেমন ছায়া বা প্রতিবিম্ব, ঠিক তেমনই হরি সব সময় বাস করছেন এই ঘটে বা দেহে, সেখানেই তাকে খোঁজো ভাই।'

সম্মুখে দৃষ্টান্ত রেখে ভাষ্যকারগণ এই বুঝিয়েছেন যে কনক-কুণ্ডলে কোনো ভেদ বা পার্থক্য নেই। সমুদ্র আর তার তরঙ্গে কোনো ভেদ নেই। ঠিক তেমনি আমার অন্তরে স্থিত আত্মা আর পরমাত্মায় কোনো ভেদ নেই। আমি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ। কিন্তু প্রথম ধাপে আমি 'শিবোহম্' বলতে পারি না। প্রারম্ভ তো 'নমঃ শিবায়' দিয়েই হয়ে থাকে। শেষে 'শিবোহম্' এসে যায়।

যদি আমি অনন্যচিত্ত হয়ে আত্মচিন্তন করি—আত্মসাক্ষাৎকারে নিজেকে পরিপূর্ণ উৎসর্গ করি, তা হলে 'যোগ' অর্থাৎ যে-আত্মজ্ঞান আমি এখনও পর্যন্ত লাভ করিনি, তা পেয়ে যাই এবং তা পাওয়ার পর সেই 'ক্ষেম' অচল হয়ে থাকে।

সাংসারিক বস্তুর বিষয়েও ভাষ্যকারেরা এই নিয়মই চালু করেছেন যে যখন আমরা তদ্‌গত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে ফলাসক্তি ত্যাগ করে কোনো কাজে লেগে যাই এবং সমস্ত ভার ভগবানের উপর ছেড়ে দিই তখন প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে তা থেকে সাংসারিক বস্তুপ্রাপ্তিতে আমরা সফলতা লাভ করি এবং সেই সাফল্য সুরক্ষিত হয়ে থাকে। শাস্ত্র অনুসারে এতে ভগবানের কোনো পক্ষপাত নেই। জল আপনা-আপনি ঢালুর দিকে প্রবাহিত হয়, এটা প্রকৃতির নিয়ম। এতে কারুর পক্ষপাত নেই। সেই নিয়ম অনুসারেই কোনো শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে কোনোদিকে না ঝুঁকে ফলাসক্তি ত্যাগ করে তদ্‌গত হয়ে কোনো কাজে যখন লেগে যাই, তখন ফলের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে কাজ করে যাওয়া উচিত। ফলস্বরূপ সাফল্য অবশ্যই মিলবে। বিদ্যুৎ জলকে ঠান্ডাও করে আবার গরমও করে। এতে বিদ্যুতের কোনো পক্ষপাত নেই। এ তার স্বভাব। আমি পাখার ঠান্ডা হাওয়া চাই কিন্তু সেই সুইচকে যদি আমি গরম স্টোভ বা হীটারের সঙ্গে জুড়ে দিই তা হলে উলটো গরমই পেয়ে থাকি। এতে বিদ্যুতের কোনো দোষ নেই। তা আমারই ভুল। ভগবানের কৃপা বা দয়া সারা বিশ্বে ছড়ান রয়েছে। আমি যদি তা কুড়িয়ে নিতে না পারি তো দোষ আমার। ভগবানের কোনো পক্ষপাত নেই।

একে ভগবানের আশীর্বাদই বলো বা প্রাকৃতিক নিয়মই বলো—দুই একই কথা। কিন্তু বেদান্তের এই ভাষা সর্বসাধারণ গ্রহণ করতে পারে না, সেইজন্য নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে সরে এসে সর্বসাধারণকে ভক্তির ভাষায় এই বলা হয়েছে যে ভগবান একটি দেহ ধারণ করেন এবং সেই দেহ দ্বারা সাধুদের রক্ষা করেন, দুষ্টদের নাশ করেন এবং আমাদের যোগক্ষেম দিয়ে থাকেন। এই কারণে তাঁতে ভক্তি করো। অতএব আমার যদি ভগবানে ভক্তির দ্বারা যোগ এবং ক্ষেম দুই-ই চাই, তা হলে আমাকে সাধু অর্থাৎ চরিত্রবান, নিঃস্বার্থ, পরোপকারী এবং সৎ মানুষ হতে হবে। 'সর্বভূতহিতে রতাঃ' হয়ে স্বধর্মের আচরণ করা উচিত। ইন্দ্রিয়দের সংযম করা কর্তব্য। দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে থাকতে হবে। লাভ-ক্ষতির সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বকর্ম করে যেতে হবে। সংক্ষেপে, দৈবী সম্পদের উপাসনা করা চাই, তা হলেই আমাদের যোগ-ক্ষেমের নির্বাহ বা পরিপূরণ ঘটবে।

এইভাবে চাও তো বেদান্তের ভাষারই উপযোগ বা সদ্‌ব্যবহার করো অথবা ভক্তির ভাষার, দুইয়েতেই কিন্তু সাধুত্ব প্রাপ্তি না হলে অপ্রাপ্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং প্রাপ্তেরও রক্ষা হয় না। সব ক্ষেত্রেই সব অবস্থাতেই ভক্তির মাহাত্ম্য সমান এবং দৈবী সম্পদের আধারের উপরই তা অবস্থিত।

ব্রহ্মানুভব

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জুন ব্যক্ত এবং অব্যক্তের উপাসনা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণকে এক অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। তার আগে প্রথম থেকে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত অর্জুন এবং ভগবানের মধ্যে অনেক প্রশ্নোত্তর ঘটে গিয়েছে। ভগবান্ অর্জুনকে শুধু নিজের বিভূতিরই বর্ণনা করেননি কিন্তু আপন বিশ্বরূপও দেখিয়েছেন। কর্ম এবং ভক্তির উপদেশও দিয়ে চলেছেন। এত সব সত্ত্বেও অর্জুনের কিছু সংশয় রয়েই গেল।

নতুবা এভাবেও বলা যায় যে এই সংশয়ের উদ্ভবও এই এগারোটি অধ্যায়ের বিবেচনার ফলেই জন্মাল। এইজন্য অর্জুন সোজাসুজি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'আমাকে বলুন তো এমন যে সব ভক্তেরা কর্মযোগের অনুষ্ঠান করে আপনার পূজা করেন কিংবা সেই সব ভক্তেরা যাঁরা অক্ষর ও অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এই দুইয়ের মধ্যে উত্তম যোগী কে?'

ভগবান্ এর স্পষ্ট উত্তর দিলেনঃ 'অর্জুন! যারা আমাতে মন ঢেলে দিয়ে শ্রদ্ধাসহকারে কর্মযোগে নিরত, তারা উত্তম যোগী। অন্য দিকে, যারা অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, অচল, অপরিবর্তনশীল, কূটস্থ এমন আমাকে, সব ইন্দ্রিয়দের বশীভূত করে, সমস্ত ভূতবর্গের হিত সাধনে নিরত থেকে উপাসনা করেন, তাঁরাও আমাকেই লাভ করেন। কিন্তু এই অব্যক্তের উপাসকদের ক্লেশ বেশী হয়। কারণ দেহধারীদের পক্ষে অব্যক্তের উপাসনা বড় কঠিন।'

এই স্পষ্ট প্রশ্নের ভগবানের স্পষ্ট উত্তর হল এই। যদিও প্রারম্ভে ব্যক্তের উপাসনা সহজ বলেছেন, কিন্তু পরে গিয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে দেহধারীর পক্ষে অব্যক্তের উপাসনা সহজ নয়। এই উত্তর থেকে সগুণ অবতারের উপাসনার মহত্ত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কারণ এ হল সুগম পথ।

এই উপাসনাকে নবম অধ্যায়ে পবিত্র, প্রত্যক্ষ এবং সুখসাধ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সগুণ উপাসককেও এই পরামর্শ দিয়েছেন যে সে-ও যেন সর্বভূতে স্থিত আমাকে অবিভক্ত ও অব্যক্ত বলেই বোঝে। ব্যক্ত এবং সগুণের উপাসনাও জ্ঞানপূর্বক—অজ্ঞানে নয়—পরম অব্যক্ত রূপে উপলব্ধি করেই সশ্রদ্ধভাবে যেন করে।

প্রতীক পূজায়, তা সে পাষাণের মূর্তিই হোক বা অবতারের বা কোনো পূজনীয় সাধু-সন্তেরই হোক, শ্রদ্ধা ও ভাবনার দরুণ সেই প্রতীক বাস্তবে ঈশ্বরই হয়ে দাঁড়ায় এবং এই জাতীয় উপাসক ঈশ্বরের উপাসনার ফলই পেয়ে যান—এ কথা শাস্ত্র ও মরমিয়া মহাত্মারা বলে থাকেন। ভালোর ফল ভালো এবং মন্দের ফল মন্দ, এই যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত, একে কোনো তর্ক বা যুক্তি অবলম্বনে প্রমাণ করা যায় না।

কাল সূর্যোদয় অবশ্যই হবে, এ কথা আমরা ধরে নিই বা মেনে থাকি। কিন্তু আমাদের পূর্বজদের অনুভবই হল এর ভিত্তি। ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত নতুন গ্রহ নিত্য জন্মাচ্ছে তেমনি অগুনতি গ্রহের নিত্য নাশও হচ্ছে। এই কাল-ক্রমের গতিতে সূর্যের কাল কি হবে, তা তর্ক দিয়ে ঠিক করা যাবে না, তা সত্ত্বেও অনুভবসিদ্ধ শ্রদ্ধার জোরে আমরা স্বীকার করি যে কাল সূর্যোদয় অবশ্যই হবে।

ইতিহাস আমাদের বলে যে শুদ্ধ বুদ্ধি এবং শুভ হেতু দ্বারা নিষ্পন্ন শুভ কর্মের সফলতা সুনিশ্চিত। কর্মযোগ সম্বন্ধে এই হল ভগবানের আশ্বাস-দান।

এরই মতো আমাদের এ-ও বলা হয়েছে যে অনন্য ভক্তি এবং শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা যে উপাসনা করা হয়, তার ফল মঙ্গলদায়কই হয়ে থাকে। এ-ও শ্রদ্ধারই এলাকার ব্যাপার। এই নির্ণয়ের বা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক বা কুতর্কের কোনো স্থান নেই।

আমাদের চোখ খুব বেশি হলে জোর ১০/২০ মাইলের দৃশ্য দেখতে সক্ষম। কানের শক্তিও তেমনি পরিমিত। নাকও বেশি দূরের গন্ধ শুঁকতে পারে না। এমনি করে সব ইন্দ্রিয়েরই শক্তি অত্যন্ত পরিমিত বা সীমাবদ্ধ। মন-বুদ্ধির শক্তিও অল্পই। ইন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধি—এদের সকলেরই দৌড় একটি সীমা পেরুলেই ক্ষীণ হয়ে যায়। এমন পরিমিত উপকরণের শক্তিকে সম্বল করে অনন্ত, অচিন্ত্য এবং অব্যক্ত ঈশ্বরের লীলার সবিস্তার বিশ্লেষণ যদি আমরা করতে চাই এবং 'নেতি নেতি'র বদলে 'সেতি সেতি' রূপে নির্ণয় করে ফেলতে চাই তা হলে তা নিশ্চয়ই এক মূঢ় অহম্মন্যতা হয়ে দাঁড়াবে। এই প্রতীক বা অবতারের প্রতি ভক্তি এবং তার উপাসনাকে তর্ক-বিতর্কের

আওতায় এনে প্রমাণিত করার প্রয়াস একান্তই বৃথা। এইরকম তর্কের ভিত্তিতে যারা ভক্তের ভক্তিকে শিথিল বা দুর্বল করে দেন, তাঁরা ভক্তের অমঙ্গলই করে থাকেন। এই রহস্যময় ক্ষেত্রে শুধু শ্রদ্ধার বলেই প্রবেশ লাভ সম্ভব। তর্ক-বিতর্কের এখানে কোনো স্থান নেই, বিশেষ করে সে-তর্ক যদি কুতর্ক হয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ কাহিনী আছে। কাহিনীটি হল এই যে বিদেহরাজ জনক একটি যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন. যতে সেই বিদেহরাজ অনেকরকম দান-ধ্যান করবেন বলে স্থির করেছিলেন। যজ্ঞে কুরু ও পাঞ্চালের অনেক জ্ঞানী-গুণী একত্র হয়েছিলেন। জনক জানতে চাইলেন যে এই সব উপস্থিত জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, জ্ঞানীশিরোমণি কে? তিনি যজ্ঞশালায় এক হাজার গোরু আনালেন, যাদের শিং ছিল সোনায় মোড়া এবং উপস্থিত পণ্ডিতদের বললেনঃ 'হে জ্ঞানিগণ! আপনাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানী তিনি এই গোরুদের নিয়ে যান।'

সেখানে যাজ্ঞবল্ক্যও উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজের শিষ্যকে বললেনঃ 'সামশ্রবা! এই গোরুদের ঘরে নিয়ে চলো।' এতে অন্য ব্রাহ্মণরা ক্ষুব্ধ হলেন এবং বলে উঠলেনঃ 'তুমি কি করে প্রমাণ করছ যে তুমিই পণ্ডিত-শিরোমণি? এখানে বিদ্বন্-মণ্ডলীর মধ্যে আরও তো অনেক সুশিক্ষিত বেদজ্ঞ আছেন।' জনকের ওখানে অশ্বল নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যাজ্ঞ-বল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি কি সত্যি সত্যি আমাদেব চেয়ে উঁচু দরের পণ্ডিত বা বেদজ্ঞ?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেনঃ 'সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীকে নমস্কার করছি। কিন্তু গোরু তো আমাকেই নিতে হবে।' এই শুনে অশ্বল তখন যাজ্ঞবল্ক্যকে পরীক্ষা করার জন্য তাকে শাস্ত্রীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন। বলতে গেলে তিনি যেন প্রশ্নের বন্যা বইয়ে দিলেন। যাজ্ঞ-বল্ক্য সে-সবেরই যথোচিত উত্তর দিলেন এবং অশ্বলকে শেষ পর্যন্ত চুপ করে যেতে হল। এর পর অন্য পণ্ডিতরাও প্রশ্নের ধারা-বর্ষণ সুরু করলেন কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সে-সবেরও উত্তর দিয়ে সবাইকে চুপ করিয়ে দিলেন। শেষে বাচক্নুর কন্যা গার্গীর পালা এল। তিনি অত্যন্ত বিদুষী জ্ঞানী ছিলেন। গার্গী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'যাজ্ঞবল্ক্য! বলো তো, এ সব তো জল দিয়ে ঢাকা বা আচ্ছাদিত কিন্তু জল কি দিয়ে আচ্ছাদিত?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেনঃ 'বায়ু দিয়ে।' 'বায়ু কিসের দ্বারা আচ্ছাদিত?' 'আকাশের দ্বারা।' 'আর আকাশ?' 'গন্ধর্ব-লোকের দ্বারা।' 'আর গন্ধর্ব-লোক?' 'সূর্য-লোক দিয়ে।' 'আর সূর্য-লোক?' 'চন্দ্র-লোক দিয়ে।' 'চন্দ্রলোক কি দিয়ে আচ্ছাদিত?' 'নক্ষত্র-লোক দিয়ে।' 'নক্ষত্র-লোক?' 'দেব-লোক দিয়ে।' 'আর দেব-লোক কি

দিয়ে আচ্ছাদিত?' 'ইন্দ্র-লোক দিয়ে।' 'আর ইন্দ্রলোক?' 'প্রজাপতি-লোক দিয়ে।' 'প্রজাপতি-লোক কি দিয়ে ঢাকা?' 'ব্রহ্মলোক দিয়ে।' 'ব্রহ্মলোক কিসের দ্বারা আচ্ছাদিত?' এবার যাজ্ঞবল্ক্য উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেনঃ 'গার্গী! তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। আর এগিয়ো না, নইলে তোমার মাথা খসে পড়বে। তুমি যা জিজ্ঞাসা করছ তা বুদ্ধিগম্য নয়। দেবতাদের বিষয়ে অতিপ্রশ্ন কেরো না।' তখন গার্গী চুপ করে গেলেন।

এর পর অন্যান্য পণ্ডিতেরাও নানা প্রশ্ন করলেন, সে-সবেরও যাজ্ঞবল্ক্য যথোচিত উত্তর দিয়ে দিলেন এবং তাঁদের সবাইকে চুপ করিয়ে দিলেন।

শেষে গার্গী বললেনঃ 'হে পণ্ডিতগণ! এবার আমি আরও দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি। তার উত্তর যদি পাওয়া যায়, তা হলে বুঝবেন যে যাজ্ঞ-বল্ক্য অজেয়।' গার্গী প্রশ্ন করলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্যের কাছ থেকে যথোচিত উত্তর পেয়ে বললেনঃ 'পণ্ডিতগণ! যাজ্ঞবল্ক্যকে নমস্কার করে আপন-আপন ঘরে ফিরে যাও। ইনি অজেয়।'

যাজ্ঞবল্ক্য গোরু নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন।

কিন্তু এই কাহিনীতে যে মহান্ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা হল এইঃ 'গার্গী! ব্রহ্ম বুদ্ধিগম্য নয়।' 'বেশি তর্ক-বিতর্ক কোরো না, নইলে তোমার মাথা খসে পড়বে।'

গীতাকারও বলেছেন যে এ সংসার হল রহস্যময়। কিছু কিছু জ্ঞানীদের কাছে এ আশ্চর্যযুক্ত বলে প্রতীত হয়। কেউ বা একে আশ্চর্যযুক্ত ভাবে বর্ণনা করেন। আবার কেউ কেউ তা শুনলে পরেও এর আশ্চর্য রহস্য বুঝতে পারেন না।

'দেখে তোমার এ রচনা বিচিত্র অতি, বুঝে মনে মনেই অর্থাৎ আপন মনেই থাকো।'

যেখানে বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয়ে যায়, আর এগুতে পারে না, সেখান থেকেই সুরু হয় শ্রদ্ধার ক্ষেত্র বা এলাকা। এই সীমার পারে এমন এক দেওয়াল, দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর আছে, যাকে তর্ক-বিতর্কের জন্য উল্লঙ্ঘন করা অসম্ভব।

গীতার কর্মযোগ

কোনো কোনো আচার্য বলেছেন যে গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় কর্মের সমর্থক, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায় ভক্তির এবং অন্তিম ছয় অধ্যায় জ্ঞানের প্রতিপাদক। অন্য আচার্যেরাও কিছু হেরফের করে এই ধরণেরই বিভাগ করেছেন। এই বিভাগ ঠিক হতে পারে, তবে গীতার সাধারণ পাঠকের কাছে তা একটু কৃত্রিমের মতো ঠেকে।

গীতার আঠারোটি অধ্যায়ের আলাদা আলাদা নামকরণ করা হয়েছে সেই অনুসারে তৃতীয় অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে 'কর্মযোগ' এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের নামকরণ হয়েছে 'ভক্তিযোগ' কিন্তু গীতা পাঠকদের কাছে প্রায় সব অধ্যায়েই কর্ম, ভক্তি এবং জ্ঞান তিনটিরই সমর্থন মিলে যায়। সেইজন্য এই জাতীয় বিভাগের সম্পূর্ণ রহস্য আচার্যগণই উপলব্ধি করে থাকবেন। সাধারণ পাঠকের কাছে এই বিভাগ ঠিক বুদ্ধিগম্য নয়।

যাই হোক্, এইটুকু জানলেই প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ঘাটিত হয় যে কর্মযোগী এবং ভক্তের আচরণে কি বিশেষ ভেদ আছে? ভগবান্ কর্ম করার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করলেন কেন? কর্মযোগ কাকে বলে? কর্মযোগীর আচরণ কিরূপ হয়ে থাকে? যোগের অর্থ যুক্তিও হয়—'যোগঃ কর্মসুকৌশলম্'। এই কুশলতা বা যুক্তি কিরকম?

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

'সমত্ব' এই হচ্ছে যোগ—ভগবান এমনও বলেছেন। তা হলে এই সমত্বের মর্ম কি?

ঠিক তেমনি ভক্তিরই বা তাৎপর্য কি? ভক্তি-মার্গ কি কর্মযোগ থেকে ভিন্ন বা আলাদা? ভক্তের আচরণ কিরকম হয়ে থাকে? দৈবী সম্পদের

লক্ষণও বলেছেন। স্থিতপ্রজ্ঞেরও। ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ আলাদা করে বলেছেন। এই সবে কী ভেদ আছে? গীতাকার এই সব প্রশ্নের অত্যন্ত স্পষ্ট ও বোধগম্য উত্তর দিয়েছেন। এই সমগ্র বিশ্লেষণ এত সহজ সরল এবং সাধকের পথকে এত সুলভ করে দেয় যে সাধকের পক্ষে এর অধ্যয়ন ও মনন একান্ত প্রয়োজন।

গীতা মহাভারতেরই একটি বিশিষ্ট অংগ। ব্যাসদেব বলেছেন যে গীতা হল সমস্ত উপনিষদের সার। 'সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ' —উপনিষদরূপী গাভীসমূহের দুগ্ধ সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণ দোহন করে অর্জুনকে পান করিয়েছেন। কিন্তু এই দুধ ভগবান সোনার বাটিতে ভরে যেন সব মুমুক্ষুদের সামনে রেখে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যে তাঁরা বিনা কোনো বাধায় যেন এই দুধ পান করেন এবং নিজেদের জ্ঞান-পিপাসা প্রশমিত বা শান্ত করেন।

গীতায় পুনরুক্তির অভাব নেই। কিন্তু এই সব পুনরুক্তিগুলি ব্যাসদেব জেনে বুঝেই দিয়ে রেখেছেন। এক ঢোকেই বাটির পুরো দুধ খেয়ে ফেলা সম্ভব নয়। বার বার একটু একটু করে পান করলেই তবে রসের পুরো আস্বাদ লাভ করা যায়। এই উপমা থেকেই পুনরুক্তির রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে যায়।

এই অদ্ভুত গ্রন্থ গীতার মহিমা জগদ্‌বিখ্যাত। সব দেশে এবং সব ভাষায় এই আশ্চর্য উপদেশের সমাদর করা হয়েছে।

নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি, এই দুটি পথ প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত হয়ে এসেছে। নিবৃত্তির আচার্যগণ এই নিবৃত্তি মার্গকে সাংখ্যযোগ নামে চিহ্নিত করেছেন এবং প্রবৃত্তি মার্গকে ভাগবত ধর্ম বলা হয়েছে, যাতে কর্মযোগ এবং ভক্তি দুইয়েরই সমন্বয় আছে। এই ভাগবত ধর্মও কোনো নতুন পথ নয় কিন্তু কালের প্রভাবে এর মাহাত্ম্য হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। এর পুনরুদ্ধার-কর্তা হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

মহাভারত, ভাগবত এবং বিশেষ করে ভগবদ্‌গীতায় এই ভাগবত ধর্মের পথের বিশদ প্রতিপাদন করা হয়েছে। এই লুপ্ত এবং সুপ্ত পথের উদ্ধার করে সেই সময়ের বিভ্রান্ত জনগণকে আপন কর্তব্য-পথে ফিরিয়ে আনার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের এই প্রয়াস এবং সেই প্রবৃত্তি মার্গের দ্বারা এই কর্মযোগ অর্থাৎ সক্রিয় নিষ্কাম কর্মের দিকে সমাজকে প্রেরিত করতে ভাগবত ধর্মের প্রবর্তক-গণ প্রচুর সাফল্য লাভ করেছেন। ভাগবত ধর্ম গীতার প্রধান বিষয়।

মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ হবারই ছিল। যুদ্ধের পুরোপুরি প্রস্তুতিও হয়েই গিয়েছিল। চারিদিকে অস্ত্র-শস্ত্রের ঝনঝনানিতে কুরুক্ষেত্র মুখরিত ছিল। সব মহারথীরা আপন আপন শঙ্খধ্বনি করে যুদ্ধের জন্য আহ্বান

জানিয়ে উত্তেজিত করছিলেন। এমন সময় অর্জুন ভগবানকে বলছেনঃ 'ভগবন্! এই দুই সেনার মাঝখানে আপনি আমার রথকে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে খাড়া করুন, যাতে যারা আমার সঙ্গে কোমর বেঁধে লড়তে এসেছে, তাদের একটু দেখে নিতে পারি।'

অর্জুন এই কথা বলার পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সেই বিশাল রথটি দুই সেনার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি সেনা-নায়কদের দিকে ইশারা করে বললেনঃ 'অর্জুন! এই সমবেত যোদ্ধৃ-বৃন্দকে দেখো।'

অর্জুন চতুর্দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখতে পেলেন সব বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, গুরু, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র এবং অন্য পরিবারের লোকও মরবার জন্য এসে উপস্থিত হয়ে দণ্ডায়মান। তাঁদের দেখা মাত্র অর্জুন কেঁপে উঠলেন। তাঁর সারা দেহ এলিয়ে গেল। তিনি বলতে লাগলেনঃ 'কৃষ্ণ! আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। শরীর বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে। ধনুক আমার হাত থেকে খসে পড়ছে। এই সুহৃদদের মেরে যুদ্ধে যদি আমি বিজয় লাভও করি তাতে কি লাভ হবে? এঁদের সবাইয়ের যদি এই হিংসাত্মক কর্ম করেও কোনো গ্লানিবোধ না হয় তাতে কি এসে যায়, আমি কেন এই কুকর্মে প্রবৃত্ত হতে যাই? তার চেয়ে বরং এই ভাল যে নিঃশস্ত্র আমাকে দুর্যোধনরা যদি মেরে ফেলে। এই পাপের চেয়ে তো' মৃত্যুই ভাল।' এই বলে অর্জুন নিজের ধনুক রথের উপর ফেলে চুপ করে বসে গেলেন।

অর্জুনের এই দৌর্বল্য দেখে ভগবানের দয়া এল এবং তিনি অর্জুনকে একটু হেসে বললেনঃ 'অর্জুন, এই অনার্য বৃত্তি যা নরকে পাতিত করে, তা তোমার মধ্যে কি করে জন্মাল বা উদ্ভূত হল? এই কাপুরুষতাকে ত্যাগ করো এবং উঠে দাঁড়াও।' কিন্তু অর্জুন তো সেই বিষাদে এমন ব্যথিত, অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি ঐ ধরনের কথাই বলে চললেন। আবারও তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেনঃ 'কৃষ্ণ! আমার বুদ্ধি কাজ করছে না। আমি লড়ব না।' এই বলে তিনি চুপ হয়ে গেলেন।

এইখান থেকেই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ আরম্ভ। প্রথম তো সাংখ্যযোগ অর্থাৎ নিবৃত্তি-মার্গের পটভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝালেন যে এই আত্মা হল সর্বব্যাপক, অজর, অমর। কে মারে এবং কে-ই বা কাকে মারায়?

মুণ্ডকোপনিষদের আচার্য কথা দিয়ে যতটা বলা যায় ততটা সেই আত্মাকে নানা বিশেষণ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। আচার্য বলেছেন—

যৎ তদদৃশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্
চক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।

নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং তদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥

যা দেখা যায় না, যা ইন্দ্রিয়গম্য নয়, যা কখনো জন্মায় না, যার কোনো বর্ণ নেই, যার না তো আছে কান, না চোখ, যার না আছে হাত, না পা, যে নিত্য, যার থেকে ব্যক্তের প্রভব বা উৎপত্তি এবং যা সবাইকে ছেয়ে আছে, যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, যা অব্যয়, যা থেকে সমগ্র প্রকৃতি জন্য ভূত ও প্রাণী প্রসূত হয়—এইভাবে ধীর পুরুষগণ সেই অব্যক্তকে জেনেছেন।

এই ধরনের ভাষাতেই অন্য উপনিষদগুলিতেও আত্মা অর্থাৎ সর্বব্যাপক সত্যের বর্ণনা করা হয়েছে।

গীতাতেও তারই পুনরুক্তি করা হয়েছে, যা কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন। আরও এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ বললেনঃ 'যেমন মানুষ পুরানো কাপড় ফেলে দিয়ে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, এ শরীরের অবস্থাও তাই বলে বোঝো। মৃত্যু কেবল জীর্ণ শরীরকে ফেলে দিয়ে নতুন শরীর ধারণ করা। তাই মৃত্যুতে এই শোক কিসের জন্য? এ সমস্ত চিন্তাধারাই অজ্ঞানজনিত। তোমাতে এ শোভা পায় না। এই শরীর না ছিল আদিতে, না থাকবে ভবিষ্যতে। এ কেবল মাঝখানেই দেখা দিয়ে থাকে, সেই কারণে এ অসত্য। বুদ্ধিমান্ লোক এতে শোক করেন না। তুমি কথা তো জ্ঞানীর মতো বলছ কিন্তু আসলে তুমি হচ্ছ নিরেট মূর্খ।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতেও যদি তুমি যুদ্ধ না করো তা হলে লোকে বলবে যে অর্জুন ভীরু। ভয় পেয়ে যুদ্ধ থেকে পালাল ইত্যাদি নানাধরণের এইরকম প্রচুর নিন্দা হবে।

আমি তোমায় সাংখ্যমার্গের দৃষ্টিতে এই বোঝালাম। এখন আমি তোমাকে কর্মযোগের দৃষ্টিতেও বলছি। এর থেকে তুমি বুঝে যাবে যে সমবুদ্ধিতে মানুষ যে কোনো স্বধর্ম-কর্মের আচরণ করে সে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

বাস্তবে গীতার উপদেশ হল কর্মযোগের প্রতিপাদন এবং তা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ শ্লোক থেকে আরম্ভ হয়েছে। এর পর প্রত্যেক অধ্যায়ে কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ দুইয়েরই বারবার বিশ্লেষণ, প্রতিপাদন ও সমর্থন হয়েই চলেছে এবং তার পুনরুক্তিও হয়ে চলেছে। কর্ম এবং ভক্তি এই দুইয়ের সাধনের দ্বারা শেষে জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হবে এবং এই বিনাশশীল সংসার থেকে মুক্তি মিলবে। এই হল সমস্ত উপদেশের সার।

শ্রীকৃষ্ণ বারবার বলছেনঃ 'কর্ম কখনও ছেড়ো না।' কিন্তু সেই কালের প্রচলিত ধারণা অনুসারে যাগ-যজ্ঞ এবং স্বর্গলাভের জন্য অনুষ্ঠিত নানা

ক্রিয়াকলাপ, যজ্ঞে পশুবধ, সোমপান ইত্যাদি সমস্ত বিধি-বিধানকে কর্মই বলা হত। কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে এই প্রচলিত বিভ্রান্তিমূলক ধারণাকে দূর করার জন্য তাই অর্জুনকে স্বধর্মাচরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানকে এ-ও বোঝাতে হল যে এই সব বেদের প্রলোভনমূলক বাক্যে যে-সব কর্মের প্রশংসা করা হয়েছে, আমি তার সমর্থন করছি না। যে সব লোক ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়েই রত হয়ে আছে, শ্রেয়কে ছেড়ে প্রেয়ের পিছনেই ছুটে মরে এবং তার প্রাপ্তির বা লাভের জন্য নানা প্রকার ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত আয়াসপ্রয়াসের সঙ্গে ক'রে থাকে সেই যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠানকারীদের না প্রাপ্তি হয় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, না লাভ হয় শান্তি বা মুক্তি। এই জন্য আমি যা বলছি তা হল এই বিনাশশীল সুখ, স্বর্গ ইত্যাদির লালসা থেকে মনকে স'রিয়ে এনে সত্ত্বে যাও। স্বধর্মকর্ম থেকে কখনো বিচলিত বা বিচ্যুত হোয়ো না। কর্তব্য কর্ম করো, কিন্তু তার ফলের তৃষ্ণা ত্যাগ ক'রো। নিজের ধর্ম জেনেই সমস্ত কর্ম করো।

প্রাণীর অধিকার শুধু কর্ম করাতে। ফল তো ঈশ্বরের হাতে, তাঁরই অধীন। যখন ফলের উপর তোমার কোনো জোরই নেই তা হলে ফলের কামনায় মনকে এই টালমাটাল অবস্থায় বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে বিক্ষিপ্ত করে লাভ কি? সেই ফলের তৃষ্ণায় তার পিছনে দৌড়ালে মন কেবল অব্যবস্থিত ও অশান্তই হয়ে থাকে।

কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য আগ্রহ দেখানর সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত পরিষ্টীকরণও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল, কেন না যেমন আগে বলা হয়েছে বৈদিক কর্মকাণ্ডও সেই সময়ের প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে কর্ম বলেই পরিচিত ছিল। কৃষ্ণের কর্মযোগে এই জাতীয় কাম্য কর্মের সমর্থন ছিল না।

ভাগবত ধর্ম বৈদিক কর্মকাণ্ডের দুর্বলতা দ্বারা চাপা পড়ে গিয়েছিল এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্ত মার্গের প্রচলনও স্বধর্ম থেকে জনসাধারণকে বিচ্যুত করে অলস করে তুলছিল। এই দুইরকম পথিককেই সক্রিয় এবং নিঃস্বার্থ হয়ে 'সর্বভূতহিতে রতাঃ'র ছাঁচে, ঢালবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র প্রয়াস ছিল। এই ছিল ভাগবত ধর্ম। এরই উপদেশে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত গীতা ওতপ্রোত হয়ে আছে।

যেখানে যেখানে গীতায় কর্মযোগের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে তাৎপর্য শুধু স্বধর্ম-আচরণ, লোক-কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্মের দিকে এবং ফলসমূহে আসক্তির প্রতি বিরোধে। এই জন্য কর্ম করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করার সময় শ্রীকৃষ্ণকে বারবার এ কথাও বোঝাতে হয়েছে

যে কর্ম বলতে আমার তাৎপর্য হল স্বধর্ম ও কর্তব্যকর্ম। এই সিদ্ধান্তের পশ্চাৎপটেই গীতার অধ্যয়ন ও অনুশীলন করা আবশ্যক।

গীতার আরম্ভ হয়েছে অর্জুনের বিষাদ থেকে। 'আমি যুদ্ধ করব না' এই বলে সে মূক হয়ে বসে পড়ল। এই হল আরম্ভ। এর পর অর্জুন নানা ধরণের রকম রকম প্রশ্ন করেছেন শ্রীকৃষ্ণকে। ভগবান পরম স্নেহভরে তার উত্তর দিয়ে গিয়েছেন এবং অর্জুনের সব সমস্যার সমাধান করে চলেছেন। নিজের বিভূতিসমূহেরও বর্ণনা করেছেন। বিশ্ব-দর্শনও করিয়েছেন। জ্ঞানযোগও বুঝিয়েছেন। কিন্তু এই গীতারূপ পাত্রের গহ্বরে রয়েছে তৈলধারার মত অবিচ্ছিন্ন প্রবাহিত একমাত্র কর্মযোগ। এই দীর্ঘ উপদেশের পর গীতা শেষ হয়েছে। ভগবান অর্জুনকে বলেছেনঃ 'অর্জুন! তোমাকে যা বোঝাবার ছিল সব বলা হয়ে গিয়েছে। এখন তোমার যা উচিত মনে হয়, তাই করো।' তাতে অর্জুন বলছেনঃ 'আমার মোহ বিনষ্ট হয়েছে। আমি এখন স্বস্থ হয়েছি। এখন আপনি যা বলবেন তাই করব।'

কর্ম আর সন্ন্যাস পৃথক নয়

অর্জুন বললেনঃ 'আমি লড়ব না।' আর ভগবান বললেনঃ 'কর্ম করো, অকর্মে লিপ্ত হোয়ো না।' অর্থাৎ যুদ্ধ করো। এই সিদ্ধান্তকেই গীতাকার বারবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। যেমন কোনো নিপুণ সঙ্গীতজ্ঞ একই রাগে নানা তান-আলাপ করে সেই রাগেরই স্বরগুলির মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকেন ঠিক সেইরকমই শ্রীকৃষ্ণ রকম-রকম ভাবে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে একই কর্ম-যোগকে সমগ্র গীতাতে বারবার বুঝিয়েছেন।

প্রথমে সাংখ্যমার্গের বিবেচনা করেছেন। তার দ্বারা আত্মার অমরত্ব এবং সংসারের মিথ্যাত্ব জানিয়ে কথা যখন সুরু করলেন অর্জুন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন যে, আপনি প্রথমে জ্ঞানের প্রশংসা করলেন তবে কেন এই ঘোর কর্ম করার জন্য আমাকে উত্তেজিত করছেন? আমার বুদ্ধি এর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। অতএব আপনি দয়া করে নিশ্চিতভাবে একটি কথাই বলুন যাতে আমার মঙ্গল হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বললেনঃ 'অর্জুন! যেমন আমি তোমাকে বলেছি, এই লোকে দুটি নিষ্ঠা প্রচলিত আছে। সাংখ্যেরা নিবৃত্তি-মার্গ, জ্ঞানযোগের কথা বলে-ছেন আর যোগীরা কর্মযোগের কথা বলেছেন কিন্তু মাত্র কর্ম না করলেই মানুষ কর্ম থেকে মুক্তি পায় না, না সন্ন্যাস থেকেই তার সিদ্ধিলাভ হয়। কেননা, জীবমাত্রেই এক ক্ষণের জন্যও কর্মরহিত বা কর্মশূন্য হতেই পারে না। প্রকৃতির প্রভাবে অবশ মানুষ কিছু না কিছু তো করতেই থাকে। আসলে কথা হল এই যে মানুষ ইন্দ্রিয়দের যদি কর্ম থেকে সরিয়েও নেয় তা হলেও মনে মনে বা মন দিয়ে কর্ম তো করতেই থাকে। এই ধরণের কাজ হল মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি। কিন্তু যে মন দিয়ে ইন্দ্রিয়দের নিগ্রহ করে, তাদের সংযত করে, অনাসক্ত হয়ে লোককল্যাণের জন্য ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা নিরন্তর

স্বধর্মাচরণ করতে থাকে সে-ই হল মানুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম। এই জন্য তুমি আপন কর্তব্য কর্ম করে যাও। কর্ম না করার চেয়ে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ। কর্ম ত্যাগ করলে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করাও সম্ভব নয়। সেইজন্য অলস বনে যেও না, আলস্যপরায়ণ হোয়ো না।

অবশ্য এটা জেনে রাখা উচিত যে, যে-কর্ম কেবল স্বার্থবুদ্ধিতে করা হয় এবং যাতে জনগণের সেবার নিতান্ত অভাব আছে, সেই জাতীয় কর্ম নিশ্চয়ই বন্ধনে ফেলে দেয়। এই ধরণের কর্ম মানুষকে অধঃপতিত করে। অতএব অর্জুন, কর্ম করো। কিন্তু ফলাসক্তি ত্যাগ করে শুধু লোক-কল্যাণের জন্যই।' ভগবান সংসারকে সৃষ্টি করেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গেই যজ্ঞকেও সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষদের এই বলেছেন যে যজ্ঞ হল তোমাদের কামধেনু অর্থাৎ সর্বার্থসাধক, সর্বকামপ্রপূরক। তোমরা এর দ্বারাই পুষ্পিত ও ফলিত হও অর্থাৎ সুসমৃদ্ধ হও। এই যজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ এই সৎকর্ম-সমূহের দ্বারা তোমরা জনতা-জনার্দনের সেবা করো এবং জনতা-জনার্দনও তোমাদের সেবা করবেন। এই পরস্পর আদান প্রদানের দ্বারাই তোমাদের কল্যাণ হবে। তোমরা অনাসক্ত থাকলেও ভগবান তো তোমাদের ঈপ্সিত ফল দেবেনই। কিন্তু সেবা না করে যারা কেবল নিজের পেট ভরানোর জন্যই দিনরাত পাক করে থাকে, তারা সব পাকা চোর। যারা পুণ্যশীল তারা লোক-সমূহের সেবা করেই আপন উদর-ভরণ করে থাকে। তারা পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু যে সব স্বার্থপর লোক কেবল নিজেদেরই চিন্তা করে, পরোপকারের প্রতি বিমুখ, তারা প্রকারান্তরে পাপই খায় অর্থাৎ ভোগ করে থাকে। সমস্ত বস্তুই কর্ম থেকেই উৎপন্ন হয়। কর্ম হল ভগবানেরই সন্তান বা সৃষ্টি। ভগবান হলেন সর্বব্যাপী ও অবিনাশী। কর্মে ভগবানের নিবাসস্থল। তাই কর্মকে ভগবান বলে বোঝো। কর্ম করা প্রকারান্তরে ভগবানেরই সেবা। সংসারের এই চক্র কর্ম দ্বারাই চলছে। যে কর্ম না করে এই চক্রে বলাধান করে না বা শক্তি জোগায় না তার জীবনই বৃথা।

এই জন্য লোভ আর ফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে সর্বদা নিঃস্বার্থ-ভাবে আপন কর্তব্য কর্ম করে যাও। স্বধর্মবিহিত কর্ম কখনও ত্যাগ কোরো না। তার দ্বারাই ঈশ্বর লাভ হবে।

দেখো, জনক নিষ্কামভাবে রাজত্ব করত। রাজ্য পালন করতে করতেই সে সিদ্ধিলাভ করেছিল কারণ রাজ্য করা কর্তব্যকর্ম বলে মনে করে সে স্বার্থ-ত্যাগ করে রাজ্যপালন করেছিল। অতএব, কর্তব্যকর্ম কখনও ত্যাজ্য নয়।

জনগণের সেবা করার একমাত্র সাধনও তো কর্মই। পুণ্যশীল মানুষেরা যদি আপন কর্তব্য ত্যাগ করে অলস বা নিশ্চেষ্ট হয়ে যান তা হলে অন্য

সাধারণ লোকেরাও সেই অলস জীবনেরই অনুকরণ করবে। বিশিষ্ট পুরুষেরা যে পথ দেখান সাধারণ লোকেরা তো তারই অনুকরণ করে থাকে। শ্রীভগবান বলছেনঃ আমার কর্ম করার কি দরকার? তা সত্ত্বেও এক ক্ষণের জন্যও আমি আপন কর্মে অবহেলা করি না। যদি প্রকৃতি নিজের কাজ বন্ধ করে দেয়, সূর্য-চন্দ্রের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়, সমুদ্র, নদী-নালা, বায়ু, অগ্নি সবাই আপন আপন কর্ম ছেড়ে দেয় তা হলে সংসার নাশ প্রাপ্ত হবে। এই কারণে যেমন অজ্ঞানী লোকেরা কামনায় আসক্ত হয়ে কর্ম করে ঠিক তেমনই জ্ঞানীও অনাসক্ত হয়ে কেবল প্রাণিগণের হিতের জন্য কর্ম করবে। যে-মূর্খ স্বার্থের দ্বারা প্রেরিত হয়েও সক্রিয় থাকে, তাদেরও নিষ্ক্রিয় করা উচিত নয়। তাদের কর্ম থেকে ছাড়িয়ে আনা বা মুক্ত করা উচিত নয়। সমঝদার লোক তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের সক্রিয় শক্তিকে লোককল্যাণের দিকে প্রেরিত করার জন্য প্রয়াস করবে। তাদের সেই সক্রিয় শক্তিকে লুপ্ত করা নয়, তার সদুপযোগই বাঞ্ছনীয়।

প্রকৃতি সবাইকে নাচায়। মূর্খ বা অজ্ঞানী মনে করে যে আমি করছি। কিন্তু জ্ঞানী জানে যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই সে দৌড়াচ্ছে। এইজন্য তার আসক্তিও কেটে যায়। যে সব মূর্খদের মনে আসক্তি আছে তাদের মনকেও সক্রিয় জীবন থেকে বিচ্যুত বা বিচলিত করে দেওয়া ঠিক নয়:

সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ হল এই যে, কর্ম করছে যে-লোক সে তার সমস্ত কর্ম আমাতেই অর্পণ করে, আমারই উপাসনা করতে থাকে, ফলে অনাসক্ত হয়ে, ফলের চিন্তা ভগবানে অর্পণ করে আপন কর্তব্য কর্ম করতে থাকে। এর থেকেই মানুষের বাসনা সমূহ বিনষ্ট হয়ে তাদের বন্ধন থেকে মুক্তি মিলে যায়। যারা এমন করবে না, তাদের বিনাশই অবশ্যম্ভাবী ধরে নিতে হবে। মানুষ আপন বৃত্তি বা স্বভাব অনুসারে বাধ্য হয়ে কিছু না কিছু করতেই থাকে। প্রকৃতি তাকে টেনে নিয়ে যায়। তাকে সে থামাবে বা আটকাবে কি করে? এইজন্য কর্ম না ছেড়ে ইন্দ্রিয়দের সুখ-দুঃখের অর্থাৎ এই সব দ্বন্দ্বের আসক্তি ত্যাগ করে, ফলের ব্যাপারে নিঃস্পৃহ হয়ে যে আপন বিহিত কর্মের পালন করে, সেইটিই শ্রেয়। কাম-ক্রোধ এই দুটি হল শত্রু। এই দুটি শুদ্ধ বুদ্ধির উপর আবরণ এনে ফেলে অর্থাৎ তাকে ঢেকে দেয়। এইজন্য ইন্দ্রিয়-দের বশ করে, কাম-ক্রোধকে ত্যাগ করে আপন কর্তব্য কর্ম করে যাও।

আমি যা বলছি সেই কর্মযোগ কোনো নতুন সিদ্ধান্ত বা মতবাদ নয়। এই যোগ পরম্পরাক্রমে চলে আসছে। আমি বিবস্বান্‌কে এই উপদেশ করে-ছিলাম। সে মনুকে বলেছিল। মনু ইক্ষ্বাকুকে জানিয়েছিল। এই পবিত্র ভাগবত ধর্ম কালক্রমে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি আজ তোমাকে বলছি।

এইটি জেনে যেমন পূর্বে জাত মুমুক্ষুরা কর্মের পালন করেছিলেন তেমনি তুমিও আপন কর্ম করতে থাকো।

কর্মের গতি বড় গহন। কর্ম কী, অকর্ম কী এবং বিকর্মই বা কী, তা পুরোপুরি বোঝা দরকার। জনক রাজত্ব করবেন কিন্তু তাঁকে সবাই বলত 'বিদেহ'। তিনি অনাসক্ত ছিলেন। স্বধর্মের জনাই তিনি রাজকার্য সামলেছিলেন বা পালন করেছিলেন। মহাভারতে কাহিনী আছে—এক ধর্মব্যাধ ছিল। সে মাংস বিক্রয় করে জীবিকানির্বাহ করত কিন্তু তাকেও ধর্মনিষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়েছে কারণ সে তার পৈতৃক অর্থাৎ বংশানুক্রমিক ব্যবসা অনাসক্ত হয়ে চালিয়ে যেত। তুলাধার বৈশ্যও জীবন্মুক্ত ছিল। সে-ও অনাসক্ত হয়ে বৈশ্যধর্ম পালন করত। স্বধর্মাচরণ যদি অনাসক্ত হয়ে করা যায়, তা হলে সেই কর্ম 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত হয়, কারণ সে-কর্ম কেবল লোকসংগ্রহের জন্যই করা হয়ে থাকে। কিন্তু শুধু এইটুকু বললেই কাজ চলে না যে স্বধর্মের আচরণ করতে থাকো। যদি চোর বলে চুরি করা আমার স্বধর্ম তা হলে তা দুরাগ্রহ হয়ে দাঁড়ায়। কেন? তার কারণ ভগবান কর্মকে যজ্ঞ বলেছেন কিন্তু যে কোনো কাজ যজ্ঞ হতে পারে না। গীতা কর্ম করার যুক্তি অর্থাৎ নিয়ম এবং বন্ধনের সীমাও বিস্তৃতভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সেই নিয়মের ভিতরে থেকে যে কাজ করা যায় সেগুলিই যজ্ঞ। এই পরিধির বাইরে যে কর্ম সে-সবই বিকর্ম অর্থাৎ দুষিত কর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

কর্মের কর্তার অভিপ্রায়ের চেয়ে তার লক্ষ্য প্রধান। সেই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য দ্বারাই তার মূল্যায়ন হয়ে থাকে। কাউকে মারা হল হত্যা, কিন্তু বিচারক যদি কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেন, তাহলে তাঁকে খুনী বলা যায় না, কেননা বিচারকের মূল উদ্দেশ্য হল ন্যায়বিধান। সেই সব নিয়মের পরিধির ভিতর আবর্তিত হলেই কর্মকে যজ্ঞ বলা যায়। এই জন্য এই কর্মযোগের নিয়মগুলি বোঝা এক আবশ্যিক কর্তব্য হয়ে পড়ে।

যাঁর সমস্ত যোজনা কামনা অর্থাৎ স্বার্থ এবং আকাংক্ষা, তৃষ্ণা থেকে মুক্ত, যাঁর কর্ম জ্ঞানপূর্বক আচরিত হয়, যিনি ফলসমূহের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করেন, যিনি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন, সেই সব মানুষ যে কাজই করুন না কেন সবই যজ্ঞ। যিনি আশার প্রবল প্রবাহ থেকে মুক্ত, যিনি মনকে নিজের বশে এনেছেন, সবরকম বিষয় থেকে মনকে গুটিয়ে নিয়েছেন তিনি দেহ দিয়ে কর্ম করতে থাকলেও বাস্তবে তিনি সন্ন্যাসীই।

যা মিলে যায় তাতেই সন্তুষ্ট, সুখ-দুঃখে উদাসীন, কারও বা কিছুরই প্রতি বিদ্বেষ নেই যার, তাকে কর্ম বন্ধনে ফেলতে পারে না। যে আসক্তি

ত্যাগ করেছে, যার বুদ্ধি বিবেকে সুস্থিত, যে শুধু লোক-কল্যাণের জন্যই কর্ম করে সে আসলে যজ্ঞই অনুষ্ঠান করে।

কর্ম ব্রহ্ম থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, সেইজন্য উপলব্ধি করো যে যা অর্পণ করা হয় সেই অর্পণের কর্ম হলেন ব্রহ্ম। দান দেওয়া হয়ে থাকে, সেই দানের সামগ্রীগুলিও ব্রহ্ম। দান গ্রহণকারীও ব্রহ্ম, দান কর্তাও ব্রহ্ম। এমন যার বোধ সে ব্রহ্মেই উপনীত হয়। এমন নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ, বিধিবদ্ধ কর্মের মধ্যে চোরের চুরির স্থান কোথায় সে-যজ্ঞশালায়?

আসলে কেবল কর্মের কোনো মহত্ত্ব নেই। মহত্ত্ব হল অভিপ্রায়ের বা উদ্দেশ্যের, সেই সব নিয়মের সেই সব বন্ধনের যার মধ্যে থেকে কর্ম করা হয়ে থাকে। কর্মকারীর অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্যেরই যথার্থ মহত্ত্ব। বন্ধনের সংকোচ বা শৃংখলের মধ্যে যে কর্ম করা হয় তাই হচ্ছে মানসিক ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের কষ্টিপাথর অর্থাৎ আসল যাচাই।

"যেখানে যেখানে ঘুরি তাই হল প্রদক্ষিণ, যা কিছু করি তাই সেবা
শয়ন করি যবে সে যে দণ্ডবৎ প্রণাম, পুজি না আর কোনো দেবতা
যা কিছু বলি তাই তব নাম, যা শুনি তাই তোমারই স্মরণ,
খাই-দাই তাই পুজা,
বাণী উজাড় করে সেই এককেই লিখি, দ্বিতীয়ের বোধকে ঘুচাই।"

শুধু পরমান্নের পাত্র বা সুভোগ্য সংগ্রহ করতে যে ব্যস্ত, ইন্দ্রিয়ের ভোগে ডুবে আছে এমন যে মানুষ সে কখনও এ দাবী করতে পারে না বা বলবার অধিকারী নয় যে, 'যা খাই-দাই তাই পুজা' বা 'আহার করি মনে করি আহুতি দিই শ্যামা মা'কে।' এ দাবী তো মায়ের সেই সুসন্তান কবীরই করতে পারত, যে 'সুখ-দুঃখের পারে যে পরম পদ আছে, তাতেই যুক্ত বা বিভোর হয়ে ছিল'।

এই নিয়মগুলি উপলব্ধি করার পর এমন কুতর্ক নিশ্চয়ই কেউ করবে না যে চোরের স্বধর্মও তো চুরি করা এবং ব্যবসাদারের স্বধর্মেও তো মিথ্যা বিহিত আছে।

সত্যের অপলাপ বা অপবাদের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু সেই সব অপলাপও অনাসক্তির নিক্তিতেই ওজন বা যাচাই করা হয়েছে।

তাই কর্মের রূপের নয়, তার রকমেরও নয়, ফলাসক্তি ত্যাগেরই মাহাত্ম্য। এই নিয়মের শৃঙ্খলাতেই হরেক রকম কর্মই যজ্ঞ হয়ে যায়।

ভগবান আবারও বলছেন, যে অজ্ঞানী, যার শ্রদ্ধা নেই, যে সংশয়ে দোলায়মান, তার না আছে ইহলোকে শান্তি, না পরলোকে। সংশয়াত্মার কোথাও সুখ নেই। কিন্তু যে কর্মযোগ দ্বারা কর্মে আসক্তি দূর করে





আত্মাতেই মনকে নিবিষ্ট করেছে এমন কর্মযোগীর আর কর্মের বন্ধন থাকে না। এই জন্য জ্ঞানের দ্বারা সংশয় নাশ করে হে অর্জুন! ওঠো এবং কর্মযোগে সুস্থিত হও।

কৃষ্ণের গোড়ার দিকের এই সব উপদেশে অর্জুনের বিষাদ অনেকটা কমে এল কিন্তু আসলে কৃষ্ণ তো অর্জুনকে দিয়ে কাজ করাতে চাইছিলেন। অর্জুনের তাই প্রয়োজন ছিল এক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি যে তাকে বলে দেবে যে এই যে নিজের ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম ত্যাগ করে বনে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণের ভাব তার উপর চেপে বসেছে, তা তার স্বধর্ম নয়। অর্জুনের মন বনে পালিয়ে যাবার ভাব থেকে সরে এল বটে কিন্তু কর্মযোগে আরূঢ় হবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে শিক্ষা দিলেন, তার পুরোপুরি প্রভাব এখনও কার্যকরী হল না। কৃষ্ণের সমগ্র উপদেশ তার কাছে এক জগাখিচুড়ির মত মনে হল।

সেই জন্য একটু যেন বিরক্ত হয়ে সে শ্রীকৃষ্ণকে বলল: 'কৃষ্ণ! তুমি তো কখনো সংন্যাসের প্রশংসা করে চলেছ। আবার কখনো কর্মযোগের তারিফ করছ। দয়া করে আমাকে সুনিশ্চিতভাবে বলো যে দুটির মধ্যে কোন্ পথটি শ্রেষ্ঠ।' এবার কৃষ্ণের পক্ষে একটি সুনিশ্চিত উত্তর দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ল, তাই তিনি বললেন: 'অর্জুন! দুটিই কল্যাণদায়ক পথ, তবু এই দুটির মধ্যে কর্ম-সংন্যাসের চেয়ে কর্মযোগই বেশি ভালো। সংন্যাসী তাকেই জেনো—কাপড় রাঙিয়েরা বা হিমালয়ের গিরি-কন্দরের নিবাসীরা নয়—যে না কোনো জিনিসে দ্বেষ করে আর না কোনো জিনিসকে কামনা করে, যে নির্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ ভালো-মন্দ দুইয়েতেই নিঃস্পৃহ হয়ে থাকে, যে অক্লেশে সব বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে। সংন্যাস এবং কর্মযোগকে অবুঝরাই আলাদা মনে করে।

বাস্তবে অর্থাৎ আসলে সমঝদার লোকেরা তো এই মনে করে যে এই দুইয়ের মধ্যে যে কোনো একটি পথে যদি যথাযথভাবে অবস্থিত হতে পারে তা হলে সে-সাধক দুইয়েরই ফল লাভ করে থাকে। সাংখ্য অর্থাৎ নিবৃত্তি মার্গ এবং কর্মযোগ অর্থাৎ প্রবৃত্তি-মার্গ দুইকেই যে এক বলে বোঝে সেই আসল বোদ্ধা বা সমঝদার। কিন্তু অর্জুন! সংন্যাস-মার্গের প্রাপ্তি কষ্টকর। কিন্তু যে কর্মযোগী সে অবিলম্বে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। যে কর্মযোগী, শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত, যে মনকে জয় করেছে এবং যে আপন আত্মাকে সব প্রাণীর মধ্যে দর্শন করে এবং সকলকে নিজের আত্মার মধ্যে দেখে, সে কর্ম করেও নির্লিপ্ত থাকে। এই জন্য দুইয়ের মধ্যে কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণ যদিও গোড়ার দিকে একটু সংক্ষেপে অর্জুনকে বোঝালেন. কিন্তু শেষে গীতার যেটি মর্মবাণী—ভাগবত ধর্ম অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গ, নিষ্কাম, কর্ম-

যোগ—তা কোনো প্রশস্তি বাক্যের রংচং ছাড়াই স্পষ্ট কথায় অনুমোদন করা দরকার ছিল।

তারও পরে যতক্ষণ অর্জুনের ঠিক ঠিক সমাধান বা নিঃসংশয় ভাব না হল ততক্ষণ এই সিদ্ধান্তেরই পুনরাবৃত্তি চলতে থাকল। কর্মযোগকে বার বার বলে চললেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে সব নিয়মের বন্ধনে থেকে কর্মযোগ করা উচিত তারও পুনরাবৃত্তি ভগবান করতেই থাকলেন, যাতে অর্জুনের এই বিভ্রম না হয় যে সব কর্মই বুঝি কর্মযোগ।

শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়দের নিয়ন্ত্রিত করে যে আপন এবং পরের মধ্যে আর ভেদবুদ্ধি রাখে না। ফলে অনাসক্ত, রাগ-দ্বেষ ত্যাগপূর্বক কামনাশূন্য হয়ে কর্তব্য বোধে কেবল লোকহিতের জন্যই কর্ম করতে থাকে এবং ফলের সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে যে কর্তা ফলকে ভগবানের চরণেই উৎসর্গ করে দেয়, সেই খাঁটি কর্মযোগী এবং এইরকম কর্মের নামই যজ্ঞ।

লোক-কল্যাণই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ

নারদ ব্যাসদেবকে বলেছিলেন: 'ভগবান! মহাভারতে আপনি ভক্তির স্বল্পতা বা ভক্তিকে কম করে দেখিয়েছেন, সেই জন্য আপনি শান্তি পাচ্ছেন না। এখন আপনি এমন কোনো গ্রন্থ রচনা করুন যাতে মানুষদের মধ্যে ভক্তির প্রসার ঘটে। এর ফলস্বরূপ আপনি শান্তি লাভ করবেন।' এই কথার পরেই তারই ফলে ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত সৃষ্টি করলেন।

কিন্তু ভগবদ্গীতাও তো মহাভারতেরই অঙ্গ এবং গীতা ভক্তিমার্গশূন্যও নয়। এই জন্য মহাভারতে ভক্তির কোনো স্থানই নেই, এমন কথা বলা পুরো-পুরি ঠিক বলা যায় না।

ভাগবত ধর্মের মধ্যে কর্মযোগ এবং ভক্তি দুইয়েরই সমাবেশ ঘটেছে, যা ভগবদ্গীতার একটি বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু গীতার ভক্তি ভাগবতের ভক্তি থেকে আলাদা। গীতার ভক্তিতে ভাবাবেশ নেই। গীতার ভক্তি যুক্তি এবং বুদ্ধির ভিত্তির উপর অবস্থিত।

এমনিতে তো গীতার প্রতি অধ্যায়েই শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির উপরও জোর দিয়েই গিয়েছেন। কিন্তু দ্বাদশ অধ্যায়টির নামকরণই করেছেন ভক্তিযোগ। সেই জন্য এই অধ্যায়ে ভক্তি বিশেষ আলোচনা আছে।

ভক্তির সম্বন্ধে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রারম্ভেই ভগবান অর্জুনকে বলে দিয়েছেন যে, যারা অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল এবং ধ্রুব সত্তার উপাসনা করে, যারা সর্বত্র সমবুদ্ধি পোষণ করে, ইন্দ্রিয়-সমূহকে সংযত রাখে সেই সর্বভূতের হিতকামীরা আমাকে ঈশ্বরকেই প্রাপ্ত হয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনকে এ-ও বলে দিয়েছেন যে দেহধারীর পক্ষে অব্যক্ত ঈশ্বরের এই উপাসনা বড় কঠিন। এই বলে শ্রীকৃষ্ণ সগুণ উপাসনাকেই অপেক্ষাকৃত সহজ বলে তার দিকেই জোর দিয়েছেন এবং এই পথের বিস্তৃত আলোচনাও করেছেন।

তিনি বলেছেনঃ 'যারা সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে, আমারই ধ্যান করে অনন্যভাবে আমারই উপাসনা করে তাদের আমি সংসার-সাগর থেকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করে দিই। অতএব, হে অর্জুন! তুমি নিজের মন আমাতেই যুক্ত করো। আপন বুদ্ধিকেও আমাতেই নিবিষ্ট করো। এমন করলে তোমার নিবাসও আমারই ভিতরে সুস্থিত হয়ে যাবে। যে প্রাণীমাত্রের প্রতি মৈত্রী করে, যে দয়ালু, যার মধ্যে 'আমি' 'আমার' ভাব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সুখ-দুঃখের পারে যে চলে গিয়েছে, যে ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, যত্নবান, দৃঢ়নিশ্চয়যুক্ত, মন ও বুদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে আমাকে অর্পণ করেছে, সে-ই আমার ভক্ত এবং সে আমার অত্যন্ত প্রিয়। যার কাছ থেকে কোনো লোক ক্ষুব্ধ হয় না, না সে অন্য লোক থেকে ক্ষুব্ধ হয়, হর্ষ ও ক্ষোভের অতীত যে, ভয়ভীত নয় যে, যে ইচ্ছাকে ত্যাগ ক'রে দিয়েছে, যে শুদ্ধ, কামনাশূন্য, ব্যথামুক্ত, যে সংকল্পসমূহকে ত্যাগ ক'রে দিয়েছে, যে না কোনো বস্তুর প্রতি অনুরাগ করে এবং না করে দ্বেষ, না চিন্তা করে, আর না ইচ্ছা করে, শুভ-অশুভে যে সমান, মিত্র ও শত্রুর প্রতি যে সমান ব্যবহার করে, মান ও অপমানেও যে সমান, শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখে যে বিচলিত হয় না, কোনো জিনিসে যার আসক্তি নেই, নিন্দা-স্তুতিতে যে সমান, বেশি কথা বলে না যে, যা পায় তাতেই যে সন্তুষ্ট, বুদ্ধি যার স্থির সে-ই আমার ভক্ত এবং সে-ই আমার প্রিয়। এইরকম বিস্তৃতভাবে ভক্তের এই ছত্রিশটি লক্ষণ গীতাচার্য ব'লেছেন। রাস-লীলার বা নাম-স্মরণের কোনো মহিমা কীর্তন করেননি।

কর্মযোগীর লক্ষণসমূহ আগে আলোচিত হয়েছে। ভক্তের লক্ষণেরও আলোচনা হয়ে গেল। কর্মযোগী এবং স্থিতপ্রজ্ঞ ও গুণাতীতের লক্ষণও এই সবের সঙ্গে অনেকাংশে মেল। এই দুইয়ে তফাৎ কি? গীতাচার্য ভক্তিকে এমন এক উচ্চস্তরে স্থাপন করে রেখেছেন যে তার সঙ্গে রাস-লীলা খাপ খায় না। বাস্তবিক পরিস্থিতি হ'ল এই যে না তো কর্মযোগীর পক্ষে না ভক্তিযোগের যোগীর পক্ষে সংসার-সাগর পার হওয়া কোনো শস্তা বা সুগম পণ্য। দুই জনকেই ইন্দ্রিয় সংযম ক'রে ইচ্ছা-দ্বেষাদি ত্যাগ ক'রে নিজেকে নিজে ঈশ্বরে সমর্পণ করতে হয়।

ঘৃত, তিল যবাদির বিশাল সংগ্রহকে নানা ধরণের বেদমন্ত্রের বিবিধ স্বরসহিত পাঠসহযোগে যদি কেউ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে মনে করে যে আমি এক বিরাট যজ্ঞ অনুষ্ঠান ক'রে নিজের জন্য স্বর্গের দুয়ার খুলে দিয়েছি, তা হলে সে প্রবঞ্চিত হয়। এই সব জিনিস পুড়িয়ে দেওয়াটা না যজ্ঞ, না কর্মযোগ। বাস্তব মনুষ্য-জীবনই হ'ল যজ্ঞ। এই হল প্রজ্বলিত অগ্নি।

লোক-কল্যাণের জন্য সৎ কর্মানুষ্ঠান এই হল অগ্নিতে আহুতি দান বা হোম করা।

কর্মযোগের আলোচনা আগে হয়ে গিয়েছে, কর্মযোগীর লক্ষণও বলা হয়েছে। সেই উক্ত নিয়মাবলীর বন্ধনে যুক্ত ক'রে এবং উচ্চ আদর্শকে সামনে রেখে যে কাজ করা হয়, তাই হচ্ছে কর্মযোগ এবং তার অনুষ্ঠানকারীই হলেন কর্মযোগী। এই রকম কর্ম যাঁরা করেন তাঁরা ঈশ্বরেরই পূজা ক'রে থাকেন, কারণ এই জাতীয় কর্ম হল যজ্ঞ। যজ্ঞই ভগবান্। এইজন্য কর্মও ঈশ্বর স্বরূপ এবং এই জাতীয় কর্মযোগী আপন কর্মের দ্বারা ঈশ্বরেরই পূজা করে থাকেন।

ঠিক সেইরকম ভক্তিমার্গের যে পথিক মনে করেন যে শেষ সময় অজামিলের মত নারায়ণের নাম উচ্চারণ মাত্র কিংবা এক হাজার বার রাম নামের মালা ফেরালেই অন্তকালে বৈকুণ্ঠ থেকে বিষ্ণুর পার্ষদরা এসে যমদূতদের তাড়িয়ে দিয়ে মৃত আত্মাকে বিমানে বসিয়ে সোজা বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবে, তারাও প্রবঞ্চনা করে নিজেদের। বলা হয় 'মানুষের সঙ্গে শুকপক্ষীও হরি নাম উচ্চারণ করে কিন্তু রামের প্রতাপ বা শক্তির কথা সে কিছুই জানে না।' বৈকুণ্ঠের পথ এত সহজ সুগম নয়। বলা হয় 'শূলের উপর শয্যা প্রিয়তমের' —এই শূলের উপর সোনা, এই হ'ল আসলে ভক্তি। কিন্তু 'যদগ্রে বিষমিত পরিণামে অমৃতোপমম্', যা প্রারম্ভে বিষ এবং শেষে অমৃত রূপ, তা-ও মুমুক্ষুর পথ। কর্মযোগী এবং ভক্ত দুইজনেরই পথ একই। মনসুরকে যখন শূলের উপর চড়ানো হচ্ছিল তখন শূলের তক্তার উপর থেকে হাঁক দিয়ে সে বলেছিলঃ 'হে ভগবৎ প্রেমিকরা! এই হল স্বর্গের সিঁড়ি। যারা স্বর্গে যেতে চায় চলে আসুক আমার সঙ্গে।' ভগবানের এ পথ কখনই ভোগের পথ নয়, তা সে কর্মযোগেরই পথিক হোক্ অথবা ভক্তিযোগের। এই দৈবী মার্গে বিকট সব উপত্যকা বা ঘাঁটি আছে। 'ভ্রান্তির পাহাড়ী নদী, মাঝে অহংকারের বাধা বড় বিকট যমঘাট।' এই দুই পথেরই পথিককে ভোগসমূহ ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু শেষে তো এই পথই হচ্ছে 'অমৃতোপমম্'।

'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ—এই লাভ বা প্রাপ্তির চেয়ে আর বড় লাভ কিছু নেই। 'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে', এতে স্থিত হবার পর বড়র চেয়ে বড় দুঃখও মানুষকে বিচলিত করতে পারে না।

এমন লক্ষ্যে যে পৌঁছাতে চায়, তার জন্য কর্মযোগ এবং ভক্তি দুই-ই উপরোক্ত নিয়মসহ শস্তা সওদা অর্থাৎ অনায়াসলভ্য।

দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্ত এবং চার লক্ষণসমূহের বর্ণনা আছে। কিন্তু বাস্ত-

বিক পক্ষে গীতার এই অধ্যায় কোনো অপবাদ নয় অর্থাৎ পূর্ব সিদ্ধান্ত বিরোধী নয়। গীতার প্রতি অধ্যায়ে কর্মযোগ এবং ভক্তি দুইয়েরই বারংবার প্রশংসা করা হয়েছে এবং এদের অনুমোদনও বরাবরই চলে এসেছে। 'রাগ, ভয় এবং ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে আমাতে মন নিবিষ্ট ক'রে যে আমার আশ্রয় নিয়ে জ্ঞানের দ্বারা পবিত্র হয়ে গিয়েছে, তেমন মানুষ আমাকেই পেয়ে থাকে।' আবার বলছেনঃ 'যে আমাকে সব যজ্ঞের ও তপস্যার ভোক্তা এবং সব লোকের স্বামী এবং সুহৃদ বলে জানে সে শান্তি লাভ করে।' 'যে আমাকে সর্ব-ভূতে অবস্থিত জেনে আমার পূজো করে সে যে-অবস্থাতেই থাকুক্ না কেন, তার নিবাস-স্থান বা আশ্রয় আমিই হয়ে থাকি।' 'এইজন্য সব সময় আমাকে স্মরণ করো আর কর্ম করো।' মনে থাকে যেন, 'স্মরণ করো' এবং 'কর্ম করো।'

'যাঁরা অনন্যভাবে আমার উপাসনা করেন এমন যোগীদের যোগক্ষেম দেখাশুনা আমিই ক'রে থাকি।' 'যাঁরা সতত আমার কীর্তন করতে থাকেন, আমার সামনে প্রণত হ'ন, তাঁরা আমারই পূজো ক'রে থাকেন।' 'যা করছ, যা খাচ্ছ, যা দিচ্ছ, যা তপস্যা করছ, সে-সবই আমাকে অর্পণ করো'।'

দশম অধ্যায়ে ভক্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য ভগবান্ নিজের বিভূতি সমূহের বর্ণনা করেছেন। একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন করছেন। আরো এগিয়ে গিয়ে ফের বলছেনঃ 'একাগ্র হয়ে ভক্তি দ্বারা যে আমার সেবা করে সে তিন গুণের পারে চলে গিয়ে স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়।'

এইভাবে সমগ্র গীতাতে কর্মযোগ এবং ভক্তি এই দুইয়ের নিরন্তর আদেশ এবং অনুমোদন চালু রাখা হয়েছে। কিছু শ্লোক কর্মযোগের প্রশংসারূপে আসছে তো ঠিক তার পরেই আবার ভক্তিরও প্রশংসা এসে যাচ্ছে। এইভাবে কর্ম এবং ভক্তি দুইয়েরই সংমিশ্রণ সারা গীতাতে রয়েছে।

মাঝে মাঝে অর্জুন নিজের সমাধানের আশংকা তুলেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিয়ে চলেছেন।

অর্জুনের বিষাদ তো দূর হল, কিন্তু মাঝে মাঝে নিজের মনের সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধানের জন্য সে প্রশ্নও করতে থাকে। যখন যথেষ্ট সমাধান হয়ে গেল সব প্রশ্নের, তখন শেষ সমাধানের জন্য ফের প্রশ্ন করছেনঃ 'হে কৃষ্ণ! আমাকে সংন্যাসের সম্পূর্ণ তত্ত্ব বুঝিয়ে দিন এবং ত্যাগের তত্ত্বও বিশদভাবে বলুন্' কৃষ্ণ উত্তরে বলছেনঃ 'অর্জুন! যে কর্ম কামনা এবং স্বার্থের জন্য করা হয়ে থাকে, তার ত্যাগই সংন্যাস আর কর্মের ফলে অনাসক্ত থাকা, এরই নাম ত্যাগ।' 'কোনো কোনো আচার্য বলেছেন যে সব কর্মকেই পাপ বলে জেনে তাদের ত্যাগ করে দেওয়া উচিত। কিন্তু অন্য আচার্যরা আবার এ-ও

বলেছেন যে যজ্ঞ, দান ও তপ—এ ছাড়বার জিনিস নয়। এ বিষয়ে আমার যা নিশ্চিত মত তা শোনো। তা হল এই যে যজ্ঞ, দান ও তপ কখনও ত্যাগ কোরো না, কেননা এগুলি মানুষের পক্ষে পবিত্রকারক।'

'দেহধারীর পক্ষে কর্মের সর্বথা ত্যাগ অসম্ভব, সেইজন্য যাঁরা কর্মফলের আশা ত্যাগ করেছেন, তাঁদেরই ত্যাগী বলা উচিত। যে অহংভাবকে ত্যাগ ক'রে দিয়েছে, যার বুদ্ধি কর্মসমূহে আসক্ত নয়, সে যদি কারও হত্যা ক'রে তা হলে সে সেই হত্যার দোষ থেকে মুক্ত। যে মানুষ নিজের নিত্যকর্মকে ত্যাগ করে না, সে আপন কর্তব্য কর্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ ক'রে থাকে।'

'যে ঈশ্বর থেকে ভূতবর্গ ও প্রাণীগণ উৎপন্ন হয়েছে এবং যাঁর দ্বারা এই সমগ্র সংসার পরিব্যাপ্ত, আপন কর্মের দ্বারা তাঁর উপাসনা করলেই সিদ্ধি লাভ হয়। কর্তব্য কর্ম যদি দোষযুক্তও মনে হয় তবু তা ত্যাগ করা উচিত নয়, কেননা যেমন ধোঁয়ার মধ্যে আগুন লুকিয়ে থাকে তেমনি শুভ কর্মও কখনও কখনও দোষের দ্বারা সমাচ্ছন্ন বলে দেখায়। কিন্তু অনাসক্ত হয়ে, মনকে জয় ক'রে, কামনা ত্যাগ ক'রে কর্ম যদি দোষ দ্বারা আচ্ছাদিত বলে মনেও হয় তা হলেও কর্তব্য-কর্মে বিমুখ হওয়া উচিত নয়, কেননা কর্ম করলেই সিদ্ধি লাভ হয়ে থাকে। যে ব্রহ্মে লীন সে না তো কিছু ইচ্ছা করে, না চিন্তা করে, সমস্ত প্রাণীকে সমদৃষ্টিতে দেখে। সে আসলে আমাকেই ভক্তি করে থাকে। যে সমস্ত কর্ম ক'রেও আমার আশ্রয়ে থাকে তারই শাশ্বত শান্তি লাভ হয়ে থাকে।'

ভগবান্ এবং অর্জুনের মধ্যে যথেষ্ট প্রশ্নোত্তর হয়ে গিয়েছিল। অর্জুনের সমাধানও হয়ে চলেছিল, তা সত্ত্বেও অর্জুন মাঝে মাঝে প্রশ্ন উত্থাপন করেই চলেছিলেন। অর্জুন ছিলেন নরের অবতার, ভগবান ছিলেন নারায়ণের অবতার। এখন এই প্রশ্নোত্তরের অবসান ঘটাবার জন্য নারায়ণের অবতার শ্রীকৃষ্ণ নরের অবতার অর্জুনকে বললেনঃ 'অর্জুন! শোনো, আমার ধ্যান করো, তার থেকেই তোমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, সব কাঠিন্য দূর হয়ে যাবে কিন্তু তুমি যদি অহঙ্কারের বশে আমার পরামর্শ না শোনো তা হলে তোমার নাশ হয়ে যাবে। যদি তুমি অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে মনে কর যে আমি যুদ্ধ করব না অর্থাৎ আপন কর্তব্য কর্ম পালন করব না, তা হলে তোমার এ নির্ণয় বা সিদ্ধান্ত মিথ্যা, অপসিদ্ধান্ত, কেন না তোমার প্রকৃতি তোমাকে কর্মের দিকে টেনে নিয়ে যাবেই।'

'মানুষ আপন স্বভাবে আবদ্ধ হয়েই বিচরণ করে থাকে। এইজন্য তুমি না চাইলেও তবু তোমাকে কর্ম করতেই হবে। ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে অধি-ষ্ঠিত থেকে সমস্ত প্রাণিবর্গকে পরিচালন করছেন। সেইজন্য অহঙ্কার ত্যাগ

ক'রে ভগবানের শরণে এসে অনাসক্ত হয়ে আপন কর্তব্য কর্ম ক'রে যাও। মন আমাতে লাগাও, আমাতেই ভক্তি করো, আমাকেই প্রণাম করো। তা হলে আমাতেই তুমি সমাবিষ্ট বা মিলিত হয়ে যাবে। এই আমার প্রতিজ্ঞা বলে জানো। এই তর্ক-বিতর্ক শেষ ক'রে এখন তুমি আমার শরণে এসে যাও। আমি তোমায় রক্ষা করব। চিন্তা ত্যাগ করো।' শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলার পর অর্জুন সন্দেহমুক্ত হয়ে গেলেন। তাঁর মুখও বন্ধ হয়ে গেল। হৃদয়ের অজ্ঞান-গ্রন্থির মোচন হ'ল। জ্ঞানের প্রকাশ ঘটল। তখন কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'কি অর্জুন, এখন তোমার সন্দেহ গেল, না নয়?' অর্জুন বললেনঃ 'হে অচ্যুত! আমার সন্দেহ মিটে গিয়েছে। এখন তুমি যেমন বলেছ, তেমনিভাবে আপন কর্তব্য কর্মে আমি ব্যাপৃত হ'ব।'

কর্মযোগী বা ভক্তের উপরোক্ত বিবরণ থেকে প্রতীত হয় যে এদের দুজনেরই সব লক্ষণ একই সমান। সমুদ্রের জল বঙ্গোপসাগর থেকেই তোলো বা ভারত মহাসাগর থেকে অথবা পশ্চিম সমুদ্র থেকে, সর্বত্রই একই নোনা জল। সেইরকম গীতায় পুনরুক্তিতে বোঝাই এবং তা জেনে বুঝেই ব্যাসদেব রেখেছেন। কিন্তু সেই সমগ্র উপদেশ একই সমান।

গীতাপাঠ হিতকর কিন্তু সংক্ষেপে যদি দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণগুলি আমরা মনন করি, অথবা দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তের লক্ষণগুলি পাঠ করি কিংবা চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতদের আচরণ বা ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী সম্পদ্‌যুক্তদের লক্ষণ পড়ি, তা হলে তাদের মধ্যে সবগুলিই একই ভাবে আমাদের প্রেরণা জোগাবে।

শ্রীকৃষ্ণ গীতা দ্বারা শুধু মাত্র অর্জুনকে নয় কিন্তু সমগ্র মানব-সমাজকে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু সেই উপদেশামৃতকে তিনি জোর ক'রে কাউকে তো গুলে খাইয়ে দিতে পারেন না। যিনি মুক্তিকামী তাঁকে সিঁড়িতে উঠবার জন্য, সোপানাবলীতে আরোহণের জন্য নিজেকেই পরিশ্রম করতে হয়। যদি তিনি স্বয়ং সাধনায় অবহেলা করেন, তা হলে গীতা বা অন্য যে কোনো শাস্ত্রের অধ্যয়ন নিষ্ফল।

এই সব নানা কঠিন সর্ত, যা কর্মযোগী এবং ভক্ত উভয়ের পক্ষেই সমান, তা দেখে সাধকের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। ভগবান্ অন্তরেই বসে আছেন, শুধু ডাকার অপেক্ষা। আত্মজ্ঞান দুর্লভ নয়। কিন্তু মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভের ইচ্ছা চাই। অলসদের পক্ষে ভগবৎ পথ দুর্লভ। আবার ভক্ত সাধকদের পক্ষে তা অত্যন্ত সুলভ ও সুগম।

'রাম বলছেন সুগ্রীবকেঃ লঙ্কা আর কত দূর?

অলসের কাছে তা অনেক দূর,

উদ্যমশীলের নিকট হাতের কাছেই, হুজুর।'

সংক্ষেপে এই হল গীতার সার। আপন কর্তব্য-কর্মকে কখনও ছেড়ো না। মন দিয়ে আপন স্বধর্মের আচরণ করে যাও। মঙ্গলের কারণেই সব প্রাণীর সেবার জন্য কর্ম করো। ফলের পিছনে দৌড়ো না। ইন্দ্রিয়-ভোগের প্রতি বিরাগী হও। মন এবং বুদ্ধির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখো। ভগবানে ভরসা রাখো। যা কিছু কাজ করো, তা তাঁকেই অর্পণ করে দাও। দিন-রাত সেই প্রভুর স্মরণ করো। ঈশ্বরে এবং তোমাতে কোনো ভেদ বা পার্থক্য নেই, কেননা তোমাতে এবং অন্য সব ভূতবর্গে সেই একই সত্তা ব্যাপকরূপে বিরাজমান। তেমনি তুমিও সকলের মধ্যে অবস্থিত। অতএব যা ব্রহ্ম তাই তুমিও। তুমিও হচ্ছ ব্রহ্ম। দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত থাকো, সুখ-দুঃখ বা মান-অপমানকে সমান ব'লে মনে করো। চিন্তা ছেড়ে দাও। তারই ধ্যান অর্থাৎ সর্ব প্রাণীতে যে তিনি অবস্থিত সেই ঈশ্বরের ধ্যান করো। এর তাৎপর্য হল এই যে সব প্রাণীর জন্য চিন্তা অর্থাৎ ধ্যান অর্থাৎ তাদের মঙ্গলের জন্য কর্ম করো।

'মানুষ ভগবান্ নয় কিন্তু মানুষ ভগবান্ থেকে আলাদাও নয়'—এই বিশ্ব হ'ল এই বিরাটেরই রূপ। এই হল বিশ্ব-দর্শন। ঈশ্বর-দর্শনও এই-ই। তুমিও তাই—'তৎ ত্বম্ অসি'। জনক ইত্যাদি রাজত্ব করতে থেকেও, কর্ম করতে থেকেও অনাসক্ত রয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদেরই অনুকরণ বা অনুসরণ করো। ভগবান্ নিজের রচিত সৃষ্টি এবং সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বিচরণ করতে থেকেও পদ্ম যেমন জলে অলিপ্ত থাকে, তেমনই অলিপ্ত থাকেন। তুমিও সেইরকমই আচরণ করো।

এতখানি বলার পরেও শেষে তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই করো।'

এই শুনে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেনঃ 'এখন আমি স্বস্থ হয়েছি। এখন আপনি যা বলবেন, তা-ই করব।' এই হল গীতার সার।

প্রত্যেক অধ্যায়ে বিচরণ করতে করতে আমরা এই দেখতে পাব যে উপরোক্ত যে সার বলা হল, সমগ্র গীতায় তারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সমুদ্রের সারা জল, তার তরঙ্গাবলী, তার প্রতিটি জলকণা সেই একই প্রভুর সত্তার ছবি। একই শক্তি বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। দ্বৈতের বা দ্বিতীয়ের কোনো স্থান নেই।

'অহং ব্রহ্মাস্মি' বা 'তত্ত্বমসি'রও এই-ই অর্থ।

ব্যাসদেবের কৃপায় সঞ্জয় মহাভারতের যুদ্ধ দেখবার জন্য দিব্যদৃষ্টি এবং শুনবার জন্য দিব্য শ্রবণ-শক্তি লাভ করেছিলেন। এইজন্য দূরে বসে বসেও

যুদ্ধের সব ক্রিয়া-কলাপ দেখতে থাকতেন এবং সেখানে যা কিছু হ'ত তা শুনতেও থাকতেন। এই সব দেখে ও শুনে সমগ্র বিবরণ ধৃতরাষ্ট্রকে শোনাতেন। তিনি যখন কৃষ্ণ-অর্জুনের এই অদ্ভুত বার্তালাপ নিজের দিব্য শ্রবণ-শক্তি দ্বারা শুনলেন, তখন তিনি বিহ্বল হয়ে গেলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে বলে উঠলেনঃ 'রাজন্! এই অদ্ভুত পুণ্য সংবাদ শুনে আমি গদ্গদ এবং তা মনে ক'রে এবং ভগবানের অদ্ভুত স্বরূপকে স্মরণ ক'রে আমার মহা বিস্ময় হচ্ছে এবং বারবার হর্ষ-রোমাঞ্চ জন্মাছে। হে রাজন্! আমার সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত শোনো—যেখানে কর্মযোগী-যোগেশ্বর কৃষ্ণের রূপে যে কোনো কর্মযোগী আছেন এবং যেখানে অর্জুনের রূপে নিষ্ঠাবান্ পরিশ্রমী যে কোনো উদ্যমশীল সাধক আছেন সেখানে শ্রী আছে, বিভূতি আছে, বিজয় আছে এবং আনন্দ আছে। এই আমার নিশ্চিত মত ব'লে জেনো।'

দুই মহাকাব্যে কৃষ্ণ

যেমন আগে বলা হয়েছে, নারদের আগ্রহেই ব্যাসদেব মহাভারতের পর ভাগবত লেখেন। এ কথাও পূর্বে জানান হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণই ভাগবত ধর্মের পুনঃ সংস্থাপন করেছিলেন। মহাভারত এবং ভাগবত দুই-ই এই প্রবৃত্তি-প্রধান কর্মযোগ এবং ভক্তির সমর্থক। যদিও দুটিই এই ভাগবত ধর্মের প্রচারক, কিন্তু যেখানে ভাগবতের ভক্তি ভাবনা বা আবেগময়, সেখানে মহাভারতের ভক্তি ভাগবতের ভক্তি থেকে কিছু ভিন্ন জাতীয়। মহাভারতের ভক্তিতে বেদান্ত এবক্ষ বুদ্ধিকে মহত্ত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। এই ভেদের দরুণ ভাগবতের কৃষ্ণ এবং মহাভারতের কৃষ্ণেও পার্থক্য আছে। এই 'অন্তর' বা পার্থক্য মহাভারতের কৃষ্ণের জীবনের গভীর অনুশীলনেই সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় বা প্রকট হয়। ভাগবতের কৃষ্ণ হলেন উপাস্য। মহাভারতের কৃষ্ণ অনুকরণীয়। এ কথা বলা হয়ে গিয়েছে।

নারদের প্রস্তাব অনুসারেই ব্যাসদেব ভক্তিমার্গের এই গ্রন্থ ভাগবত রচনা করেন। ভাগবতের মুখ্য বা প্রধান চরিত্র হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকে ব্যাসদেব সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপে মেনে নিয়ে তাঁর চরিত্রে এমন সব কাহিনী সন্নিবিষ্ট করেছেন যাতে ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রকট হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে ভক্তির প্রচার হয়।

এ কথা হয় তো অনেকের জানা না থাকতেও পারে যে ভাগবতে এক জায়গায় তো শ্রীকৃষ্ণকে চব্বিশ অবতারের মধ্যে গণনা করা হয়েছে, আবার এগিয়ে গিয়ে এই সব অবতারের তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ ভাগবতকার যখন শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্ ব'লে মেনে নিয়েছেন তা হ'লে তাঁকে আবার অবতার ব'লে কি ক'রে মানা যায়? এইজন্য ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকে এক মহাপুরুষের জীবন-চরিত ব'লে মানলে ভুল কারা হবে।

ফলতঃ ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিই হ'তে পারে। তাঁর অনুকরণ হ'তে পারে না। তিনি শুধু উপাস্য মাত্র।

কিন্তু মহাভারতের রচনা আলাদা ধরনের এবং সেখানকার কৃষ্ণও আলাদা প্রকৃতির। মহাভারতের উদ্দেশ্যও আলাদা। এ এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ। এর মধ্যে মহাপুরুষদের এবং তাঁদের দোষ-গুণের এমন পূর্ণাঙ্গ ছবি তোলা হয়েছে, যাতে সর্বকালীন পাঠকদের এই জ্ঞান বা উপলব্ধি জন্মে যায় যে যে-কোনো দেহধারী মানুষ—তা সে উঁচুই হোক্ বা নীচুই হোক—তার জীবন লোক সংগ্রহের জন্য এবং লোকদের সামনে দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপনের জন্যই। এইজন্য যিনি মহান্ তাঁকেও জনকল্যাণের জন্য কখনো কখনো এমন এক কাজ করতে হয়, যা দোষযুক্ত ব'লে দেখালেও উৎকৃষ্ট।

তার কারণ, কর্তার উদ্দেশ্য হল জন-কল্যাণ। এই হেতু, কারণ বা উদ্দেশ্যকে গ্রহণ ক'রে মহাভারতে ব্যাসদেব নীতি এবং ব্যবহারের এক অদ্ভুত সমন্বয় সাধন করেছেন এবং প্রকারান্তরে এই বলেছেন বা জানিয়েছেন যে যে-নীতি দ্বারা ব্যবহার সাধিত হয় না, সে-নীতি নীতি নয় এবং যে-ব্যবহারে নীতির লোপ ঘটে থাকে সে-ব্যবহার নয়, অধর্ম। এ এক চরম ও পরম সমন্বয়।

এইজন্য মহাভারতের পাত্রবর্গের ছবি তুলতে গিয়ে ব্যাসদেব না তো পূজনীয়দের দোষগুলির উপর পরদা টেনে দিয়েছেন আর না অপূজ্যদের গুণগুলি লুকোবার বা ঢাকবার চেষ্টা করেছেন। এ ব্যাসদেবের এক অদ্ভুত কেরামতি, যাকে মনন করা, পুরোপুরি উপলব্ধি করা এবং সময় উপস্থিত হলে, দরকার পড়লে তার অনুকরণ করা সর্বকালের পাঠকের জন্য—তা সে-পাঠক আজকেরই হোক্ বা হাজার বছর পরেরই হোক্—বিশেষ মূল্যবান্। অত্যন্ত সারগর্ভ।

মহাভারতে সব চেয়ে বরিষ্ঠ পাত্র হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণই। সেইজন্য তাঁর কথা-গুলিকে বোঝা আমাদের জীবন-যাত্রাকে সুগম করার পক্ষে অত্যন্ত মহত্ত্ব-পূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বড় গহন ও অদ্ভুত। অবতারবাদকে যদি অবহেলাও করি অর্থাৎ মানতে না চাই, তবুও এ গহনই থেকে যায়। পণ্ডিতেরা অনেক গভীরভাবে কৃষ্ণ-চরিত্র অধ্যয়ন করেছেন, অনেক কিছু লিখেছেন। দুই কারণে বা দৃষ্টিতে লিখেছেন—এক ভক্ত হয়ে গিয়ে, দ্বিতীয় নিজের জীবনে কৃষ্ণের চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য। ভক্তদের জন্য ভাগবতের কৃষ্ণ হলেন উপাস্য। কিন্তু যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র থেকে নিজের জীবনযাত্রার পথকে সুগম এবং নীতিসম্মত করার জন্য অনুকরণ করতে চান তাঁদের কাছে কৃষ্ণ-চরিত্র

দীপশিখার কাজ ক'রে থাকে। তাঁরা এর অধ্যয়ন বা অনুশীলন থেকে এটা বুঝে বুঝবেন যে কেন ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বুধ, ধীর, কবি, প্রাজ্ঞ, যোগেশ্বর এবং জ্ঞানী বলেছেন।

ব্যাসদেব মহাভারতে যে কৃষ্ণের চরিত্র লিখেছেন তা অবতারের নয় কিন্তু এক মহান্ পুরুষের। তা লিখতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের দূরদর্শিতা দেখিয়েছেন এবং তাঁর দোষগুলিও এমন কেরামতি বা নৈপুণ্যের সঙ্গে গুণে পরিণত করেছেন যে পাঠক পড়ে যায় অথচ তার কল্পনাতেও আসে না যে কৃষ্ণের উপর কোনো দোষ আরোপিত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডবদের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ ও অনুগ্রহ ছিল। তাঁর প্রথম সম্পর্ক দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের পরেই পাঞ্চালে ঘটেছিল। যদিও স্বয়ম্বরে শ্রীকৃষ্ণও যাদবদের সঙ্গে সভায় উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তিনি মৎস্যবেধের জন্য কোনো প্রয়াসই করেননি, কেননা তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবরাই জিতবে। আর যদিও শ্রীকৃষ্ণের তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা সম্পর্ক ছিল না কিন্তু বিনা সম্পর্কেও পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর পক্ষপাত জন্মে গিয়েছিল। তার একটি কারণও ছিল যে পাণ্ডবদের প্রতি কৌরবদের দ্বারা অত্যাচারিত অন্যায়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণের বেদনাবোধ। পঞ্চ পাণ্ডবের জননী কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের পিসি হতেন। কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের বোন ছিলেন। যাদবদের এক প্রধানের নাম ছিল কুন্তিভোজ। তাঁর কোনো সন্তানাদি ছিল না। এইজন্য বসুদেব নিজের বোন, যার নাম ছিল পৃথা, কুন্তিভোজকে দত্তকরূপে সঁপে দিলেন। কুন্তিভোজ পৃথাকে দত্তক নিয়ে তার নাম কুন্তী রাখলেন। এইভাবে যদিও পাণ্ডবরা শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মীয় ছিলেন তা হলেও সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে প্রথম সম্পর্ক দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের পরেই ঘটেছিল। কিন্তু এত বছর ধরে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হ'ননি এ-ও এক আশ্চর্যের কথা। এই সম্পর্কের পর ঘনিষ্ঠতা দৃঢ় হ'ল এবং পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে গেলেন।

অর্জুন তো ধরতে গেলে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণস্বরূপই ছিলেন। কিন্তু পঞ্চ পাণ্ডবের প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ এবং পক্ষপাত এত স্পষ্ট ও প্রকট ছিল যে সময় সময় দরকার পড়লে শ্রীকৃষ্ণ সত্য বা সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়েও তাদের সহায়তা করেছেন। এটি মহাভারতের স্থানে স্থানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ হয়ে যাবার পর ভীষ্ম পিতামহ এবং ধৃতরাষ্ট্রের অন্য পরামর্শদাতারা ধৃতরাষ্ট্রের উপর চাপ দিলেন যে পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা জিইয়ে রাখলে তা কৌরবদের পক্ষে হানিকারক হবে।

অই খানিকটা চাপে পড়ে, খানিকটা ভয় পেয়ে, ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন এবং যুধিষ্ঠিরের মধ্যে রাজ্য ভাগ বাটোয়ারা ক'রে দিলেন এবং খাণ্ডবপ্রস্থের রাজধানী স্থাপন ক'রে যুধিষ্ঠিরকে সেখানকার রাজা ক'রে দিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের সময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত থেকে পাণ্ডবদের শুভকামনা এবং আশীর্বাদ প্রদান করলেন।

খাণ্ডবপ্রস্থ একটি ঊষর মরুভূমি ছিল। না ছিল সেখানে জল, না ছিল শ্যামলিমা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহে ইন্দ্র অনুগ্রহ ক'রে সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটালেন এবং সেই নির্জন স্থানটিকে সবুজ সরস স্নিগ্ধ করে দিলেন। সেইজন্য যুধিষ্ঠির খাণ্ডবপ্রস্তের নাম বদলে ইন্দ্রপ্রস্থ ক'রে দিলেন। রাজা হয়ে যুধিষ্ঠির ন্যায়পূর্বক প্রজা পালন করতে লাগলেন। শান্তি ও সুস্থিরতা স্থাপিত হ'ল এবং যুধিষ্ঠির সকল লোকের কাছে প্রিয় হয়ে উঠলেন।

পরম পুরুষ কৃষ্ণ

এরই মধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটল যার দরুণ অর্জুনকে এক বছরের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ ছেড়ে তীর্থযাত্রার জন্য বাইরে যেতে হল। এই চিত্তাকর্ষক ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ মহাভারতে আছে। তীর্থযাত্রায় তিনি দক্ষিণের সমস্ত তীর্থে গেলেন এবং তারপর যখন ফিরে আসছেন তখন তাঁর মন দ্বারকায় যাবার জন্য উৎসুক হল। শ্রীকৃষ্ণ তো সেখানে ছিলেনই কিন্তু এ যাত্রার একটু অন্য কারণ ছিল।

আসল ব্যাপার ছিল এই যে শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার রূপ এবং গুণের খ্যাতি অর্জুনের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল এবং তাঁর এতে বিশেষ আকর্ষণ জন্মেছিল। সুভদ্রাকে না দেখেই তিনি তার প্রতি মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন।

দ্বারকা যাবার পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সুভদ্রাকে দেখা। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এ-ও চাইছিলেন না যে দ্বারকায় কেউ জেনে যায় যে অর্জুন দ্বারকায় এসেছেন। এইজন্য সারা শরীরে বিভূতি লাগিয়ে, হাতে ত্রিশূল নিয়ে সন্ন্যাসীর বেশ ধারন ক'রে তিনি দ্বারকায় পৌঁছালেন এবং একটি গাছের তলায় আসন বিছিয়ে চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে তিনি কায়েম হয়ে বসলেন।

এদিকে সারা দ্বারকায় তো তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। এক মস্ত সাধু মহাত্মা এসেছেন। দ্বারকাবাসীরা দলে দলে তাঁর দর্শনের জন্য ভেঙে পড়লেন। স্বয়ং বলরামও তাঁকে দর্শন করবার জন্য এলেন কিন্তু তিনি অর্জুনকে চিনতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণও গেলেন কিন্তু তাঁর কাছে এই ছলনা লুকানো রইল না। তিনি ছদ্মবেশী অর্জুনকে ঠাট্টা ক'রে বললেন : 'অর্জুন! একি তামাশা করতে এসেছ?' অর্জুন বললেন: 'আমাকে কেন

জিজ্ঞাসা করছ? তুমি তো জানোই আমি সুভদ্রার প্রতি মুগ্ধ এবং তাকে বিবাহ করতে চাই।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেনঃ 'আমি তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু তার আগে এটা তো জেনে নাও যে সুভদ্রাও কি তাই চায় যা তুমি চাইছ? যদি সুভদ্রার ইচ্ছা তোমার অনুকূলে হয় তা হলে তাকে তুলে নিয়ে যাও। ক্ষত্রিয়দের এই হল পরম্পরাগত রীতি। তুমিও সেই পথই অনুসরণ করো।'

এদিকে বলরামের উপর এই 'সাধু'টির গভীর প্রভাব বা ছাপ পড়ল। তিনি প্রস্তাব দিলেন যে সাধুজিকে সুভদ্রার বাগানেই এক কোণায় এনে রাখা হোক্, যাতে সুভদ্রা সাধুটির সেবা করার এবং তাঁর আশীর্বাদ লাভ করার সুযোগ পায়। শ্রীকৃষ্ণ তো মনে মনে এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত ছিলেন কিন্তু দেখাবার জন্য তিনি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন এবং বললেন আমাদের জানা নেই এই সাধুটি কিরকম লোক। এইজন্য একে মেয়েদের এলাকায় থাকতে দেওয়া উচিত হবে না। সাধুটি এবং সুভদ্রা দুজনেই যুবা, তাই এই দুজনের বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হওয়া বাঞ্ছণীয় নয়। কিন্তু বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে উল্টে বকে দিলেন। সাধুর চরিত্রের উপর সন্দেহ করা পাপ।

শেষ-পর্যন্ত সুভদ্রার মহলেই সাধুটিকে বসবাসের স্থান দেওয়া হয়ে গেল। সুভদ্রা জানতেন না সাধুটি কে। কিন্তু অর্জুনের খ্যাতির কথা তাঁরও শোনা ছিল। তিনিও মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন যে অর্জুনকেই বিবাহ করব। সাধুটির সেবা-শুশ্রূষা করতে করতে একদিন সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'মহারাজ! আপনি তো সারা দেশ পর্যটন ক'রে এসেছেন, আপনি কখনও অর্জুনকে কি দেখেছেন? আমি তাঁর প্রশংসা শুনেছি, কিন্তু তার সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই।'

অর্জুন এবার আর নিজেকে সুভদ্রার কাছ থেকে আত্মগোপন করা যুক্তি-যুক্ত মনে করলেন না এবং তিনি সুভদ্রাকে বললেনঃ 'দেবি! অর্জুন তো তোমার সামনেই বসে আছে।' অর্জুন সুভদ্রার প্রতি আসক্ত ছিলেন এবং সুভদ্রাও অর্জুনের প্রতি মোহগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু এই রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হওয়ার পর সুভদ্রা আর সাধুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা উচিত মনে করলেন না এবং সাধুটির সামনে আসা-যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলেন। ফলে মনে মনে সন্তপ্ত হয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

কি করা উচিত তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। অর্জুন তাঁর নিকটে থেকেও এখন দূরে। তার সঙ্গে বিচ্ছেদের দরুণ বড়ই ম্রিয়মাণ হয়ে দিন কাটাতে লাগল। সাধুটির সেবা শুশ্রূষা তিনি ছেড়ে দিলেন। তার জায়গায় এখন রুক্মিনীই সেবার কাজে যেতে লাগলেন।

রুক্মিনী তো সারা ব্যাপারটা জানতেনই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে সুভদ্রার বিকলতা বা দুরবস্থার কথা জানালেন। সুভদ্রার অসুস্থ অবস্থার প্রতি-কারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলরামের কাছে এক প্রস্তাব রাখলেন যে কাছেরই এক দ্বীপে শিবের এক মন্দির আছে। সেখানে দু সপ্তাহ শিবের পুজো করানো যাক যাতে সুভদ্রার রোগমুক্তি হয়। এই প্রস্তাব সকলেরই পছন্দ হল এবং যে যেখানে ছিল সব প্রধান যাদবরা দ্বারকা ছেড়ে শিবের পুজার জন্য সেই দ্বীপে চলে গেলেন। এখন সুভদ্রা ও অর্জুন একলা দ্বারকায় রয়ে গেলেন।

যাবার আগে শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রাকে বললেনঃ 'সুভদ্রা! আজ থেকে বারো দিনের দিনটি খুব শুভদিন। সেই দিন তোমরা দুজনে বিবাহ-কার্য সু-সম্পন্ন করে ফেলো। আমি চললাম, পরের কাজ এখন তোমাদের দুজনের। অর্জুনকেও আমি সব কথা বুঝিয়ে দিয়েছি।'

বারো দিনের দিন অর্জুন সুভদ্রাকে বললেনঃ 'সুভদ্রা! শ্রীকৃষ্ণ তো তোমাকে সবই বলে দিয়ে গিয়েছেন, সেই শুভদিন আজ এসে গিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ আছে আর আমি হচ্ছি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়দের পক্ষে গান্ধর্ব বিবাহের বিধান আছে। তদনুসারে আমি এখন যা কিছু করছি। এবার রথ তৈরী করাও এবং আমার সঙ্গে চলো।' সুভদ্রা অর্জুনের কথামত সব কিছু প্রস্তুত করে নিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বীপে যাবার আগেই নিজের রথ ও অস্ত্র-শস্ত্র জেনে-শুনে ইচ্ছা করেই ফেলে গিয়েছিলেন। যাতে সময়মত অর্জুন সেগুলি কাজে লাগাতে পারেন। সুভদ্রা রথ চালাতে পটু ছিলেন। এইজন্য রথে সুভদ্রা সারথির জায়গায় বসলেন আর অর্জুন বসলেন পিছনে। সুভদ্রা ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালাতেই রথ ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলল। দ্বারপালেরা যখন দেখল যে সুভদ্রাকে কেউ হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে এবং সেই হরণকারীকে অর্জুনের মত লাগল, তখন তারা হৈ চৈ সুরু করল। রথ থামাতে বা আটকাতে চেষ্টা করল কিন্তু রথ ইতিমধ্যে অতি দ্রুত বেগে অনেক এগিয়ে বেরিয়ে চলে গিয়েছে।

বৃষ্ণি যোদ্ধারা অর্থাৎ যদুবংশীয়েরা যখন খবর পেলেন যে সুভদ্রা হরণ হয়ে গিয়েছে, তখন তাঁরা তাড়াতাড়ি দ্বারকায় ফিরে এলেন এবং ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে অর্জুনকে পাকড়াও করার জন্য মতলব আঁটতে লাগলেন। বলরাম তো রেগে আগুন হয়ে গেলেন এবং বললেনঃ 'আমি সব পাণ্ডবদের মেরে ইন্দ্রপ্রস্থকে তছনছ ক'রে ধ্বংস করব।' শ্রীকৃষ্ণ চুপ-চাপ শুনে গেলেন। বলরাম যখন দেখলেন কৃষ্ণ কোনো উচ্চবাচ্য করলেন

না, তখন তাঁকে বললেনঃ 'কৃষ্ণ! তুমি চুপ ক'রে আছ কেন? মনে হচ্ছে তোমারও এই ষড়যন্ত্রে কিছু হাত আছে।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেনঃ 'দাদা! আমি তো আপনার বিরোধই করেছিলাম এই ব'লে যে দুজনের মধ্যে একজনকে আর একজনের কাছে রাখা বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু আপনি আমার কথা শোনেননি। যা হোক্ এতে রাগের কী আছে, দু-জনে পরস্পরকে চাইছে, অর্জুন বীরও, আমাদের সঙ্গে সম্পর্কও আছে, ক্ষত্রিয়ও বটে, তার চেয়ে ভাল বর সুভদ্রার আর মিলবে কোথায়? এতে খারাপ কি হয়েছে?'

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনে বলরাম শান্ত হয়ে গেলেন।

এদিকে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে পেঁাছে গেলেন। দ্রৌপদী এবং অন্যান্য সব ভাইদের অনুমতি ও শুভেচ্ছা পেয়ে দুজনের বিবাহ হয়ে গেল। সেই সময় বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়রা ইন্দ্রপ্রস্থে পেঁাছে গিয়ে-ছিলেন। তাঁরাও বিবাহে উপস্থিত থেকে বর-বধূকে আশীর্বাদ করলেন। সব যাদবদের আশীবাদ নিয়েই এইভাবে এই উৎসব আনন্দের সঙ্গে শেষ হল।

এটা সুস্পষ্ট যে এই সমগ্র ঘটনার মধ্যে চাতুরী এবং ছল-কপটতার বাহুল্য ছিল, যাতে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, সুভদ্রা সবাই অংশীদার ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা বলা যাবে না যে এটা কোনো নিন্দনীয় ব্যাপার বা খারাপ কাজ হয়েছিল। যেমন নাকি শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেনঃ 'অর্জুন হচ্ছে আমাদের আত্মীয়, তার উপর ক্ষত্রিয়, বীর এবং যোগ্যও বটে, সুভদ্রা এবং অর্জুন দুইজনেই পরস্পরকে চাইছে, তা হ'লে আর দোষের কি হল?' ব্যাপারটা ঠিকই ছিল এবং নির্দোষও ছিল, সুতরাং এই রকম পরিস্থিতিতে চাতুরী এবং ছল কপটতা এইটুকুই জানাচ্ছে যে কৃষ্ণ ব্যবহারকুশল ছিলেন কিন্তু নীতিবিরুদ্ধ কোনো কাজ তিনি করেননি।

এ তো হল একটা উদাহরণ। কৃষ্ণের বিরাট চরিত্রে অনেক এমন ঘটনা পাওয়া যায় যেখানে শ্রীকৃষ্ণ চাতুরী এবং ছল-কপটকে তাঁর ব্যবহারে অঙ্গীকার করে-ছেন। কিন্তু তিনি নীতির উল্লঙ্ঘন করে থাকবেন, এমন বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানী হয়ে ব্যবহারে যদি কাঁচা বলে প্রমাণিত হতেন তা হলে তাঁকে অবতার বলেও মানা যেত না আর মহাপুরুষও বলা চলত না।

অবতার সমাজকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, প্রেরণা দিয়ে থাকেন। এইজন্য মহাজ্ঞানী, দূরদশী, দুষ্টের দমনকারী এমন নেতা সাধুসন্তদের সুখদায়ক হন। এই গুণ আর বিবেক বুদ্ধি নিরেট মূর্খের যে হতে পারে না তা সবার কাছেই সুস্পষ্ট। এই কারণে নেতার মধ্যে, তা তিনি অবতারই হোন্ বা মহা-

পুরুষ, ব্যবহারকুশলতা, নীতি এবং ধর্ম—এ সবগুলি গুণেই থাকা আবশ্যক।

সুভদ্রা-হরণের উদাহরণ আমি সংক্ষেপে লিখেছি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে এটিই একমাত্র উদাহরণ নয়। আসলে তো মহাভারতের মধ্যে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে যার থেকে জানা যায় সমাজের কল্যাণের জন্য দরকার হলে শ্রীকৃষ্ণ চাতুরী, ছল এবং কপটতার আশ্রয় নিয়েছেন এবং তাও কোনোরকম সংকোচ না ক'রে।

ন্যায় ও ক্ষমা

সেই সময়ের প্রথা অনুসারে রাজচক্রবর্তীর সর্বজনমান্য আজ্ঞাকারিতা কায়েম করতে হলে একটি রাজসূয় যজ্ঞ করা আবশ্যকর্তব্য হিসাবে গণ্য হ'ত। কিন্তু এর সাফল্যের জন্য এ-ও নিয়ম ছিল যে সেই রাজা অন্য সব রাজাদের জয় ক'রে তাদের রাজ্যে নিজের শ্রেষ্ঠতার ঘোষণা করিয়ে দেবে। সেইজন্য যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের পর পাণ্ডবদের নিকট আত্মীয়েরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন রাজসূয় যজ্ঞ করতে। যুধিষ্ঠির স্বভাবে শান্তপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন, সেইজন্য এই সব ঝামেলার মধ্যে পড়তে তাঁর কোনো উৎসাহ ছিল না। আবার ওদিকে ভীম আর অর্জুন দুজনেরই এ বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। যুধিষ্ঠির বললেনঃ 'এই যজ্ঞের উপলক্ষ্যে অনেক রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে এবং তাঁদের হারিয়ে পুরোপুরি বশীভূত করা দরকার হয়ে পড়বে। এতে প্রচুর হানাহানি হবে, যা আমার পছন্দ নয়।'

'তা ছাড়াও একছত্র রাজ্য ঘোষণা করার জন্য অন্য রাজাদের যখন হারাতে হবে তখন জরাসন্ধকে কি ক'রে বাদ দেওয়া যাবে? তাকেও হারাতে হবে কিন্তু সে অত্যন্ত পরাক্রান্ত বলশালী। কি ক'রে হারবে? তাকে যদি হারাতে না পারা যায় তা হলে তো রাজসূয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না। জরাসন্ধকে হারানো এবং মারা বড় সহজ কাজ নয়, সেইজন্য ও-সব চিন্তা ছেড়ে দেওয়াই ভালো।' কিন্তু ভীম বললেনঃ 'আমি আর অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় জরাসন্ধকে অবশ্যই খতম ক'রে দেব।'

শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে বললেনঃ 'ভীম! জরাসন্ধের শক্তির পরিমাপ তোমার ঠিক জানা নেই। জরাসন্ধ ন্যায়প্রিয় ও উদার। তার উপর শিবের ভক্ত। এইজন্য তাকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। শুধু একটি কথাই আমাকে এই প্রস্তাবের দিকে আকৃষ্ট করছে, তা হল এই যে জরাসন্ধ হাজারো রাজাকে

কারাগারে বন্দী ক'রে রেখেছে এবং একদিন তাদের সবাইকে বলিও দেবে। যদি আমরা জরাসন্ধকে বধ করতে পারি তা হলে এই সমস্ত রাজারা কারাবাস থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন, তাঁদের প্রাণ রক্ষা পাবে। এইজন্য জরাসন্ধকে মারা যদিও সহজসাধ্য নয়, তা হলেও ন্যায়দৃষ্টিতে এ প্রস্তাব বিচারযোগ্য। প্রকারান্তরে জরাসন্ধের বধ পাপের বিনাশ এবং ন্যায়ের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রতীক হয়ে দাঁড়াবে।'

এত সব সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির কিন্তু একমত হলেন না। তাঁর বিরোধ কায়েম হয়েই রইল। অন্যদিকে ভীম আর অর্জুনের আগ্রহও তেমনই রয়ে গেল যে জরাসন্ধ দুর্বল রাজাদের উপর অত্যাচার করছে, তাদের বলিদান বা হত্যা আটকাতেই হবে। এই দৃষ্টিতে তাকে মারাই হচ্ছে ধর্ম! শ্রীকৃষ্ণের উপরও এই যুক্তির প্রভাব পড়ল অর্থাৎ এর যুক্তিযুক্ততা তিনিও মেনে নিলেন। কিন্তু তিনি বললেনঃ 'সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সম্মুখ সমরে জরাসন্ধকে হারানো অসম্ভব। ইন্দ্রও তাকে পরাস্ত করতে অক্ষম। কিন্তু আমার অনুমান যে জরাসন্ধ আর ভীম দুজনের একলা যদি পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় তা হলে ভীম তাকে মারতে পারে। এটি ঘটাতে হলে কিছু চাতুরী এবং ছলেরও প্রয়োজন হবে।' যুধিষ্ঠিরও শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেলেন।

এই স্থির হওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভীম আর অর্জুন একলাই মগধের দিকে রওনা হয়ে গেলেন এবং জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে পৌঁছে তিনজনেই নিজের নিজের আসল বেশভূষা ত্যাগ ক'রে স্নাতকদের অর্থাৎ বিদ্যার্থী বা ছাত্রদের বেশ ধারণ করে নিলেন। কিন্তু তাঁরা পুষ্পমালা ও চন্দনাদি সুগন্ধি জিনিষও ধারণ করলেন যা কিন্তু স্নাতকদের পক্ষে বর্জনীয়। এই বেশে রাজধানীতে পৌঁছে জরাসন্ধের মহলে সম্মুখ দুয়ার দিয়ে প্রবেশ না করে পিছনের দেওয়াল টপ্‌কে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। সেখানে পৌঁছে তাঁরা জরাসন্ধের কাছে খবর পাঠালেন যে তিনজন স্নাতক রাজার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এসেছেন। জরাসন্ধ বলতে কি তখন পূজা-পাঠে ব্যস্ত ছিলেন, তিনি মধ্য রাত্রে মিলিত হবেন বলে এই তিনজনকে সময় দিলেন।

মধ্য রাত্রে যখন দেখা-সাক্ষাৎ হল তখন জরাসন্ধের এই তিনজনের উপর সন্দেহ হল। তিনি এদের বললেনঃ 'সজ্জনগণ! তোমাদের বেশ তো স্নাতকের কিন্তু তোমরা ফুলের মালাও পরেছ, সুগন্ধি জিনিসও শরীরে মেখেছ, এ সব তো স্নাতকের পক্ষে বর্জনীয়। চেহারাতেও তোমাদের ক্ষত্রিয় বলেই মনে হচ্ছে। প্রধান দুয়ার দিয়ে না এসে তোমরা পিছনের দেওয়াল টপ্‌কে প্রাসাদে প্রবেশ করেছ, আমি তোমাদের জন্য যে খাবার পাঠিয়েছিলাম, তোমরা তা গ্রহণ করোনি। তা হলে তোমরা কে? কেন এসেছ? সব স্পষ্ট ক'রে

আমাকে বলো। সব অবস্থাতেই আমি তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি এবং সম্মান করছি, কারণ তোমরা আমার অতিথি। কিন্তু তোমরা বন্ধু ব'লে মনে হচ্ছে না।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেনঃ 'জরাসন্ধ! তুমি ঠিকই বলেছ। আমরা তোমার শত্রু এবং তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এসেছি। তোমার পাঠানো খাবার আমরা খাইনি কারণ আমরা তোমার বন্ধু নই। শত্রুর ভোজন সর্বথা বর্জনীয়।' জরাসন্ধ বললেনঃ 'ভাইসব! আমি তো তোমাদের জানিও না, তা হলে তোমরা আমার শত্রু বনে গেলে কি ক'রে? আমি তো তোমাদের আগে কখনও দেখেছি বলেও তো মনে করতে পারছি না। যদি তোমরা আমার শত্রু হও তা হলে অন্তত তোমাদের পরিচয় তো দাও এবং এ-ও বলো যে তোমরা আমার শত্রু হলে কি ক'রে?'

এই শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেনঃ 'আমাদের শত্রুতা এই কারণে যে তুমি শত শত রাজাদের বিনা অপরাধে অন্যায় ক'রে কারাগারে পুরে রেখেছ এবং এখন তাদের সবাইকে শূলে চড়াতে চাইছ। এ হল চরম নিষ্ঠুরতা ও পাপ। অসহায়কে রক্ষা করা এবং নির্দয়কে দমন করা প্রত্যেক ধার্মিক লোকের ধর্ম ও কর্তব্য। আমরা কে তা তোমার কাছে লুকোতে চাই না। এ হচ্ছে পাণ্ডব অর্জুন আর এ হচ্ছে ভীম, যুধিষ্ঠিরের ছোট ভাই। আমি তোমার পুরানো পরিচিত কৃষ্ণ। আমাদের মধ্যে যে কোনো একজনকে বেছে তার সঙ্গে একলা যুদ্ধ করে নাও, এই তোমার কাছে আমার চ্যালেঞ্জ বা আহ্বান।'

জরাসন্ধ এতে খুব হাঁসল। শ্রীকৃষ্ণের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতে লাগলঃ 'তুমি তো আঠারো বার আমার সামনে থেকে যুদ্ধ করতে এসে পালিয়ে গিয়ে শেষে দ্বারকায় গিয়ে লুকিয়ে পড়লে। তোমার সঙ্গে আর কি লড়ব? তুমি তো ভীরু। আমার অবাক লাগছে যে যুদ্ধে তুমি আমার সামনে দাঁড়াতে পারলে না আর এখন আমার ঘরে এসে আমাকে চ্যালেঞ্জ করছ আহ্বান বা প্রতিস্পর্ধা জানাবার দুঃসাহস দেখাচ্ছ? আমি কংস নই। যাকে তুমি ঠকিয়ে বা ভুলিয়ে মেরে ফেলেছ। আমি তোমার সঙ্গে লড়াই করব না, কারণ তা আমার মান-মর্যাদার বিরোধী। অর্জুন তো বাচ্চা। ওর সঙ্গেই বা কি লড়ব? তবে হ্যাঁ, ভীমের সঙ্গে লড়ে নেব।'

জরাসন্ধ যখন লড়াইয়ের প্রস্তুতি করল তখন নানারকম দুর্লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। সেজন্য লড়াইয়ের আগে জরাসন্ধ তার ছেলে সহদেবকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে দিল এবং তারপর ভীমের সঙ্গে লড়তে আরম্ভ করল। ভীম খুব জোর লাগালেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাকে উৎসাহিত করতে থাকলেন

—'ভীম! তুমি পবননন্দন, নিজের বলকে স্মরণ করো।' এর পর ভীম বায়ুকে স্মরণ করলেন এবং তার ফলে তাতে যেন নতুন বল সঞ্চারিত হ'ল। সেই নতুন বল নিয়ে সে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়তে লাগল।

সে জরাসন্ধকে মাথার উপর তুলে তার দুই পা ফাঁক ক'রে চিরে ফেলল। জরাসন্ধের এই বর পাওয়া ছিল যে তাঁর দুই অর্ধাঙ্গ যদি পরস্পরকে স্পর্শ করে, তা হলে তা আপনি জুড়ে যাবে। এইজন্য যদিও ভীম জরাসন্ধের দেহকে চিরে দু'খণ্ড করে ফেলল তবুও তারা আবার পরস্পর একটু ছোঁওয়া লাগতেই আবার যেমনকার তেমন জুড়ে দুই অঙ্গ এক হয়ে গেল এবং জরা-সন্ধ আগের মতই বেঁচে উঠল। যুদ্ধ আবার হতে থাকল এবং ভীম ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগল।

এই দেখে কৃষ্ণ ইশারা ক'রে ভীমকে বোঝালেন। একটি কলার পাতা হাতে নিয়ে তাকে চিরে ফেলে শ্রীকৃষ্ণ তার দুটি টুকরোকে আলাদা আলাদা দুই কোণায় ফেলে দিলেন। ভীম এই ইঙ্গিতটি বুঝে নিলেন এবং তিনি জরাসন্ধের দেহকে চিরে ফেলে তার দুটি অংশকে দুই দিকে ফেলে দিলেন। এই নতুন কৌশলের ফলে জরাসন্ধ এবার শেষ হয়ে গেল। তার মৃত্যুর ফলে তার সারা পরিবারে হাহাকার পড়ে গেল।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের সব আত্মীয়দের সান্ত্বনা দিয়ে বললেনঃ 'আমার আর কারুর সঙ্গে শত্রুতা নেই। আমি তো অন্যায়কে দূর করার জন্য এসেছি। তোমরা কেউ আমার দরুণ ভয়ে ভীত হোয়ো না। নির্ভয়ে থাকো।'

তারপর জরাসন্ধের রথে চড়ে তাঁরা গিরিব্রজের পাহাড়ের উপরে গিয়ে পৌঁছুলেন যেখানে শত শত রাজাদের জরাসন্ধ কুঠরিতে বন্ধ ক'রে রেখে-ছিল। তাদের সবাইকে শ্রীকৃষ্ণ মুক্তি দিলেন। তাতে রাজারা শ্রীকৃষ্ণের জয়-গান করে বললেনঃ 'শ্রীকৃষ্ণ! আমরা আপনার কী সেবা করব? প্রতিদানে কি দেব?' শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঃ 'আমি প্রতিদান কিছুই চাই না। রাজা যুধি-ষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করছেন, আপনারা সবাই সেখানে আমাদের বন্ধু হয়ে পদার্পণ করুন, আমাদের আতিথ্য সৎকার গ্রহণ করুন, এই আমি চাই।'

তারপর শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের কাছে গেলেন এবং তাকে বল-লেনঃ 'পুত্র! তুমি ভয় পেয়ো না। তুমি হচ্ছ রাজা। নিজের পিতার শৌর্যকে অনুকরণ করো কিন্তু ধর্মপথে থেকে রাজত্ব করো। অন্যায় এবং অধর্ম থেকে সর্বদা দূরে থেকো।' সহদেবও অত্যন্ত অনুগৃহীত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললঃ 'আমি আপনার কাছে ঋণী এবং অবশ্য রাজসূয় যজ্ঞে যাব এবং সর্বদা ধর্মের পথ অনুসরণ করব।'

জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধের এই বিবরণ বড় অদ্ভুত ও অনুপম। এই বধের ব্যাপারে চাতুরী আছে, কপটতা বা ছলনা আছে আবার যথাযথ ব্যবহার আছে, উদারতা আছে, নির্দয়ের প্রতি দণ্ড আছে এবং নির্বলের প্রতি দয়া আছে। পাপের বিনাশ এবং ন্যায়ের স্থাপন আছে। রাজাদের মুক্ত ক'রে তাদের থেকে প্রতিদান কিছু চাইলেন না। জরাসন্ধকে বধ করলেন বটে কিন্তু তার পুত্র সহদেবের প্রতি মমতা দেখালেন। তাকে রাজ-সিংহাসনে বসালেন, এ এক অদ্বিতীয় ব্যবহার-নীতি এবং কুশলতার নিদর্শন। এ সবই কৃষ্ণের মহত্ত্বের দ্যোতক।

কাম্যক বনে কৃষ্ণ

জরাসন্ধের মৃত্যুর পর রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজনে আর কোনো বাধা রইল না। এইজন্য মহা ধূমধাম সহকারে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রারম্ভেই প্রথম প্রশ্ন উঠল যে অতিথিবর্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে কাকে মানা যায়। যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবেন তাঁকেই সর্বাগ্রে পূজা করা উচিত, এই ছিল বিধান। অনেকগুলি নাম সামনে রাখা হল কিন্তু ভীষ্ম পিতামহের সুস্পষ্ট অভিমত ছিল যে সর্বশ্রেষ্ঠ অতিথি হচ্ছেন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই। এই জন্য সর্ব প্রথম পূজার জন্য কৃষ্ণের নামই তিনি প্রস্তাব করলেন। ভীষ্ম পিতামহ বললেনঃ 'এই বিশাল সভায় বড় বড় বংশের রাজন্যবর্গের মধ্যে কেবল শ্রীকৃষ্ণই সূর্যের মত দেদীপ্যমান হয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন। অন্য রাজারা তো একটি রশ্মি বা কিরণ মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ এঁদের মধ্যে তেমনি উদ্ভাসিত যেমন কিরণাবলীর মধ্যে সূর্য। কৃষ্ণ ছাড়া এ সভা প্রকাশহীন অন্ধকার, তাই সর্বপ্রথম পূজার অধিকারী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই।' এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিয়ে পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বাগ্রে পূজা করলেন। কিন্তু কিছু রাজাদের এ কাজ পছন্দ হল না। বিশেষ করে শিশুপালের কাছে তো এটি খুব বেশিরকম অস্বস্তিকর ঠেকল। সে উঠে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে এমন কটুবাক্য বলতে লাগল যে তা শুনে পাণ্ডবেরা রেগে উঠলেন। কিন্তু ভীষ্ম পিতামহ সবাইকে সামলালেন এবং বললেনঃ 'শ্রীকৃষ্ণ নিজেই শিশুপালের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেবেন, কারণ শিশুপালের মৃত্যু নিকটে এসে গিয়েছে।' শিশুপাল পিতামহকেও গাল দিয়ে বসল আর শ্রীকৃষ্ণকে তো অপমানিত করতেই থাকল।

শ্রীকৃষ্ণ বললেনঃ 'আমি শিশুপালের মাকে কথা দিয়ে রেখেছি যে একশোটি গালি পর্যন্ত বরদাস্ত করব।' অতএব যখন শিশুপাল একশোর সীমা লঙ্ঘন করে গেল তখন শ্রীকৃষ্ণ চক্র দিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন। এই

অশুভ ঘটনায় সকলেরই মনে সন্তাপ জন্মাল। যুধিষ্ঠির বিশেষভাবে সন্তপ্ত হলেন এই ভেবে যে রাজসূয় যজ্ঞে এ কী দুর্লক্ষণ অঘটন ঘটে গেল!

ব্যাসদেব সেখানে এসেছিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'মহামুনি! অশুভ দুর্লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, আপনি ভবিষ্যৎ কিরকম দেখছেন বা বুঝছেন?' ব্যাসদেব বললেনঃ 'পুত্র! দুর্যোধনের পাপ, ভীম আর অর্জুনের পরাক্রম এবং দ্রৌপদীর ক্রোধাগ্নি এই সংসারকে ধ্বংস করে ফেলবে। এর জন্য সন্তাপ করা নিষ্ফল, কেন না ঈশ্বর যা বিধান করে দিয়েছেন তা ঘটেই পূর্ণ হবে। সংসারের নাশ হয়েই তা থামবে।'

এর পর দুর্যোধন কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে দ্যুতক্রীড়ায় আহ্বান, যুধিষ্ঠিরের জুয়াখেলায় পরাজয়, দ্রৌপদীর অপমান এবং শেষে পাণ্ডবদের বনবাস—এ সবই সকলের জানা কাহিনী। পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ করে কাম্যক-বনে চলে গেলেন। কিছুদিন সেখানে বাসও করলেন। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি রাজসূয় যজ্ঞের পর যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্বারকা চলে গিয়েছিলেন, পাণ্ডবদের এই সমস্ত বিপত্তির কাহিনী শুনতে পেয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য কাম্যক-বনে এসে পৌঁছুলেন।

তাঁর সঙ্গে বৃষ্ণিবংশীয় অনেক যোদ্ধারাও এলেন। পাণ্ডবদের এই দুর্দশা দেখে সব যাদবদেরই অত্যন্ত ক্রোধ হল। শ্রীকৃষ্ণের সন্তাপই ছিল সব চেয়ে বেশি। তাঁর ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেনঃ 'যুধিষ্ঠির! আমি দ্বারকায় ছিলাম না। আমাকে শাল্ব এবং সৌমের সঙ্গে যুদ্ধ কবতে দ্বারকা থেকে চলে যেতে হয়েছিল। সেই কারণেই তোমাদের এই সব খবর অনেক দেরীতে আমার গোচর হয়েছে। যদি আমি সেই সময় দ্বারকায় থাকতাম তা হলে এই সমস্ত ঘটনার বৃত্তান্ত শুনে ইন্দ্রপ্রস্থে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যেতাম এবং তোমাকে কখনই জুয়া খেলতে দিতাম না। আমি আমার সৈন্য নিয়ে এসেছি, এক্ষুণি হস্তিনাপুরের উপর চড়াও হয়ে কৌরবদের শেষ করে দেওয়া উচিত। সমগ্র ভারতবর্ষ তোমার দিকে রয়েছে, এই জন্য অরণ্যবাস ত্যাগ করো এবং যুদ্ধ করো।'

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে শান্ত করে বললেনঃ 'কৃষ্ণ! আমি তো আমার প্রতিজ্ঞা থেকে সরে আসতে পারব না। আমি পাপের ফল ভোগ করছি। এখন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে দ্বিতীয়বার অধর্ম করতে চাই না। এখন তো আমাকে নিজের কৃতকর্মের ভোগ ভুগতেই হবে।' কিন্তু কৃষ্ণের ক্রোধ প্রশমিত হল না। তিনি বললেনঃ 'যুধিষ্ঠির! তুমি হচ্ছ আমার, আমি হচ্ছি তোমার। যে তোমার শত্রু সে আমারও শত্রু। তোমার যে বন্ধু সে আমারও বন্ধু। আমি শপথ করে বলছি যে যতদিন আমি তোমার শত্রুদের শেষ না করে দিচ্ছি, ততদিন

আমি বিশ্রাম গ্রহণ করব না। আমি পৃথিবীকে রক্তে পিছল করে দেব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি এ করেই ছাড়ব।'

দ্রৌপদীর চোখ দুটি অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে ছিল। তিনি বললেন: 'কৃষ্ণ! আমি দ্রুপদের কন্যা, পাণ্ডবদের পত্নী, আমার এই অপমান, আমার এই দুর্দশা?' কৃষ্ণ দ্রৌপদীর চোখের জল মুছিয়ে দিলেন এবং বললেন: 'দ্রৌপদী! আর একটু ধৈর্য ধরো, তুমি যেমন কাঁদছ, তেমনিই কৌরব-পত্নীরা কাঁদবে। যদি বা আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে যায়, হিমালয় গলে ভেঙে পড়ে যায়, পৃথিবী হাজার খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় তবু কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাকে কে ভাঙতে পারে? বোনটি! তুমি কেঁদো না। কৌরবদের বিনাশ করে ছাড়ব। আমার প্রতিজ্ঞা কেউ টলাতে পারবে না।' এইভাবে সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্বারকায় চলে গেলেন।

এটা যেন খেয়াল থাকে যে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের এই অধিকার দিয়ে রেখেছিলেন যে যখন খুশি তখন তারা কৃষ্ণকে দ্বারকা থেকে ডেকে নিতে পারবে।

যুধিষ্ঠির শান্তিকামী

মহাভারত-যুদ্ধের প্রারম্ভে যখন কৌরব ও পাণ্ডব দুজনেই আপন আপন পক্ষকে প্রবল বা শক্তিশালী করার জন্য চারিদিকে রাজাদের আমন্ত্রণ পাঠাচ্ছিলেন, তখন দুর্যোধন এবং অর্জুন দুজনেই সহায়তা লাভের আশায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে দ্বারকায় পৌঁছুলেন।

দুর্যোধন তো আগে পৌঁছুলেন এবং অর্জুন তার পরে। শ্রীকৃষ্ণ তখন শুয়েছিলেন। কিন্তু দুর্যোধন নিজের অহঙ্কারের দরুণ শ্রীকৃষ্ণের খাটের মাথার দিকে গিয়ে বসলেন এবং অর্জুন বিনম্রভাবে খাটের পায়ের দিকে বসলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ ঘুম থেকে উঠলেন তখন তিনি অর্জুনকেই প্রথমে দেখলেন, তারপর ঘুরে তাকানোতে মাথার কাছে দুর্যোধনকে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন।

দুজনেই নিজেদের আসার কারণ বললেন এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করলেন যে তিনি যেন তাঁর পক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। দুর্যোধন বললেনঃ 'আমি আগে এসেছি এই জন্য আমার দাবীর জোর বেশি।' শ্রীকৃষ্ণ বললেনঃ 'দুর্যোধন, তুমি আগে এসেছ, একথা ঠিক আছে, কিন্তু আমি প্রথমে অর্জুনকে দেখেছি, এ-কথাও ঠিক, এই জন্য দুজনকেই সাহায্য করব। কিন্তু একপক্ষে একলা, নিঃশস্ত্র, সৈন্যহীন আমি থাকব আর অন্য পক্ষে যাদবদের এক প্রবল সৈন্যবাহিনী থাকবে—এই দুইয়ের মধ্যে তোমার যা পছন্দ বেছে নাও, তবে যেহেতু অর্জুন তোমার চেয়ে ছোট, সেইজন্য প্রথম বেছে নেবার অধিকার অর্জুনেরই হওয়া উচিত।' দুজনের কাছেই এ প্রস্তাব গ্রহণীয় ছিল। শ্রীকৃষ্ণ এ-ও বলেছিলেনঃ 'যাদবসেনাদের মধ্যে এত সব বড় বড় যোদ্ধা আছেন, যারা বল ও পরাক্রমে আমারই সমান, তাদের সকলের সংখ্যা হবে এক অক্ষৌহিনী সেনা। এ সব হল এক ভাগে আর এক

ভাগে হলাম নিঃশস্ত্র আমি এবং তাতেও এই সর্তে যে আমি যুদ্ধ করব না, যদিও আমি যুদ্ধ করতে সক্ষম। এই দুই হল বিকল্প। এখন প্রথম পছন্দ অর্জুনের। এবার বেছে নাও।'

অর্জুন বললেনঃ 'শ্রীকৃষ্ণ, তোমার সৈন্য আমার চাই না। তুমি যুদ্ধ করো বা না করো, তা-ও আমার কাছে তুচ্ছ, আমার শুধু তোমার আশীর্বাদই চাই। এই জন্য তোমাকে বেছে নিলাম।' দুর্যোধন এক অক্ষৌহিনী সেনা পেয়ে অত্যন্ত খুশি হল এবং সে কৃষ্ণকে ছেড়ে যাদব-সেনাকেই বেছে নিল।

বলরামের কাছে গিয়ে সে সারা ঘটনা জানাল। তখন বলরাম বললেনঃ 'দুর্যোধন! তুমি আমার বড় প্রিয়, তবে তুমি কৃষ্ণকে খুইয়ে বসলে, এ তোমার দুর্ভাগ্য। আমি এখন নিরপেক্ষ থাকব, কারুর তরফেই যুদ্ধ করব না। আমি তোমার পক্ষে আসব, এ আশা ছেড়ে দাও। আমি কোনো অবস্থাতেই কৃষ্ণের বিপক্ষে দাঁড়াতে পারব না।' এইভাবে নিঃশস্ত্র, যুদ্ধ না করার প্রতিজ্ঞা সমেত কৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষে গেলেন আর এক অক্ষৌহিনী যাদব-সৈন্য কৌরবদের পক্ষে যোগ দিল।

যেহেতু কৃষ্ণ যুদ্ধ করবেন না, সেই কারণে তিনি অর্জুনের সারথি হলেন এবং যুদ্ধে অর্জুনকে বরাবর আশা, উৎসাহ ও প্রেরণা দিতে থাকলেন।

পাণ্ডবরা বারো বছর বনবাসে ছিলেন এবং তারপর দুর্যোধনের সঙ্গে যে চুক্তিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন সেই মত এক বছর অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। এক বছরের এই অজ্ঞাতবাস তাঁরা মৎস্যরাজ্যের রাজধানী বিরাট নগরে কাটাবেন বলে স্থির করেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই-ই এবং দ্রৌপদীও নিজেদের পোশাক এবং নাম দুই-ই বদলে বিরাট-রাজার সেবায় কাটাবার জন্য বিরাটনগরে বাস করতে লাগলেন। সেই অজ্ঞাতবাসের সমগ্র কাহিনী এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

ভীম কীচকবধ করলেন। এর খবর দুর্যোধনের কাছেও গিয়ে পৌঁছুল, কিন্তু ভীমই যে কীচককে বধ করেছে, এ বিষয়ে সে সুনিশ্চিত হতে পারল না, কেন না ভীম তো তার নাম এবং বেশ দুই বদলে ফেলেছিল। দুর্যোধন চারদিকেই তার দূতদের পাঠিয়ে রেখেছিল। তারা এই খোঁজ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল যে পাণ্ডবরা কোথায় লুকিয়ে আছে, কেননা পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের খবর যদি জানাজানি হয়ে যেত, তা হলে পাণ্ডবদের আবার বনবাস ভুগতে হত। কিন্তু যখন দূতেরা কোনোমতেই সফলতা লাভ করতে পারল না, তখন অভিজ্ঞ লোকেরা বলল যে কীচকের বধ ভীম ছাড়া আর কারুর দ্বারা সম্ভব নয় এবং এই অনুমানের উপর নির্ভর করেই এই নিশ্চয় করা উচিত হবে যে পাণ্ডবরা মৎস্যদেশে বিরাটের রাজধানীতেই লুকিয়ে আছে।

এই অনুমান ঠিক কিনা তা পরীক্ষা বা যাচাইয়ের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হল এই যে বিরাট রাজার গ্রামগুলি কেড়ে নেওয়া হোক এবং যদি পাণ্ডবরা সেখানেই লুকিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই বিরাট রাজাকে সাহায্য করার জন্য যুদ্ধ করতে আসবেন এবং সেই যুদ্ধে পাণ্ডবরা তা হলে আপনা আপনিই প্রকট হয়ে পড়বেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে গ্রামগুলি হরণ করা হল এবং যুদ্ধও হল। অর্জুন, যিনি নর্তকীর বেশে বিরাট রাজার কন্যা উত্তরাকে নৃত্যকলা শিক্ষা দিতেন, তাঁকেও বিরাটের পুত্র উত্তরকে সাহায্য করার জন্য যুদ্ধে নামতে হল এবং শেষে তিনি নিজের পরাক্রমে কৌরব-সেনাকে মেরে তাড়িয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে অজ্ঞাতবাসও সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এর পরে বিরাটের কন্যা উত্তরার সঙ্গে অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ স্থির হল এবং এই মঙ্গল-উৎসবের প্রসঙ্গে পাণ্ডবরা আপন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের সেই উৎসবে উপস্থিত হবার জন্য নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। সেই উৎসবে যাদবরাও এলেন। বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণও এসে উপস্থিত হলেন।

বিবাহের আমোদ-আহ্লাদ শেষ হবার পর এটা স্বাভাবিকই ছিল যে এবার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হোক যাতে কিভাবে পাণ্ডবদের প্রতি যে-সব অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিবিধান করে আবার ন্যায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়। তার জন্য বিরাট রাজার রাজসভায় সব হিতৈষীদের মন্ত্রণা আরম্ভ হল। সকলে নিজের নিজের অভিমত জানালেন। শেষে শ্রীকৃষ্ণও সভাসদ্-দের সম্বোধন করে কিছু বলবার জন্য উপস্থিত হলেন। সমস্ত সভা শান্ত নিস্তব্ধ হয়ে কৃষ্ণের কথা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে ছিল।

কৃষ্ণ বললেনঃ 'ভদ্রমহোদয়গণ! পাণ্ডবদের প্রতি দুর্যোধন যা অন্যায় করেছে, আপনাদের তা অজানা নয়। পাণ্ডবরা কিভাবে বারো বছর বনে কাটিয়েছেন এবং এক বছর অজ্ঞাত বাস করেছেন, কিভাবে ছলনা করে শকুনি ইত্যাদিরা যুধিষ্ঠিরকে জুয়ায় হারিয়েছে এবং দ্রৌপদীকে অপমান করেছে, এ সমস্ত কথাই আপনাদের সকলের জানা। পাণ্ডবরা যদি চাইতেন যে কোনো সময়ে যুদ্ধ করে কৌরবদের হারিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির ধর্ম-পথ থেকে বিচ্যুত হতে চাননি, সেই জন্যই যুদ্ধের পথ গ্রহণ করেননি। বনবাস এবং অজ্ঞাতবাসের সব কষ্টই সহ্য করে গিয়েছেন, তবু নিজের ধর্মকে ছাড়েননি।

'এখন সময় এসে গিয়েছে যখন কিনা এই সমস্ত কিছু অন্যায়ের বোঝা-পড়া হোক। সেই জন্য আপনাদের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন। এমনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক যা ন্যায়ের অনুসারী হবে এবং লোককল্যাণ-কারী হবে এবং কারুর প্রতি যেন অন্যায় না করা হয়। পাণ্ডবদের এবং

দুর্যোধনের দুইয়েরই কল্যাণ যাতে হয়, এমন পথ বার করতে হবে। ধর্মপথ ত্যাগ করা অপেক্ষা নিজের সারা রাজ্য ত্যাগ করতেও যুধিষ্ঠির পিছপা হবে না।

'কৌরবেরা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকে দাবিয়ে রেখেছে। এর অর্ধেক রাজ্য ন্যায়ের দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরেরই প্রাপ্য। তার উপর তার জন্মগত অধিকার। অধর্মের দ্বারা দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে নিজের ন্যায়সঙ্গত অংশ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। পাণ্ডবরা যুদ্ধে পরাজিত হননি। কিন্তু কপটতা দ্বারা জুয়াতে তাঁদের হারানো হয়েছে। এ এক অধর্ম ঘটেছে।'

'পাণ্ডবদের সারা জীবনে ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধন তাদের সঙ্গে কি ধরণের কপটতা করেছে, নিষ্ঠুর নির্দয় ব্যবহার করেছে, সে-সব কথাই আপনারা জানেন। সেই অন্যায়কে দূর করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। যুধিষ্ঠির যুদ্ধ চান না। তিনি ন্যায় চান। দুর্যোধন কী চায়, তা আমার জানা নেই। কিন্তু আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে এক শ্রেষ্ঠ পুরোহিতকে দূত করে আমরা কৌরবদের কাছে পাঠাই, সে বিনীতভাবে দুর্যোধনের কাছে এই নিবেদন করুক যে যুধিষ্ঠির যুদ্ধ নয়, ন্যায় চায়। সেই জন্য অর্ধেক রাজ্য তার পাওয়া উচিত।'

বলরাম এই প্রস্তাবের সমর্থন করলেন বটে কিন্তু তাঁর যে দুর্যোধনের দিকে পক্ষপাত ছিল, তা সুস্পষ্ট হয়েই প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি বললেনঃ 'পাণ্ডবরা তো কৌরবদের সারা রাজ্য চাইছেন না। তাঁরা চাইছেন শুধু নিজের অংশটুকু। পুরোহিত দূত হয়ে যাক্, তবে সব বড়দের বৃদ্ধদের যেন নমস্কার করে, কোনো কড়া কথা যেন কোনো অবস্থাতেই ব্যবহার না করে। যুধিষ্ঠির যা-ই বলুক, জুয়াখেলায় হেরে তো গিয়েইছে। সেই জন্য সেই ঘটনার উল্লেখ করার সময় কৌরবদের অন্যায়ের কথা বার বার পুনরুল্লেখ করা ভাল হবে না। নম্রভাবেই যুধিষ্ঠিরের নিজের অংশ চেয়ে নেওয়া উচিত।'

বলরামের এই সওয়ালে কিছু পক্ষপাত ছিল, সেই জন্য সভাসদদের তা পছন্দ হল না। সকলেরই মনে হল যে দুর্যোধন বলরামকে কিছু উল্‌টো-পাল্‌টা বুঝিয়েছে এবং তার প্রভাবও পড়েছে তাঁর উপর।

বলরামের এই সমগ্র বক্তব্য যুধিষ্ঠিরের কাছেও বিস্বাদ বোধ হল কিন্তু তবু তিনি চুপ করেই থাকলেন। কিন্তু সাত্যকির তা বরদাস্ত হল না। সে বলরামের বক্তব্যের মাঝখানেই তাকে খণ্ডন করে তাঁকে কড়া কথা শুনিয়ে দিল। সে বললঃ 'বলরামের কথায় আমার রাগ হয়নি। রাগ হয়েছে সেই সব সভাসদ্‌দের উপর যারা বলরামের বক্তব্য চুপচাপ নিঃশব্দে শুনে গেলেন।

দূত পাঠাতে হয় তো পাঠাও, কিন্তু সে শুধু সময় নষ্ট করা হবে মাত্র। দূত পাঠাতে হয় তো পুরোহিতকে নয়, আমাকে পাঠাও। আমি দুর্যোধনের ঝুঁটি ধরে এনে তাকে যুধিষ্ঠিরের পায়ে ফেলে দেব।

এই ক্রোধপূর্ণ বক্তব্যকে সব সভাসদেরাই সমর্থন করলেন। দ্রুপদও এর সমর্থন করে বললেনঃ 'দুর্যোধন হচ্ছে পাপিষ্ঠ, ভীষ্ম আর দ্রোণ নিজেদের বুদ্ধি খুইয়ে বসেছেন বলেই দুর্যোধনের পক্ষ নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও পুরোহিতকে দূর করে পাঠানোতে আমার কোনো বিরোধ নেই।'

শেষে কৃষ্ণ বললেনঃ 'সাত্যকি এবং দ্রুপদ যথার্থ সত্য কথাই বলেছে বটে, তবে তা সত্ত্বেও সকলের মত হচ্ছে এই যে একবার দূত পাঠিয়ে চেষ্টা করা হোক যাতে শান্তিতেই সমস্ত ঝামেলা মিটে যায়। যদি তাতে কিছু না হয়, তা হলে যুদ্ধ তো আছেই।' এইভাবে দূত পাঠানোর জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।





শান্তির জন্য প্রয়াস

এই প্রস্তাব অনুসারে পাণ্ডবের দূত হস্তিনাপুরে গিয়ে পৌঁছালেন। ব্রাহ্মণ ধৃতরাষ্ট্রের সভায় উপস্থিত হয়ে যুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ভ কথায় ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর রাজসভার সদস্যদের পাণ্ডবদের বক্তব্য শোনালেন। ভীষ্ম পিতামহ এবং বিদুর দুজনেই পাণ্ডবদের বিশেষ ভালবাসতেন। সেই জন্য তাঁরা দূত হয়ে যে পুরোহিত এসেছেন, তাঁকে ভালমত স্বাগত সংকারাদি করলেন। তাঁরা সবাই পুরোহিতের বক্তব্য শোনার জন্য উৎসুক ছিলেন। পুরোহিত মহাশয়ও নরম এবং গরম দুরকম কথাই ব্যবহার করে কৌরব-সভায় নিজের বক্তব্য আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন : 'সজ্জনবৃন্দ! আমি এতে বিশেষ খুশি যে এই বিশাল সভায় এমন লোক সব উপস্থিত আছেন, যাঁদের ধর্মে আস্থা আছে এবং যাঁদের ধর্ম সম্বন্ধে পুরো জ্ঞান আছে। এই সভায় এমন মহানুভব ব্যক্তিও আছেন, যিনি ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য উপলব্ধি করেন এবং যাঁকে ভগবান বিবেকও দিয়েছেন। এমন মানুষদের আমার বক্তব্য বুঝতে কোনোই অসুবিধা হবে না।

'সংসার শুদ্ধ সবাই জানে যে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু দুজনে একই পিতার সন্তান, সেই জন্য এই রাজ্যও কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণের সম্মিলিত সম্পত্তি। তা হলে কোন কারণে পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য পাণ্ডবদের অধিকারে নেই? কেন সম্পূর্ণ রাজ্যটি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররাই নিজেরা অধিকার করে বসে আছে? পাণ্ডবদের সঙ্গে তারা সারা জীবন অধর্ম করে এসেছে। গোড়াতে তো তাদের মেরে ফেলারই চেষ্টা করেছিল। তা থেকে তারা কোনোমতে বেঁচে বেরিয়ে এসেছে। যখন তাদের মারার চেষ্টা বিফল হল, তখন আবার কপট জুয়া খেলায় তাদের হারিয়ে তাদের রাজ্য কেড়ে নেওয়া হল। দ্রৌপদীকে অপমান করা হল। যাহোক, পাণ্ডবরা এখন সে-সব তিক্ত কথা ভুলে যেতে

প্রস্তুত। তারা বনবাস এবং অজ্ঞাতবাস দুইয়েরই কষ্ট ভোগ করেছে। কিন্তু এখন পাণ্ডবরা সেই বারো বছরের নির্দিষ্ট কালকেও শেষ করেছে। এই জন্য এখন তারা নিজের অংশের রাজ্যটুকু চাইছে। তাদের এই চাওয়া সব দিক দিয়েই যুক্তিযুক্ত। যদি দুর্যোধন তাতে সম্মত না হয় এবং যুদ্ধই চায়, তা হলে তা-ও সে পেয়ে যাবে অর্থাৎ যুদ্ধ হবে। কিন্তু তার পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর। পাণ্ডবরা বলহীন নয়। কৃষ্ণ তাদের পক্ষে আছেন। ধর্ম তাদের পক্ষে। বড় বড় যোদ্ধারাও তাদের দিকে আছেন। তাই কৌরবদের পক্ষে এইটাই মঙ্গলজনক হবে যে তারা যুধিষ্ঠিরের এই ন্যায়সঙ্গত দাবী মেনে নিক। এইজন্য আপনারা সবাই মিলে দুর্যোধনকে বোঝান যে সে এই পাপকর্ম থেকে নিরস্ত হোক, নইলে তার বিনাশ অবশ্যম্ভবী।

'হয় পাণ্ডবদের রাজ্য পাণ্ডবদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক নইলে পাণ্ডবদের ক্রোধাগ্নির সম্মুখীন হবার জন্য তৈরী হোন। এই আগুনে দুর্যোধন এবং তার সব সঙ্গীসাথীরাই ভস্মীভূত হয়ে যাবেন।'

ভীষ্ম এ সব শুনছিলেন। তিনি পুরোহিতের এই সব কথা অনুমোদন করে দুর্যোধন ও তার সঙ্গীদের বললেনঃ 'যুধিষ্ঠির ধর্মনিষ্ঠ, তার সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। পুরোহিত যা বলছেন তা সর্বথা সত্য। আমার পুরো বিশ্বাস আছে যে যুধিষ্ঠির শান্তি চায়। যুধিষ্ঠিরের দাবী সব দিক দিয়ে ন্যায়-সঙ্গত।' কিন্তু কর্ণ পিতামহের বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই রেগে উঠে দাঁড়াল এবং ভীষ্মকে কটু কথা শোনাতে লাগল। পিতামহও বিগড়ে গেলেন অর্থাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। শেষে ধৃতরাষ্ট্র মধ্যস্থতা করে পুরোহিত যে রাস্তা দিয়ে এসেছিলেন সেই রাস্তাতেই পিছু হটিয়ে বিদায় করলেন। বিদায় দেবার সময় ধৃতরাষ্ট্র ব্রাহ্মণটিকে এ-ও বললেনঃ 'আমি সঞ্জয়ের হাত দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে সব কথার উত্তর পাঠাব। আমি এখন পর্যন্ত আমার সভাসদ্‌গণের সঙ্গে কোনো শলাপরামর্শও করতে পারিনি এই সব মতামত নেওয়ার পরেই উত্তর যাবে।'

কিছুদিন পর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের বার্তা নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে উপপ্লব্যে পৌঁছাল। বার্তায় কোনো সন্তোষজনক উত্তর তো ছিলই না। কেবল ছিল বেদান্তের দাম্ভিকতা, গালভরা নীতি-কথা, যা সকলের কাছে পাষণ্ডের ভণ্ডামী বলে বোধ হল। ধৃতরাষ্ট্রের তরফ থেকে সঞ্জয় বললেনঃ যুধিষ্ঠির! তোমার যুদ্ধ করা উচিত নয়, কেন না এ হল পাপকর্ম। তোমার যদি রাজ্য না-ও মেলে, তবু সন্তুষ্ট থাকাই উচিত। কোনো অবস্থাতেই অহিংসা ত্যাগ করা বিহিত নয়। সকলের ভালোর জন্য সব সময় নিজের স্বার্থ ত্যাগ করাই

প্রধান ধর্ম। আমি সম্পূর্ণ আশা করি যে আমার উপদেশ তুমি, ভীম, অর্জুন এবং কৃষ্ণ সকলেই স্বীকার করে নেবে।'

যুধিষ্ঠির শান্তপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁরও এই সব ছলনা ও ভণ্ডামিপূর্ণ কথা শুনে রাগ হয়ে গেল। তিনি বললেনঃ 'সঞ্জয়! ধৃতরাষ্ট্র লোভের বশবর্তী হয়ে আমাকে এই উপদেশ পাঠাচ্ছেন। বারবার তিনি নিজের ছেলেদের কথারই পুনরুক্তি করে চলেছেন। আমি তো যুদ্ধ চাই না, আমি তো কেবল ন্যায়বিচার চাই। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তো গোড়া থেকেই ধর্মকে ভুলে বসে আছেন। যখন দ্যূত-ক্রীড়া পাশা-খেলা চলছিল তিনি এ-কথা জেনেও যে পাপ করা হচ্ছে তবু দুর্যোধনকে তার থেকে নিবৃত্ত করেননি। তিনি কোনো চেষ্টাই করেননি, উল্‌টে বার বার একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেনঃ 'কার জিত হল?' তাঁর তো দুর্যোধনের জয়েই রস বা আনন্দ ছিল। তিনি পাপ-পুণ্যের ভেদকে একেবারেই ভুলে বসেছেন।

'দ্রৌপদীর অপমান হল, তা-ও তিনি হজম করে গেলেন। সেই পাপ-কর্মে তাঁর সম্পূর্ণ অনুমোদন ছিল। দুর্যোধন অন্তত পরিষ্কার এটুকু তো বলে 'আমি পাণ্ডবদের কোনো অংশ বা ভাগ দেব না।' আর আমার এই জ্যেঠা তো একেবারেই পাষণ্ড। তার দেওয়া-নেওয়ার তা কোনো কিছু ব্যাপারই নেই। তার উপর নিজের করা অন্যায়ের জন্য এতটুকু বেদনাবোধও নেই। সে ন্যায় চায়ই না, উলটো আমাকেই বেদান্ত বা তত্ত্বজ্ঞান শেখাতে চায়! এ পুরোপুরিই এক ভণ্ড পাষণ্ড। এজন্য আমার জেঠাকে গিয়ে বলোঃ 'যুধিষ্ঠির শান্তি চায়। পাণ্ডবেরা ধর্মের পথ কখনই ছাড়বে না। কিন্তু আমরা ন্যায় চাই। আমার রাজ্য এবং ইন্দ্রপ্রস্থ আমাকে ফিরিয়ে দাও। এই আমার ন্যায়সঙ্গত দাবী। আমার এই বার্তা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পৌঁছে দাও। যদি আমার অংশ আমি পেয়ে যাই, তা হলে আর কোনো যুদ্ধ হবে না।'

সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের কথার মাঝেই কথা কেটে বললঃ 'যুধিষ্ঠির! আমার সম্পূর্ণ বক্তব্য তো তুমি শুনলেই না। ধৃতরাষ্ট্র এ-ও বলে পাঠিয়েছেন যে জীবন বড় স্বল্প বা ছোট। এই ছোট দুদিনের জীবনে এক তুচ্ছ সুখের জন্য যুদ্ধ করবে, নিজের আত্মীয়স্বজনদের মারবে? এ পাপ কেন কিনতে যাচ্ছ? এতে সংসারে তোমার ঘোর নিন্দা হবে, অপযশ হবে। তুমি পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে সারা জীবন অস্বস্তিতে কাটাবে। তুমি তৃষ্ণা বা কামনা ত্যাগ করো আর যুদ্ধের কথা ভুলে যাও। এই নশ্বর জীবনে রাজ্যলাভ তোমার পক্ষে শোভনীয় নয়। তেরো বছর তো তুমি বনবাস ও অজ্ঞাতবাসে কাটিয়েছ। তুমি ধৈর্য রক্ষা করেছ। এখনও ধৈর্য ধরো এবং ধৈর্য দিয়েই যুদ্ধের

চিন্তা ত্যাগ করো। তোমার বার্ধক্যও আসবে মৃত্যুও আসবে, এই জন্য এই সব নশ্বর সুখ থেকে মুখ ঘোরাও।

'তুমি তেরোবছর ধৈর্য রেখেছ। সে-সময় তুমি যুদ্ধ করোনি। সেই জন্য আমি তো এই ভরসাতেই ছিলাম যে তুমি সারা ব্যাপারটা ভুলে গিয়ে নিজের ধৈর্য বজায় রাখবে। তুমি কেন আবার এখন পুরোনো ঘা'কে জিইয়ে তুলছ? বুদ্ধিমান লোকেরা তো অন্যকেও লড়াই করা থেকে নিরস্ত করে থাকেন কিন্তু তুমি তো মনে হয় বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়েই বসে আছ।'

'বলা হয়ে থাকে যে সমঝদার লোক ক্রোধের বশীভূত হন না, কেন না ক্রোধ হল সব চেয়ে প্রবল বিষ। তাই জ্ঞানী লোকেরা ক্রোধকে হজম করে ফেলেন এবং শান্তি লাভ করেন। হতে পারে তুমি ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য এবং আমার সন্তানদের বধ করে ফেলবে। কিন্তু আমাকে বলো, এতে তোমার কী লাভ হবে? আমি যদি মেনেও নিই যে তোমারই জয় হবে তা হলেও আপন স্বজনদের মেরে তুমি সারা জীবন পস্তাতেই থাকবে। এইভাবে তোমার জীবন দুঃখেই কাটবে। অতএব ক্রোধকে ত্যাগ করো এবং আবার বনে চলে যাও এবং ভিক্ষা করেই জীবন নির্বাহ করো, শান্ত থাকো অথবা যাদবদের দয়ার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকো এবং সুখী থাকো।'

সঞ্জয় এই বক্তব্য শুনিয়ে চুপ করে বসে পড়ল। পাণ্ডবরা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ভীম অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। সব ভাইয়েরা রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। অর্জুনের মনে হল এখুনি যুদ্ধ আরম্ভ করে দিই। যুধিষ্ঠির সঞ্জয়ের দিকে মুখ করে বললেনঃ 'সঞ্জয়! আমার জ্যেঠামশাই বৃদ্ধ, প্রবীণ। তাই আমাকে ভাল-মন্দ বলার অধিকার তাঁর আছে নিশ্চয়ই কিন্তু তিনি সেই অধিকারের অসদ্‌ব্যবহার করছেন। যাই হোক, এর উত্তর কৃষ্ণই দেবেন। আমি লড়ব কি লড়ব না, এ বিষয়ে সব ভার স্থির করার অধিকার শ্রীকৃষ্ণেরই। তাঁর অনুমতি ছাড়া আমি কিছুই করতে পারি না। যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ আমার সহায় আছেন আমার কোনো বিষয়ের চিন্তা নেই। কৃষ্ণ! তুমিই বলো, এখন তুমি কি বলছ?'

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কথায় বিহ্বল হয়ে গেলেন এবং সঞ্জয়কে ধর্মসংযুক্ত বচনে বললেনঃ 'সঞ্জয়! পাণ্ডবদের যাতে ভালো হয় তাই দেখা আমার প্রথম ধর্ম বা কর্তব্য। সেইটিকে সামনে রেখেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদেরও দীর্ঘায়ু আমি কামনা করি। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের বুদ্ধির বহর দেখে আমার অনুকম্পাই জাগছে। সে জানে ধর্ম কোন্ দিকে আর পাপ কোন্ দিকে। তা সত্ত্বেও সে যুধিষ্ঠিরকে দোষী বলবার মত ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। তুমিও জানো যুধিষ্ঠির ধর্ম থেকে কখনও বিচলিত হয় না। যুধিষ্ঠির তেরো বছর ধৈর্য ধারণ করেছে,

কেননা সে ধর্মকে ছাড়তে চায় নি। নইলে কবেই সে কৌরবদের শেষ করে দিতে পারত। কিন্তু ধর্মই তাকে আটকে রেখেছে। তা সত্ত্বেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের উপরই দোষারোপ করছে। মনে হচ্ছে তার বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়েছে। তোমার রাজার বেদান্ত আওড়াবার কোনো অধিকার নেই। সে দাম্ভিক ও অহঙ্কারী। দ্রৌপদীর অপমান ঘটল, সে-ই একটি পাপই দুর্যোধনের নিধনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সেই অপমান আমাদের মধ্যে কেউই ভুলিনি। ভীম বনে যাবার আগে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তা সে ভুলতে পারে না। দুঃশাসন ভীমকে অপমানিত করে 'গোরু' বলে সম্বোধন করেছিল। তা-ও ভীম ভোলে নি। সে দুঃশাসনের রক্তের পিপাসু। দুর্যোধনকে বোলো, ভীম ঘুমের মধ্যেও দুর্যোধনের উরুর কথা মনে রাখে। সে তা ভেঙেই ছাড়বে। এ সব তোমার জানা আছে, মনেও আছে। তা সত্ত্বেও তোমার মহারাজ কেমন করে সে-সব কথা ভুলে গেলেন? যদি ভুলে গিয়ে থাকেন, তা হলে আমি এক এক করে সে-সমস্ত কথা তাঁকে আবার শোনাতে পারি। তা সত্ত্বেও আমি শান্তি চাই। মহারাজকে গিয়ে বলো যে আমি নিজে হস্তিনাপুরে এসে তোমার মহারাজের দুষ্ট পুত্রদের আবার বোঝাবার চেষ্টা করব। যদি আবারও তারা না মানে, তা হলে তার একমাত্র দাওয়াই হল তীক্ষ্ম বাণ। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি দুর্যোধন অধর্ম ত্যাগ করে যুধিষ্ঠিরের ন্যায়সঙ্গত দাবী স্বীকার করে নেয়, তা হলে আমি যুদ্ধ হতে দেব না।'

সঞ্জয় হস্তিনাপুরে ফিরে যাবার আয়োজন করল। পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিল। যাবার সময় সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে বললঃ 'আমি দূত হয়ে এসেছি, এই জন্য তোমাকে এই দুঃখকর বার্তা আমাকে শোনাতে হল, নইলে আসলে তো আমি তোমারই বন্ধু।' যুধিষ্ঠির আবার সঞ্জয়ের মারফৎ কৌরবদের শুভেচ্ছা পাঠালেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থের দাবীও রাখলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের এই নম্রতা অর্জুনের পছন্দ হল না। সে সঞ্জয়কে দিয়ে দুর্যোধনের প্রতি কঠোর বার্তাও পাঠাল কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁর নম্রতা ত্যাগ করলেন না। শেষে সঞ্জয়কে বিদায় দিলেন।

সঞ্জয় উপপ্লব্য থেকে ফিরে হস্তিনাপুরে পৌঁছে সোজা ধৃতরাষ্ট্রের মহলে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র উপপ্লব্যে কি হল জানবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। সঞ্জয় সংক্ষেপে বললেনঃ 'যুধিষ্ঠির আপনাকে প্রণাম জানিয়েছেন। সকলের কুশল-মঙ্গল জিজ্ঞাসা করেছেন। পাণ্ডব এবং শ্রীকৃষ্ণ সব কুশলে আছেন। আমার সেখানে গিয়ে বড় আনন্দ লাভ হয়েছে। ওখানকার পরিবেশ বড় নির্মল ও বিশুদ্ধ। তোমার এখানে তো যত কলুষতা নোংরামি ভরে আছে।

আমার তো না ভালো লাগে তোমার ব্যবহার, না তোমার কথাবার্তা। আমি দূতের কাজ ঠিক মতই করেছি কিন্তু তাতে আমার কোনো তৃপ্তি বা আনন্দ ছিল না। তুমি পাপ কর্ম করছ, তা সত্ত্বেও তুমি নিজের মঙ্গল আশা করো, এ বড় আশ্চর্য। আমি তোমার বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। যুধিষ্ঠিরের বার্তা আমি তোমাকে কাল শোনাব। আজ আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এজন্য একটু বিশ্রাম করব।'

এই বলে তো সঞ্জয় নিজের বাড়ী গেল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের ভয়ানক অস্থিরতা দেখা দিল। সারা রাত তার ঘুম হল না। তখন সে বিদুরকে ডেকে পাঠাল। রাজা বলল: 'বিদুর! আমি অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছি। আমার ঘুম আসছে না। আমাকে কিছু উপদেশ দাও যাতে একটু শান্তি পাই।' এই শুনে বিদুর রাজাকে এক দীর্ঘ উপদেশ দিল, যা 'বিদুর-নীতি' নামে প্রখ্যাত হয়েছে। সেই নীতি সকলের মননের উপযুক্ত। এখানে তা আর উল্লেখ করা হল না।

দ্বিতীয় দিন সঞ্জয় সমস্ত কথা ধৃতরাষ্ট্র এবং তার সভাকে শোনাল, সবাই চুপচাপ শুনে গেলেন। ভীষ্ম দুর্যোধনকে ভালবেসে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যাতে সে ন্যায়পথের অনুসরণ করে, কিন্তু তাতে তিনি সফল হলেন না।

কর্ণ তো চটে উঠলেন কিন্তু পিতামহ তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। তিনি দুর্যোধনকেই বোঝাতে থাকলেন। কিন্তু দুর্যোধন কোনো উত্তর দিলেন না। ধৃতরাষ্ট্র বারবার সঞ্জয়ের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। সঞ্জয় পাণ্ডবদের অমোঘ শক্তির বিশদ বিবরণ দিলেন, আর এই বর্ণনা করতে করতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রও ভয়ের চোটে ঘাবড়ে গেলেন। সমগ্র ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে যেন মহাকালের অগ্নিশিখায় আচ্ছাদিত বলে মনে হল। তিনি বললেন: 'সঞ্জয়! কী করি? তোমার কথা তো সবই ঠিক কিন্তু আমার ছেলে তো আমার কথা মানে না।'

এতে সঞ্জয় চটে উঠলেন। তিনি বললেন: 'ধৃতরাষ্ট্র! আসলে তুমিই হচ্ছ পাপী। বিদুর, ভীষ্ম সবাই তোমাকে বোঝালেন কিন্তু তুমি কারুর কথাই মানোনি। তোমার দৃঢ় ইচ্ছা তো এই ছিল যে পাণ্ডবরা জুয়াখেলায় হেরে যাক এবং তোমার ছেলেদের জয় হোক। এখন তোমার ছেলেদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তোমার ছেলেরা একদিক দিয়ে ভাগ্যবান যে তারা রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করে মারা যাবে। কিন্তু মহারাজ! তুমি তো ভাগ্যহীন, দুর্ভাগা কেননা তুমি সারা বংশের বিনাশের কথা শুনবে এবং তা সত্ত্বেও বেঁচে থাকবে। তাই আমি তোমার জন্যই শোকাতুর।' দুর্যোধন কিছু আস্ফালন করল। সঞ্জয় ও বিদুর সবাই আবার তাকে বোঝাল কিন্তু সে রাগের চোটে সভা ছেড়ে চলেই গেল।

ধর্ম ও অধর্ম

শ্রীকৃষ্ণ সঞ্জয়কে দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে এই বলে পাঠালেনঃ 'আমি নিজেই হস্তিনাপুরে গিয়ে আবার একবার শেষ চেষ্টা করব। তোমাকে এবং তোমার ছেলেদের বোঝাব যাতে যুদ্ধ না হয় এবং কৌরব-বংশ সর্বনাশ থেকে রক্ষা পায়।' তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

হস্তিনাপুর যাবার আগে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া দরকার ছিল। পরামর্শের এই কার্যক্রমের সূচীতে সবচেয়ে জরুরী এবং দামী পরামর্শ তো যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেই করবার ছিল। সেই প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠির বললেনঃ 'কৃষ্ণ! তোমার তো হস্তিনাপুরে যাওয়া দরকার। ধৃতরাষ্ট্র তো ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য খুইয়ে বসে আছে। আমার যুদ্ধ পছন্দ নয় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি হচ্ছি ক্ষত্রিয়। এই জন্য আমি নিরুপায়। যদি আমি শূদ্র হতাম তা হলে সেবা করেই পেট ভরে নিতাম অর্থাৎ উদরসংস্থান করতাম। যদি বৈশ্য হতাম, তা হলে কেনা-বেচা করে উদরভরণ করতাম। যদি ব্রাহ্মণ হতাম তা হলে ভিক্ষা চেয়েই কাজ চালিয়ে নিতাম। কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে আছি ক্ষত্রিয় হয়ে। ক্ষত্রিয় তো দিতেই পারে, চাইতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে আমাকে আমার খুড়োমশাইয়ের লোভ-প্রবৃত্তির দরুণ যুদ্ধ করতেই হবে।

'যারা আমার স্বজন আছে, আমার প্রিয় আছে তাদের মৃত্যুও আমাকে দেখতে হবে। যদি আমি যুদ্ধ না করি তা হলে আমার নিন্দা অপযশ হবে এবং লোকে উপহাসও করবে। সেই জন্য তোমার এই শান্তির জন্য প্রয়াস অভিনন্দনীয়। আমার আশা যে তুমি সাফল্য লাভ করবে।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেনঃ 'আমি যথাসাধ্য আপ্রাণ চেষ্টা করব এবং যদি সাফল্য লাভ করি, তা হলে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ রক্ষা পাবে।'

যুধিষ্ঠির আবার বললেনঃ 'কৃষ্ণ! তোমাকে পাঠাতে আমার ভয়ও লাগছে, পাছে দুষ্ট দুর্যোধন তোমার কোনো ক্ষতি করে বসে।'

কৃষ্ণ বললেনঃ 'আমি মানছি দুর্যোধন নীচ এবং পাপী, সে সব কিছু করতে পারে কিন্তু তুমি বিশ্বাস রেখো সে আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যদি সে কিছু নষ্টামি করে তা হলে তুমি যে যুদ্ধ করবে তার আগেই আমি তাকে এবং তার সম্পূর্ণ বংশকে ধ্বংস করে দেব। এই কারণে আমার জন্য তুমি চিন্তা কোরো না। তবে কোনো বোঝাপড়ার আশাই আমি করি না।

'সঞ্জয় তোমাকে ধৃতরাষ্ট্রের বার্তা শুনিয়েই দিয়েছে। তারপরে তোমার পক্ষে কৌরবদের প্রতি কোনোরকম দয়া দেখানই উচিত নয়। তুমি হচ্ছ ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দুটিই পথ আছে—হয় বিজয় নয় মৃত্যু। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দুইকেই স্বাগত জানানো উচিত। তোমার দুর্বলতা দেখান উচিত নয়। আত্মীয়দের প্রতি মমতায় মোহে তোমার দীন দুর্বল হওয়া শোভা পায় না। কৌরবরা পাপী, তাদের বধই প্রশস্ত।

'ক্ষত্রিয়ের কেউ স্বজন বা আত্মীয় থাকতে পারে না। পিতামহের প্রতিও তোমার অনুরাগ ত্যাগ করা উচিত। প্রশ্ন হল ধর্ম আর অধর্মের। স্বজন বা পরজনের নয়। অধর্মকে প্রতিরোধ করার জন্য পিতামহ বা দ্রোণ কিছুই করেন নি। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা হল, তখনও তাঁরা মৌন হয়েই থাকলেন। এই অধর্মের দণ্ড সবাইকেই ভুগতে হবে। ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভা পাপের ভাণ্ডার, তাকে ধ্বংস করাই ধর্ম। হস্তিনাপুরে আমি কোনো সাফল্যই লাভ করতে পারব না। তবে আমার যাবার উদ্দেশ্য তো এটাও যে সেখানকার নাগরিক-দেরও আমি জানিয়ে দিতে চাই যে তাদের রাজা কিরকম নৃশংস এবং যুধিষ্ঠির ধর্মের পথেই আছেন। এই সব কথা আমি সেখানকার জনগণকে বলব। আমি চললাম। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি যুদ্ধের প্রস্তুতিতে লেগে যাও। আমার সফলতার একেবারেই কোনো আশা নেই।'

ভীমের সঙ্গেও পরামর্শ করা হল। তখন ভীম বললঃ 'কৃষ্ণ! তুমি যদি সাফল্য লাভ করতে পারো, তা হলে আমি খুশিই হব। দুর্যোধন দুষ্ট এবং অহংকারী, তা সত্ত্বেও যদি শান্তি স্থাপন হয়ে যায় তা হলে তা মঙ্গলই হবে।'

এ কথা শুনে কৃষ্ণ খুব জোরে হেসে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন 'ভীম! তোমার মধ্যে আবার এইরকম নম্রতা ও শান্তির স্পৃহা কবে থেকে জাগল? কাল পর্যন্ত তো তুমি যুদ্ধের কথাই বলেছ, আজ শান্তির উপর লেকচার দিচ্ছ। তেরো বছর ধরে এক রাতও তুমি সুখে নিদ্রা যাওনি। বারবার তুমি

নিজের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করেছ। আজ দেখছি বড় শান্তিপ্রিয় হয়ে পড়ছ! তুমি হচ্ছ ক্ষত্রিয়। কৌরবদের পাপের কথা স্মরণ করো, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এদের সবাইকে বধ না করছ ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কোনো শান্তিলাভের আশা নেই।' এতে ভীম রেগে গেলেন। তিনি বললেনঃ 'কৃষ্ণ! আমাকে নির্বল বলে গাল দিও না। আমি সেই ভীমই আছি, যা আগেও ছিলাম।'

কৃষ্ণ বললেনঃ 'ভীম! তৈরী হয়ে যাও, যুদ্ধ বন্ধ হবে না।' অর্জুনের পালা যখন এল, তখন তিনি বললেনঃ 'কৃষ্ণ! যা উচিত হয় তাই করো। আমার কোনো চিন্তা নেই। যুদ্ধ হয় তো তৈরীই আছি, না হয় তা-ও ভালো।' কৃষ্ণ বললেনঃ 'অর্জুন! এ কথা মনে রেখো যে কাল হচ্ছে সব চেয়ে প্রবল। যা বিধি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তাকে আমিও প্রতিরোধ করতে সক্ষম নই। তুমি মনে করছ আমি সব কিছু করতে পারি, যা খুশি করতে পারি কিন্তু এ আশা মিথ্যা। আমার কাছে কোনো দৈবী শক্তি নেই। যা সম্ভাব্য যা ঘটবার তাই ঘটবে।'

নকুল, সহদেবও আপন আপন অভিমত জানালেন। তাঁরা দুজনেই যেন ক্রোধে আবিষ্ট হয়ে ছিলেন। সাত্যকি তো আরও গরম হয়ে ছিলেন। তিনি বললেনঃ 'একমাত্র দুর্যোধনের মৃত্যুই পাপকে দূর করতে পারে।'

সব শেষে দ্রৌপদীর পালা এল। সে তো আগে থেকেই গুমরে উঠছিল ভিতরে ভিতরে। কৃষ্ণর সঙ্গে দেখা হবার পর সে যেন একেবারে রাগে ফেটে পড়ল। নিজের বেণী দুটিকে হাতে নিয়ে সে বললঃ 'কৃষ্ণ! এদের মনে রেখো। দুষ্ট দুঃশাসন আমার কেশপাশকে অপবিত্র করেছে, সেই থেকে আমি বেণী বাঁধা ছেড়ে দিয়েছি। দুঃশাসন, যে হাত দিয়ে আমার চুলের ঝুঁটি ধরেছিল, তার সেই হাত কাটা হলে তবেই আমি শান্তি লাভ করব। তখনই কেবল আমি আমার বিনুনি বাঁধব। আমি আগুনের মত জ্বলছি। একমাত্র তুমিই আছ যে আমাকে শান্তি দিতে পারো।' কৃষ্ণ বললেনঃ 'দ্রৌপদী! কেঁদো না। কিছুদিনের মধ্যেই তোমার শত্রুদের স্ত্রীরা কাঁদবে।'

এইভাবে মন্ত্রণার পর কৃষ্ণ রথের উপর বসে হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হলেন। পাণ্ডবরা কৃষ্ণের রথকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন। সাত্যকি কৃষ্ণের সঙ্গে হস্তিনাপুরে গেলেন।

ধৃতরাষ্ট্র যখন নিজের গুপ্তচরদের কাছ থেকে শুনলেন, যে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হয়েছেন, তখন তিনি ভীষ্ম আর বিদুরকে পরামর্শের জন্য ডাকলেন। সঞ্জয়কেও আসবার জন্য বলে পাঠালেন। দ্রোণ এবং দুর্যোধন তো আগেই রাজার কাছে ছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র এই পরামর্শের প্রসঙ্গেই তাঁদের বললেনঃ 'মহান্ কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে আসছেন। তিনি যুদ্ধের বিষয় কথা বলতে আসছেন। কৃষ্ণ একজন মহাপুরুষ। এই জন্য তাঁর যথাযোগ্য সৎকার করা উচিত এবং যে কোনো উপায়ে তাঁকে প্রসন্ন বা খুশি করা প্রয়োজন। তাঁর শুভেচ্ছা আমাদের বিশেষ দরকার। সেই জন্য তাঁর সমাদর এবং বিশ্রামের ভাল ব্যবস্থা হওয়া দরকার। পথেও তাঁর যাত্রা যাতে সুখকর হয় তারও ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।' আবার দুর্যোধনকে বললেনঃ 'দুর্যোধন! যদি আমরা কৃষ্ণকে খুশি করতে পারি তা হলে তোমারই লাভ হবে। ভীষ্ম! তোমার কি মত?' ভীষ্মও এ কথার অনুমোদন করলেন। দুর্যোধন বললেনঃ 'আমি যথোচিত সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি।'

বিদুরকে ধৃতরাষ্ট্র বললেনঃ 'কৃষ্ণ আজ রাত্রে কুশস্থলে পৌঁছে আগামীকাল হস্তিনাপুরে পৌঁছে যাবেন। বিদুর! তুমি নিজের হাতে সমস্ত ভার নিয়ে এই মহান্ পুরুষের সমাদরের সব ব্যবস্থা করো।' একটু থেমে বিদুরকে তিনি আবার বললেনঃ 'কৃষ্ণকে বহুমূল্য উপহার এবং মণিমুক্তাদিও দেওয়া উচিত। একটি ভাল রথ এবং ভাল ঘোড়া এবং আরও হাজারও জিনিস উপঢৌকন হিসাবেও কৃষ্ণকে দেওয়া উচিত। আমি তাঁকে খুশি করার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। তোমরা সবাই এ সম্বন্ধে কি বলো?'

বিদুর মুচকে হেসে বললেনঃ 'রাজন্! এই ভূমণ্ডলে কৃষ্ণের মত মহান্ পুরুষ না আজ পর্যন্ত কেউ জন্মেছে, না ভবিষ্যতে জন্মাবে। সেই কৃষ্ণ সম্বন্ধে তুমি বাচ্চাদের মত কথা বলছ। তুমি কৃষ্ণকে জানো না। তুমি তাঁকে ঘুষ দিয়ে কিনতে চাইছ, এতে আমার হাসি পাচ্ছে। হঠাৎ তুমি আকস্মিকভাবে এত উদার হয়ে পড়লে কি করে? পাণ্ডবদের তো তুমি পাঁচখানি গ্রাম দিতেও প্রস্তুত নও আর কৃষ্ণকে মণিমুক্তা দিয়ে জয় করতে চাও? যদি তুমি সত্যি সত্যি কৃষ্ণকে খুশি করতে চাও তা হলে তার একটিই পথ আছে। সেটি হল এই যে তাঁর অভিমতকে স্বীকার করে নাও। কৃষ্ণের সবচেয়ে বড় সম্মান হবে এইটিই যদি তুমি তাঁর কথাকে মেনে নাও। কৃষ্ণ তোমার মঙ্গলের জন্যই আসছেন। তিনি শান্তি চান। তোমারও মঙ্গল তাতেই। কিন্তু কৃষ্ণকে হীরাজহরৎ দিয়ে কিনতে চাইছ, এতে আমার হাসি পাচ্ছে। আকস্মিকভাবে এত উদার তুমি কি করে বনে গেলে?'

দুর্যোধনও এ সব শুনছিল। সে বললঃ 'খুড়ো বিদুর ঠিকই বলছেন। পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণের অচ্ছেদ্য প্রেম। পিতৃদেব! আপনার পরামর্শ মূর্খতাপূর্ণ। কৃষ্ণ এমন পাগল নয় যে তাকে এইরকম লোভ দিয়ে ফাঁসান যাবে। হীরামোতি দিয়ে কৃষ্ণকে কিনে নেবার চেষ্টা করা, এ হল কৃষ্ণকে অপমান করা।

কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠেরও শ্রেষ্ঠ, বড়র চেয়েও বড়। তিনি সত্যিই মহাপুরুষ। আপনার এই পরিকল্পনা থেকে আমারও কোনো লাভ হবে না। তাঁর সৎকার-সমাদর নিশ্চয়ই করা উচিত, কিন্তু এই ধরনের পাগলামির চেষ্টা ত্যাগ করা উচিত।' ভীষ্ম বললেনঃ 'কৃষ্ণ মান-অপমানের ঊর্ধ্বে। তিনি সত্যব্রত এবং সত্যপ্রিয় মহাপুরুষ। তাঁকে যদি খুশি করতে হয় তা হলে তাঁর কথাকে মেনে নেওয়া উচিত।'

দুর্যোধন একটু চটে উঠল। সে বললঃ 'পিতামহ! আপনি পাণ্ডব-দেরই ন্যায়ব্রতী বলে মনে করেন এবং তাদের গুণগানে আপনার কখনও ক্লান্তি নেই। কিন্তু আমি একটি পরিকল্পনা করে রেখেছি। সেটি হল এই যে আমি কৃষ্ণকে ধরে পাকড়ে কারাগারে পুরে ফেলি। এইভাবে পাণ্ডবরা অসহায় হয়ে পড়বে আর এই সারা ফাসাদও চুকে যাবে। আমাব মতে এই হল সব চেয়ে ভালো উপায় এবং একে কার্যে পরিণত করার জন্যই আমি চেষ্টা করব।'

ধৃতরাষ্ট্র এই শুনে ঘাবড়ে গেল। সে বললঃ 'পুত্র! এরকম মূর্খামি কক্ষনো কোরো না। কৃষ্ণ দূত হয়ে আসছেন। তিনি আমাদেরই পরিবারের একজন। তাঁর কোনো ক্ষতি করা মহাপাপ।'

ভীষ্ম যখন শুনলেন তখন খেপে উঠলেন। তিনি বললেনঃ 'ধৃতরাষ্ট্র তোমার ছেলে সর্বনাশ করিয়েই ছাড়বে। তার কথা শুনে আমার ধিক্কার জন্মে যাচ্ছে। আমি আর বেশি শুনতে চাই না। আমি এবার যাচ্ছি।' এই বলে ভীষ্ম সেখান থেকে চলে গেলেন।

অধর্মশীল দুর্যোধন

এর পরের দিন কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে পৌঁছুলেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপ আগুয়ান হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গেলেন। দুর্যোধন, তার ভাই এবং কর্ণও স্বাগত অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। সমস্ত শহর সাজান হল। নাগরিকরা কৃষ্ণকে বিপুল অভ্যর্থনা জানালেন। কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের রাজ-ভবনে পৌঁছালেন। রত্নখচিত সিংহাসনে তাঁকে বসান হল। কৃষ্ণের মুখ প্রসন্নতায় উদ্ভাসিত ছিল। বৃদ্ধদের নমস্কার করে এবং আনুষ্ঠানিক স্বাগতের পর তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে উঠে বিদুরের কাছে চলে গেলেন। সেখানে কুন্তীর সঙ্গে মিলিত হলেন। কুশল-মঙ্গল জিজ্ঞাসাদি হল। কুন্তী নিজের ছেলে-দের কুশল-মঙ্গল জানতে চাইলেন। কৃষ্ণ বললেনঃ 'পিসি! এবার তোমার দুঃখের দিন শেষ হতে চলেছে। এবার সুখের উদয় ঘটতে যাচ্ছে। পাণ্ডব-দের তপস্যার ফল শীঘ্রই মিলবে। তুমি চিন্তা কোরো না।'

কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে কৃষ্ণ দুর্যোধনের রাজভবনের দিকে এগিয়ে গেলেন। দুর্যোধনের বাড়ী এমন একটি সুন্দর ইমারত যে তা যেন ইন্দ্রের রাজপ্রাসাদ-কেও হার মানায়। কয়েকটি সিঁড়ি পার হয়ে গিয়ে কৃষ্ণ দুর্যোধনের রাজ-প্রাসাদের ভিতরে এক অত্যন্ত সুসজ্জিত দালানে গিয়ে পৌঁছালেন, যেখানে দুর্যোধন নিজের সঙ্গী-সাথীদের আশে-পাশে বসিয়ে নিজে এক উঁচু সিংহাসনের উপর বসে ছিল।

কৃষ্ণ এসে পৌঁছুতেই, দুর্যোধন, শকুনি এবং তার সঙ্গী দুঃশাসন, কর্ণ ইত্যাদি সবাই উঠে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকে স্বাগত জানালেন এবং অত্যন্ত আদর-যত্নের সঙ্গে তাঁকে এক উচ্চাসনে বসালেন। এই উচ্চাসনটি মণি-মুক্তাখচিত এবং হাতির দাঁতের ও সোনার কাজ করা সুন্দর অলঙ্করণে সুশোভিত ছিল।

কৃষ্ণের মুখে প্রসন্নতা ও মৃদু হাসি লেগে ছিল। আকৃতির মধ্যেও

প্রফুল্লভাব ছিল। পরস্পরের কুশল বিনিময়ের পর দুর্যোধন কৃষ্ণকে বলল ঃ 'কৃষ্ণ! এই ব্যাপারে আমার মনে বড় আঘাত লেগেছে যে তুমি আমার আতিথ্য গ্রহণ করলে না। আমি তোমার আদর-অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন করে রেখেছিলাম। তোমার জন্য আমি অনেক রকম রান্না তৈরী করিয়েছিলাম। তুমি সে-সবকে তুচ্ছ করে অবহেলা দেখিয়ে বিদুরের কাছে গিয়ে থাকলে, এতে আমার বড় কষ্ট হল।'

কৃষ্ণ তো প্রথমে চুপচাপ শুনেই যাচ্ছিলেন, শেষে মৃদুভাবে বললেন ঃ 'দুর্যোধন! এরকম বলছ কেন? তুমি তো আমার যথেষ্ট আতিথ্য করেছ। তোমার এখানে উঠিনি বা থাকিনি, এর জন্য অনুযোগ করা বৃথা। নিজের কাজ সমাধা হয়ে গেলে আমি নিশ্চয়ই তোমার বাড়ীতে থাকব এবং তোমার সঙ্গে খাব।'

দুর্যোধন বলল ঃ 'তোমার এ বলাটা যুক্তিযুক্ত নয়। তোমার কাজ সমাধা হোক বা না হোক, তুমি আমার কুটুম্ব বা আত্মীয় আছই। দুইপক্ষের কাছেই তুমি সমান সমাদরের যোগ্য। এই জন্য আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে তুমি আমারই অতিথি হয়ে থাকো। তোমার এবং আমার মধ্যে তো কোনো মনান্তর নেই। কুটুম্ব বা আত্মীয়তার সম্বন্ধের দরুণও তোমার উপর আমার কিছু দাবী বা অধিকার আছে। তা সত্ত্বেও তুমি আমার আতিথ্য গ্রহণ করলে না, এটা তোমার সরাসরি ভুলই হয়েছে।'

শুনে কৃষ্ণ একটু মুচকি হেসে বললেন ঃ 'তুমি, দুর্যোধন, অনুযোগ করছ, তাই আমাকে একটু খোলাখুলিই বলতে হবে। তোমার এই বিপুল আতিথ্যে আমার কোনো রুচি নেই, কেননা যে-বাড়ীতে সত্য আব ন্যায়ের স্থান নেই, সেখানে সেই বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করতে আমার স্পৃহা নেই। পাণ্ডবদের উপর তোমার অত্যন্ত বিদ্বেষ। তাদের সঙ্গে তোমার শত্রুতা এবং তা একেবারেই অকারণে। যে মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে ন্যায়ের পথ থেকে বিভ্রষ্ট বিচলিত হয়, তাকে আমি মানুষদের মধ্যে এক অত্যন্ত ঘৃণ্য হীন জীব বলে মনে করি। এই জন্য তোমার অন্ন খাওয়া আমার কাছে শত্রুর অন্ন খাওয়া। তা আমি কেমন করে খেতে পারি? পাণ্ডবরা আমার প্রাণ, কারণ তারা সত্য এবং ধর্মের পথে আছে। বিদুরও ন্যায়পথের পথিক, সেই জন্যই আমি তোমার অন্ন ত্যাগ করে তারই বাড়ী চলে গেলাম। এই স্পষ্ট কথাটি তোমাকে বলে দেওয়া কর্তব্য বলেই আমাকে মুখ খুলতে হল। এই বলে কৃষ্ণ উঠে দাঁড়ালেন এবং হেঁটেই বিদুরের বাড়ীর দিকে চলে গেলেন।

কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে ভীষ্ম এবং কৃপাচার্যও বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরা বললেন ঃ 'কৃষ্ণ! আমরা তোমার জন্য যে জায়গা ঠিক করে রেখেছি,

সেখানেই চলো।' কিন্তু কৃষ্ণ বললেনঃ 'পিতামহ! আপনি আমাকে আশীর্বাদ দিয়ে কৃতার্থ করেছেন, সেইটিই আপনার কম আতিথ্য নয়। আমাকে এখন ক্ষমা করুন। আপনারা সব ফিরে যান, কেননা আমি বিদুরের ওখানেই থাকব।'

বিদুরের বাড়ীতে পৌঁছুতেই কৃষ্ণকে পরম প্রেমে স্বাগত জানান হল। বিদুরের কাছে খাওয়া-দাওয়া করে কৃষ্ণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন। তারপর দুজনে মিলে প্রস্তাবিত বিষয় নিয়ে পরস্পর কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। বিদুর বললেনঃ 'কৃষ্ণ! তোমার আসা নিষ্ফল হবে। দুর্যোধন হচ্ছে মূঢ়। সে কিছুই শুনতে প্রস্তুত নয়। সে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে। পাপে তার বুদ্ধি মলিন হয়ে গিয়েছে। সে তোমার পরামর্শ শুনতে রাজী নয়। সে মনে করে যুদ্ধে তার জয় অবশ্যম্ভাবী। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ এবং জয়দ্রথ সব তার দিকে এবং সে এক বিশাল সেনাও একত্র করেছে। সে তো মনে করে একলা কর্ণই তার জয়ের পক্ষে যথেষ্ট। তবে আবার মিটমাট বোঝাপড়া কিসের জন্য? সে যুদ্ধ থেকে বিরত হবে না।'

'এদের মধ্যে গিয়ে তোমার বসাটাও আমার মনে কিরকম ঠেকছে অর্থাৎ পছন্দ নয়। আমি তোমাকে ধৃতরাষ্ট্রের রাজভবনে যাবারও পরামর্শ দেব না। তারা তোমাকে অপমান করবে। তোমার ক্ষতিও করতে পারে। এ সবই আমার কাছে চিন্তার বিষয়।'

কৃষ্ণ বললেনঃ 'বিদুর! তুমি আমার একান্ত শুভার্থী। আমি জানি তুমি যেরকম যা বলছ তাই ঘটবে। এ সব জেনেশুনেও আমি এখানে এসেছি, কেননা আমি এদের সবাইকে কালের মুখ থেকে বাঁচাতে চাই। যদি আমি সফল হই তো ভালোই কিন্তু বিফল হলেও অন্তত আমার এইটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে আমি এক ভালো কাজের জন্য চেষ্টা তো করেছি।

'মানুষ যদি কেবল মনেই পাপের চিন্তা করে এবং সেই খারাপ মতলবকে কাজে পরিণত না করে, তা হলেও সে পাপের ফল থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। এই জন্য যদি আমি দুর্যোধনকে এবং ধৃতরাষ্ট্রের পাপ চিন্তাকে অন্তত কাজে পরিণত হওয়া থেকেও আটকাতে পারি, তা হলে তাদের সবাইকে আমি ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারি।

'কুরুবংশের উপর এ সময় এক মহা বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। ধ্বংসকারী মেঘ যেন ঘনিয়ে আসছে। কারুর বিনাশের সম্ভাবনা জেনেও যদি কোনো সক্রিয় লোক তাকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টা না করে, তা হলে সে-মানুষ মানুষ নয়, সে পশু। পাপীকে যদিও তার পাপ বিনষ্ট করতে চলেছে, তবু সৎ পুরুষের কাজ হল সেই পাপীকে দরকার হলে জোর করেও পাপের কূপ

থেকে টেনে তোলা। আমি এখানে তা-ই করতে এসেছি। আমার এই প্রয়াস বা প্রচেষ্টা সমগ্র মানব-সমাজের সেবা।

'এই জন্য আমি দুর্যোধনকে সবরকমে বোঝাতে চাই যে যুধিষ্ঠির শান্তি চায়। যুধিষ্ঠির আমার প্রিয়। সে এক মহান পুরুষ, ধর্মাত্মা। আমার পক্ষে এটা বিশেষ গৌরবের কথা যে আমি যুধিষ্ঠিরের প্রিয়পাত্র। তার সন্তুষ্টির জন্যও এই সন্ধি-প্রস্তাবকে সফল করতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব। সেই জন্যই আমি এখানে এসেছি। আমি অন্তত প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, এইটুকু মনে করতে পারলেও আমার তৃপ্তি হবে।'

'আরও একটি কথা আছে। আমি কৌরবদের সভায় এই ধরনের ব্যবহার করতে চাই যে যাতে সারা দুনিয়ায় সবাই পুরোপুরি জেনে যায় যে যুধিষ্ঠির শান্তিপ্রিয়, সে শান্তি চায় আর দুর্যোধন চায় যুদ্ধ। যুধিষ্ঠির হল এক সরল, ন্যায়প্রিয়, ধর্মাত্মা ব্যক্তি। অন্যদিকে দুর্যোধন লোভের বশবর্তী হয়ে কেবল পাপাচরণেই উদ্যুক্ত।

'তার পক্ষপাতীদেরও আমি এই বলতে চাই যে ন্যায় কার পক্ষে এবং কিভাবে তারা দুর্যোধনের পক্ষ নিয়ে প্রকারান্তরে পাপেরই পক্ষ নিচ্ছে। ভীষ্ম, দ্রোণকেও আমি এই বলে দিতে চাই যে তাঁরাও সবাই এই পাপের অংশীদার হচ্ছেন।

'যুদ্ধকে থামানো যেতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত তা সত্ত্বেও যদি যুদ্ধ হয়ই, তা হলে সংসার অন্তত জেনে যাবে যে যুধিষ্ঠির শান্তি স্থাপনের প্রয়াস করেছিল। এই সব উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এখানে এসেছি।' এই বলে কৃষ্ণ নিজের বক্তব্য শেষ করলেন এবং শয়নাগারে প্রবেশ করলেন।

পরের দিন সকালে যখন কৃষ্ণ প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করছিলেন, দুর্যোধন, কর্ণ এবং অন্য কৌরবদের সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণকে রাজসভায় নিয়ে যাবার জন্য বিদুরের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। দারুক কৃষ্ণের রথ নিয়ে-এল এবং তার উপর কৃষ্ণ ও বিদুর দুজনে বসলেন। এদিকে দুর্যোধন এবং কর্ণ দুর্যোধনের রথে বসে কৃষ্ণের রথের পিছু-পিছু চললেন। সাত্যকি এবং কৃতবর্মা সবাই তাঁদের পিছন পিছন চললেন।

কৃষ্ণকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য কৌরব-সেনার রক্ষিদলের এক অংশ ধৃতরাষ্ট্রের রাজমহলের দুয়ারে সজ্জিত হয়ে কৃষ্ণের সম্মানের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। এইভাবে কৃষ্ণের অভ্যর্থনার জন্য যা কিছু করা হয়েছিল সবই অতুলনীয়।

কৃষ্ণের রথের সঙ্গে হাতি ও ঘোড়ার শোভাযাত্রা চলতে থাকল। সব নগর-বাসী কৃষ্ণকে দেখবার জন্য ভেঙে পড়েছে। শোভাযাত্রা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ-

প্রাসাদে গিয়ে থামল। এই সোরগোল শুনে কৌরবপক্ষীয় রাজন্যবর্গ কৃষ্ণকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সব বাইরে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন।

যখন কৃষ্ণ রথ থেকে নামলেন, তখন তাঁর এক হাত ধরলো বিদুর এবং অন্য হাত ধরলেন সাত্যকি। কৃষ্ণ যখন কর্ণ এবং দুর্যোধনের সঙ্গে রাজ-ভবনের মণ্ডপে প্রবেশ করলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র অন্য বৃদ্ধ কৌরবদের নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং যতক্ষণ কৃষ্ণ আসন গ্রহণ না করলেন তাঁরা সবাই দাঁড়িয়েই রইলেন। কৃষ্ণের জন্য একটি বিশেষ সিংহাসন রাখা হয়েছিল। বসবার আগে কৃষ্ণ দেখলেন যে নারদ এবং অন্যান্য ঋষিগণও এসে উপস্থিত হয়েছেন, যাঁরা রাজসভায় প্রবেশের জন্য উৎসুক। কৃষ্ণ এ বিষয়ে ভীষ্মকে ইশারা করলেন। ভীষ্ম তা বুঝেই নিজে গিয়ে ঋষিদের অত্যন্ত সম্মানপূর্বক ভিতরে নিয়ে এলেন।

সবাইকে সম্মানপূর্বক আপন আপন আসনে বসাবার পর কৃষ্ণও স্মিত-হাস্য সহকারে আপন সিংহাসনে বসে গেলেন। দুঃশাসন সাত্যকিকেও সসম্মানে এক বিশেষ আসনে বসালেন। দুর্যোধনের ভাই এগিয়ে গিয়ে কৃত-বর্মাকে আসন দিলেন। কৃষ্ণের কাছেই দুর্যোধন এবং কর্ণ একই আসনের উপর বসলেন। শকুনিও তাঁর কাছেই এসে বসে পড়লেন। বিদুর কৃষ্ণের আসনের কাছে বসে গেলেন।

সকলের দৃষ্টি কৃষ্ণের দিকে নির্ণিমেষ নিবদ্ধ। বারবার কৃষ্ণকে দেখেও দর্শকদের যেন তৃষ্ণা মিটছে না। কৃষ্ণের মোহিনী শক্তি যেন সবাইয়ের উপর কী এক জাদু বিস্তার করছিল। তাঁর প্রতিভার আলোকে ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভা যেন আলোকিত হয়ে উঠল।

কৃষ্ণের গলায় কৌস্তুভ মণি ঝুলছিল, পীতবসনে আবৃত কৃষ্ণকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক শ্যামল পর্বত উদীয়মান সূর্যের অরুণচ্ছটায় আচ্ছাদিত। সভায় নিবিড় নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। হঠাৎ কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর সেই নিস্তব্ধ-তাকে ভঙ্গ করল। কৃষ্ণের ভাষণে সভাকক্ষ গুঞ্জরিত হয়ে উঠল এবং মনে হল যেন দূর থেকে কোনো কিছুর গর্জনে যেন সারা বাড়ী কেঁপে উঠল।

ধর্মসভা এবং পাপসভা

কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে বলতে আরম্ভ করলেনঃ 'ধৃতরাষ্ট্র! আমি অনেক যোদ্ধাদের মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি।'

শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে আবারও বললেনঃ 'মহারাজ! হস্তিনাপুরে আমার আসার প্রধান উদ্দেশ্য হল অনেক যোদ্ধাদের মৃত্যু-মুখ থেকে রক্ষা করা। কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে শান্তি-স্থাপন হোক, এই আমার চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। আপনার বংশ জগদ্বিখ্যাত। ভারতবর্ষে কৌরব কুল এক শ্রেষ্ঠ বংশ। কৌরবের পূর্বপুরুষেরা তাঁদের সমৃদ্ধির সময় প্রভূত যশ অর্জন করেছেন। তাঁরা দয়ালুতা, সত্যপ্রিয়তা, উদারতা, ন্যায়প্রিয়তা এবং সৎচিন্তার জন্য প্রখ্যাত হয়ে আছেন। এমন শ্রেষ্ঠ বংশে জন্মগ্রহণ করে আপনার কি এটা উচিত হবে এতদিনের এই ঐতিহ্যের গৌরবকে আপনি নষ্ট করে ফেলবেন?

'আপনি যা করছেন তা আপনার পক্ষে একান্ত অযোগ্য কাজ। আপনার ছেলেরা ন্যায় এবং ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে ফেলেছে। তারা ব্যাধের মত ঘোর পাপের অনুসরণ করছে। তাদের মধ্যে না আছে সংযম, না বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান বুদ্ধি। তাদের কুকর্মের কথা আপনার কাছে লুকানো নেই। পরিস্থিতি এখন এমন সংকটপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তা আপনার বংশ এবং সমগ্র সংসারের পক্ষেও অত্যন্ত সাংঘাতিক ধ্বংসকারক। যদি আপনি চান তা হলে তাদের সংযত করে সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারেন। যদি কোনো কাজ কঠিনও হয়, কিন্তু তার পিছনে যদি প্রবল ইচ্ছা থাকে তা হলে সে কাজ সাধিত হয়ে যায়। সেইজন্য আমি বলছি যে আপনি আপনার পুত্রদের নিয়ন্ত্রণে রেখে তাদের পাপের পথ থেকে নিবৃত্ত করুন। এই রাজসভার সব লোকই জানে যে আপনি যদি চান তা হলে নিজেকে শক্ত করে, নিজের অস্তিত্বকে কায়েম করে নিজের ছেলেদের মরণের পথ থেকে ফেরাতে পারেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কৌরব বংশের জন্য আপনার হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন ও হিতকর। যদি আপনি কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে শান্তিস্থাপন করিয়ে দেন তা হলে আপনার কীর্তি অমর হয়ে থাকবে।

'একটু ভেবে দেখুন তো যে কৌরব-পাণ্ডব দুই পক্ষই যদি আপনার সহায়ক হয়ে আপনার পাশে দাঁড়ায় রক্ষকরূপে, তা হলে আপনি সবরকম শত্রুর হাত থেকেই সুরক্ষিত থাকবেন চিরদিন। ভীষ্ম, দ্রোণ ইত্যাদিরা ছাড়াও যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনও যখন আপনার পক্ষে এসে যাবেন, তখন আপনার বিক্রম ও বৈভব কিরকম বেড়ে যাবে। সেই বিক্রম সারা সংসারকেই আলোকিত করে তুলবে। ইহলোকে এবং পরলোকেও আপনার কীর্তির প্রশংসা হবে। সমগ্র বিশ্বেরই আধিপত্য আপনার হাতে এসে যাবে। আপনার কেউ আর শত্রু থাকবে না। এই ছবিটি ভাল করে চিন্তা করে ভেবে দেখুন।

উলটে আপনি এখন এই যশোলাভের চেষ্টা না করে পাপকে উত্তেজনা দিয়ে বাড়িয়ে তুলে অপযশ কুড়োতে চলেছেন। আপনার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ভেদ-বিভেদ হয়ে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আপনার কী লাভ হবে? আপনার পুত্র এবং তাদের সহায়ক যোদ্ধাদের মৃত্যুতে আপনি কী সুখ পাবেন? আপনার পুত্র বলবান্ কিন্তু পাণ্ডবরা তাদের চেয়ে বেশি বলবান্। এই দুই বংশের যুদ্ধের পরিণাম অত্যন্ত ধ্বংসকারক হবে। যত যোদ্ধা একত্রিত হয়েছে তাদের সকলের মৃত্যু অবধারিত।

'পাণ্ডবরা ভাল মানুষ। আপনার প্রতি তাদের পূজ্য ভাব, শ্রদ্ধার ভাব আছে। স্মরণ করুন কিভাবে এই পিতৃহীন পাণ্ডব বালকেরা আপনার শরণে, আপনার আশ্রয়ে এসেছিল। তা সত্ত্বেও আপনি তাদের সঙ্গে ঘোর দুর্ব্যবহার করেছেন। তাদের মেরে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্র হল, তাদের বনবাসী করা হল এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি আপনি কেড়ে নিলেন। এই সব পাপ করা হয়েছে।

'এর মার্জন বা শোধনের জন্য আপনি নিজের চাল বদলান, রীতি পালটান। তাদের সঙ্গে যথার্থ পিতার মত ব্যবহার করুন। ধর্মের পথকে গ্রহণ করে পাপ থেকে সরে আসুন। এই পথে চললে আপনি পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়েরই ভালবাসা পাবেন এবং আপনার স্থায়ী মঙ্গল হবে।'

'আপনি খুব একটি ভাল সুযোগ পাচ্ছেন যখন কিনা আপনি আপনার আগের করা সব পাপকে ধুয়ে ফেলতে পারেন। এই জন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে পুত্রের মত ব্যবহার করুন এবং কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপন করান।'

'আপনার এই রাজসভায় ধর্ম কোথায়? যেখানে ন্যায়কে অন্যায় দিয়ে, এবং সত্যকে অসত্য দিয়ে চাপা দেওয়া হয়, দাবিয়ে রাখা হয়, যেখানে সভায়

বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ সদস্যেরা এই সব অন্যায় দেখেও মৌন হয়ে থাকেন, সেই সভাকে ধর্ম-সভা কখনও বলা যায় না। সে তো পাপ-সভা হয়ে পড়ে। এই কারণে আমার কথা একটু গভীরভাবে বিচার করুন। পাণ্ডবদের রাজ্য পাণ্ডবদের ফিরিয়ে দিন।'

'যুধিষ্ঠির ধর্মের প্রতিমূর্তি। তার সঙ্গে যা অন্যায় করা হয়েছে, সে তা ভুলে যাবে এবং আপনার প্রতি তার আচরণ বা ব্যবহার পিতার প্রতি ব্যবহারের মতই হবে।

'মহারাজ! আমি আপনার হিতৈষী, আপনার শুভাকাংক্ষী। সেই জন্য আমি আপনাকে আপনার পুত্রদের মৃত্যুজনিত দুঃখ থেকে রক্ষা করতে চাই। যদি আপনি বৃদ্ধকালে জীবনের শেষ অবস্থায় শান্তিতে জীবন-যাপন করতে চান তা হলে পাণ্ডবদের সঙ্গে ভাব-সাব করুন। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।'

কৃষ্ণের বক্তব্যের পর চারদিক নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেল। সবাই কৃষ্ণের কথা চুপ করে শুনল। কৃষ্ণ যখন নিজের ভাষণ শেষ করলেন তখনও কারুর মুখ থেকে একটি কথাও বেরুল না।

কিছুক্ষণ পরে ধৃতরাষ্ট্রেরই মুখ খুলল। সে বললঃ 'কৃষ্ণ! তোমার বক্তব্য আমি খুব মন দিয়ে শুনেছি। কিন্তু তুমি কি এটা দেখতে পেলে না বা উপলব্ধি করতে পারলে না যে আমি নিতান্ত অসহায়? আমার কথা কে শুনছে? আমার ছেলেদের আমার ওপর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা সম্মান বোধ নেই। তারা আমার কোনো কথই শুনতে প্রস্তুত নয়। তুমি যদি দুর্যোধন এবং কর্ণকে বোঝাতে পারো তা হলে তাতে আমারও উপকার হবে। গান্ধারীও দুর্যোধনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে-ও বিফল হয়েছে। এখন তুমিও চেষ্টা করে দেখে নাও। তার জন্য আমি তোমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

এই শুনে কৃষ্ণ দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেনঃ 'দুর্যোধন! আমার কথাগুলি একটু মন দিয়ে শোনো। কৌরবগণের শ্রেষ্ঠ বংশের তুমি এক উৎকৃষ্ট সন্তান। তুমি সমৃদ্ধিশালীও বটে। কৌরবদের কুলমর্যাদার অনুরূপ সব গুণও তোমাতে বর্তমান। তা সত্ত্বেও তুমি এ ধরনের হীন কর্মে কেন প্রবৃত্ত হয়েছ?

'প্রিয় দুর্যোধন! যারা নীচ কুলে জন্মেছে, যাদের ঘৃণ্য মনোবৃত্তি বা মনোভাব, সেই সব লোকই লোভের বশবর্তী হয়ে তোমার মত নৃশংস হয়ে পড়ে। কিন্তু তোমার বংশের ঐতিহ্য তো তা থেকে আলাদা। তুমি সেই ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে কেন এ রকম আচরণ করছ? সৎপুরুষেরা ধর্মের পথে

চলে থাকেন। দুষ্ট লোকই এই ধরনের পাপকে অনুসরণ করে। তোমার এ আচরণ বড় কলুষিত, তাই তোমার পক্ষে এ এক চিরকালের কলঙ্ক।

'আমি বলছি তুমি নিজের আত্মাকে রক্ষা করো। এখনও সময় আছে এই চিরন্তন কলঙ্ক থেকে তুমি নিজেকে, নিজের পরিবারবর্গকে, নিজের ভাইদের বাঁচাও। বিবেকসহকারে স্থির নিশ্চয়ে এসে এই পাপ-কর্ম থেকে মুখ ঘোরাও। তোমার পিতা, মাতা এবং অন্য বয়োবৃদ্ধ সবাই এই চাইছেন যে শান্তি-স্থাপন হোক। তুমি যদি মেনে নাও, তা হলে তাঁদের সকলের আনন্দের কারণ হয়ে যাবে তুমি। সেইজন্য কেন আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব, দোনামনা করছ? প্রবীণদের মতকে অবহেলা কোরো না। মনে রেখো তোমার কল্যাণ শান্তি-স্থাপনের মধ্যেই নিহিত আছে।

'সংসারে তিন ধরনের লোক হয়। এক তো তারা যারা স্বভাব অনুসারেই ধর্মের পথে চলে। দ্বিতীয় হল যারা নিজেদের লাভের দিকে আকর্ষিত হয়। যদি তুমি এই দ্বিতীয় দলের হও তা হলে আমি যা বলছি তা তোমার পক্ষে লাভজনক। তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করো। তুমি কর্ণ এবং শকুনির সাহায্যে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে চাইছো কিন্তু যদি পাণ্ডবরাও তোমার পক্ষে এসে যায় তা হলে তোমার পক্ষে এ কাজ অত্যন্ত সুলভ হবে, কারণ পাণ্ডবরা বলবান্।

'অর্জুন আর ভীমের সমকক্ষ যোদ্ধা আজ কে আছে? ভীষ্ম পিতামহও তাদের সামনাসামনি টিঁকতে পারবেন না। তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো, তা হলে তোমার পিতা এই বিরাট সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়ে যাবেন। কারও শক্তি হবে না যে কেউ তোমার শক্ত শিকড়কে এতটুকু নাড়াতে পারে।

'আর এক তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ আছে, যাদের স্বভাবত কেবল পাপকর্মেই আসক্তি বা প্রবণতা থাকে। সে বিনা কারণেই পাপে প্রবৃত্ত হয়। সে নিজের লাভ-ক্ষতির বিবেচনা না করেই পাপাচরণ করেই চলে। অবশ্য সে শ্রেণীতে তোমাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

'একবার ভেবে দেখো পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপন করলে তোমার যশ, বৈভব, বল কত বেড়ে যাবে। এই সব লাভের দিকে তুমি কেন চোখ বুজে বসে আছ? এই পাপকে ত্যাগ করে এক নতুন প্রতিভার আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠো। পাণ্ডবদের তাদের অংশ দিয়ে দাও, বিশ্বকে বাঁচাও বিনাশের হাত থেকে।'

কৃষ্ণের এই কথার পর ভীষ্ম এবং দ্রোণও কৃষ্ণকে সমর্থন করলেন। তাঁরাও বললেন: 'পাণ্ডবদের অংশ পাণ্ডবদের দিয়ে সর্বনাশ থেকে বাঁচো।'

শ্রীকৃষ্ণের এই সমগ্র ভাষণে কোনো খোশামুদি ছিল না। কৃষ্ণের বক্তব্যে

স্পষ্টতা ছিল কিন্তু আত্মীয়তা বা মমতা বোধও ছিল। ধৃতরাষ্ট্রকে আঘাত করলেন। তার পাপ কর্মের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে তাকে সোজাসুজি শুইয়ে দিলেন। ভীষ্ম পিতামহ এবং দ্রোণ ইত্যাদি, যাঁরা মৌন সহযোগী ছিলেন তাঁদেরও পাপের অংশীদার বলে জানিয়ে দিলেন। দুর্যোধনকেও ছাড়লেন না আঘাত করতে এবং এ-ও জানিয়ে দিলেন যে এই পাপের পথে চললে সকলেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এ কথাও জানালেন যে এই পাপ থেকে নিরস্ত হবার বিকল্প পথও আছে, যাতে সুখ, কীর্তি ও যশ লাভ হতে পারে।

কৌরব বংশের বড়াই করে এ-ও বললেন যে সেই ঐতিহ্যকে সুরক্ষিত করা কৌরব-সন্তানের ধর্ম বা কর্তব্য। 'তোমরা ভালো, আমি ভালো'—এ ধরণের বাক্যজাল বিস্তার করেননি।

ধৃতরাষ্ট্র তো লজ্জার চোটে নিজের অসহায়তা প্রকট করে সন্তুষ্ট থাকলেন। ভীষ্ম আর দ্রোণ শ্রীকৃষ্ণকে সমর্থন করে নিজেদের প্রাণ বাঁচালেন কিন্তু খল বা দুষ্টদের দলের সর্দার তো ছিলেন দুর্যোধন। সে এই সমগ্র বক্তব্য শুনে টগবগ করে যেন ফুটছিল। তার মধ্যে এ ধরণের বিক্ষোভ জাগা অবশ্যম্ভাবীই ছিল এবং সে ফেটেও পড়ল।

দুর্যোধনের চেহারায় একটা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। এতক্ষণ তো সে শুনেই যাচ্ছিল। এবার তার ক্রোধ যেন ফুঁসে উঠল এবং সে কৃষ্ণের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাঁকে বলতে সুরু করলঃ 'কৃষ্ণ! আমি সব শুনে যাচ্ছি। তুমি, আমার পিতা, পিতামহ ভীষ্ম এবং বিদুর সবাই আমার উপরই অভিযোগ বা দোষারোপ করছ। আমি বুঝতে পারছি না আমি কোন পাপটা করেছি। যুধিষ্ঠির পাশা খেলতে এসে সব কিছু হারিয়ে বসল, তাতে আমার দোষটা কোথায়? আমি যুধিষ্ঠিরের কী ক্ষতি করেছি? তা সত্ত্বেও সে যুদ্ধই করতে চায়, তা আমিও তৈরী আছি। যদি স্বয়ং ইন্দ্রও যুধিষ্ঠিরের পক্ষ নেন, তাতেও আমি ভয়ে পিছ-পা হব না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ সব আমার পক্ষে আছেন। আমি ক্ষাত্র ধর্ম পালন করছি মাত্র। যুদ্ধে যদি আমাকে মরতেই হয় তাতেই বা আমার কী দুঃখ? স্বধর্ম পালন করতে করতে মরব, তাতে স্বর্গের দুয়ার আমার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। আমি মরে যাব, তবু কারও কাছে মাথা নোয়াব না।

'যুধিষ্ঠির কেন ইন্দ্রপ্রস্থের স্বপ্ন দেখছে? ইন্দ্রপ্রস্থ তো গিয়েছে, এখন আর তা পাবার নয় কিছুতেই। কৃষ্ণ! আমি যা বলছি ভাল করে বুঝে নাও এবং মনে রেখো ও যুধিষ্ঠিরকে পরিষ্কার বলে দিও। ইন্দ্রপ্রস্থ তো কোন্ ছার, এক সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও যুধিষ্ঠিরকে দেবার জন্য আমি প্রস্তুত নই। এই আমার শেষ সিদ্ধান্ত, তুমি জেনে নাও।'

জয় করো ইন্দ্রিয়দের

দুর্যোধনের কথা শুনে কৃষ্ণ খুব জোরে হেসে উঠলেন। এই অট্টহাস্যে খেদ এবং ক্রোধ দুই-ই মেশান ছিল। তাই শুনে সারা সভা কেঁপে উঠল। সভার লোকেরা কৃষ্ণের মুচকি হাসি দেখেছিল, তাঁকে রাগত বা ক্রুদ্ধও দেখেছিল, গম্ভীরও দেখেছিল এবং চিন্তিতও দেখেছিল। সবরকমের ভাবই তাঁর চেহারায় লোকে দেখেছিল। কিন্তু এই অট্টহাস্য বড়ই এক অদ্ভুত, অসাধারণ রকমের। সারা সভায় এই অট্টহাস্য এক কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। অট্টহাস করে কৃষ্ণ হঠাৎ নিজের রত্নখচিত সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। চোখ দুটি তাঁর লাল কিন্তু চেহারায় কোনো ক্রোধের আভাস ছিল না।

কৃষ্ণ বললেনঃ 'দুর্যোধন! শোনো। তুমি মরতে চাও? তথাস্তু অর্থাৎ তাই হবে। কিছুদিনের মধ্যেই তোমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে। মৃত্যুর সঙ্গে তোমার অবশ্যই দেখা হবে। ধৈর্য ধরো। তুমি এবং তোমার সাথীরা সবাই কালের করাল গহ্বরে বিলীন হয়ে যাবে। তুমি বলছ, তুমি যুধিষ্ঠিরের কী ক্ষতি করেছ? তোমার এ কথা বলতে লজ্জা হল না? এই সভায় যে-সব লোক উপস্থিত আছেন তাঁরা কি এ কথা জানেন না যে তুমি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ঘোর দুর্ব্যবহার ও অন্যায় করেছ? জুয়াখেলায় শকুনি যুধিষ্ঠিরকে ছল-কপট করে হারিয়েছে, এ কথা কি কারুর কাছে গোপন আছে? নিজের ভাইয়ের স্ত্রীকে লোকভর্তি দরবারের মধ্যে এনে তুমি বে-ইজ্জত করেছ, তার চুলের মুঠি ধরে সভাতে টেনে আনা হয়েছে। প্রবীণ ও বৃদ্ধেরা, যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা এই কুকর্ম বসে বসে দেখলেন, কেউ তার বিরুদ্ধে একটি টুঁ শব্দও করলেন না, আওয়াজও তুললেন না। যে-সব খারাপ খারাপ কথা তুমি, শকুনি, দুঃশাসন এবং কর্ণ দ্রৌপদীকে বলেছিলে তা কি কখনো ভুলে যাওয়া সম্ভব? সব পাণ্ডবদের বারণাবতে পুড়িয়ে মারার জন্য তুমি

ষড়যন্ত্র করেছিলে, ভীমকে বিষ দিয়েছিলে এবং সাপ দিয়ে কামড়িয়েছিলে। এত সব কুকর্ম করেও এখন বলছ কিনা আমি যুধিষ্ঠিরের কী ক্ষতি করেছি? তোমার কি বিবেক বলে কিছু নেই, সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে? সত্যি সত্যি তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে, তাই তুমি এইরকম সব কথা বলছ। তুমি হচ্ছ মহাপাপী, সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষ।'

দুঃশাসন মাঝ থেকেই বলে উঠলেনঃ 'দুর্যোধন! তোমার পিতা, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃষ্ণ সবাই মিলে এক ষড়যন্ত্র করেছে যে তোমাকে এবং আমাদের সবাইকে বন্দী করে পাণ্ডবদের খবরদারিতে সঁপে দেবে, যাতে বাধ্য হয়ে তোমাকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতেই হবে।' দুর্যোধন যখন দুঃশাসনের এই কথা শুনল, তখন সে সাপের মত ফোঁস করে দাঁড়িয়ে উঠল এবং রাজসভার বাইরে চলে গেল।

অহঙ্কার, দর্প এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ দুর্যোধন সভা থেকে এমনভাবে বেরিয়ে গেল, ঠিক যেমন কোনো বাঘ পশুকুলের মাঝ থেকে বেরিয়ে পড়ে। তার উদ্ধত অহঙ্কার ভদ্রতার সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল। দুর্যোধন এত অসহিষ্ণু ছিল যে সে নিজের সমালোচনা শুনতেই পারত না। এই জন্য সে সভা থেকে উঠে বেরিয়েই গেল এবং তার সঙ্গে তার ভাই এবং অন্য সাথীরাও সব বাইরে বেরিয়ে গেল।

ভীষ্ম এ সব দেখলেন এবং দেখে তাঁর দুঃখও হল, রাগও হল। তিনি বলতে লাগলেনঃ 'কৃষ্ণ! এই সব লোকদের অন্তিম কাল ঘনিয়ে আসছে। আমি তা ঠেকাতে চেষ্টা করলাম কিন্তু বিফল হলাম। এদের তো বিনাশ হবেই কিন্তু সেই সঙ্গে ক্ষত্রিয় বংশেরও বিনাশ সুনিশ্চিত। কাল বড় বলবান, কেউ তাকে ঠেকাতে পারে না।' ভীষ্মের এই কথা শুনে কৃষ্ণ বললেনঃ 'পিতামহ! এই সব দোষের আপনারাও তো অংশীদার। আপনারা এই সব পাপকে এতদিন বরদাস্ত করে এসেছেন, তারই এই অশুভ পরিণাম। আপনাদের উচিত ছিল এই সব দুষ্টদের বেঁধে ফেলে এদের কারাবাসে নিক্ষেপ করা। এখনও সময় আছে, আপনারা দুর্যোধনকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করুন। আমার মামা কংস যখন সমস্ত প্রজাবর্গকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল, তখন আমি তাকে মেরেই ফেললাম। আমি তাকে কোনো দয়া দেখাই নি। তার জন্য আমার কোনো খেদও নেই।

'জনহিতের জন্য আমি এমন করেছিলাম। সমাজের মঙ্গলের জন্য আপনারও উচিত ছিল দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন এবং কর্ণ এই চারজনকে কারারুদ্ধ করে এদের পাণ্ডবদের হাতে তুলে দিতেন। জ্ঞানীরা বলে থাকেন যে আত্মীয়স্বজনের জন্য ব্যক্তিকে, গ্রামের জন্য আত্মীয়কুটুম্বকে, সমাজের জন্য

গ্রামকে এবং আত্মকল্যাণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করা উচিত। ক্ষত্রিয়দের বাঁচাবার একমাত্র উপায় হল এই দুষ্টদের নিয়ন্ত্রণে রাখা। আমার কথা মেনে এখন আপনি এই পথে চলুন।'

ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের এই তীক্ষ্ম বাক্যবাণ শুনে ভীতচকিত হয়ে উঠলেন। তিনি বিদুরকে বলতে লাগলেনঃ 'বিদুর! একটু গান্ধারীকেও ডাকো। আমরা দুজনে মিলে আবার কিছু চেষ্টা করে দেখি। যদি আমরা সাফল্য লাভ করি, তা হলে এই ভয় থেকে সবাই রক্ষা পেয়ে যাবে। গান্ধারী বুদ্ধিমতী, হয় তো দুর্যোধনের উপর তার কিছু প্রভাব পড়তেও পারে।'

গান্ধারী যখন এলেন তখন ধৃতরাষ্ট্র বললেনঃ 'গান্ধারী! তোমার ছেলে পাপের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। সে বড়দের বা বুড়োদের কারুর কথা শুনছে না। আমাদের সকলের মাথার উপর এ এক মহাবিপত্তি এসে পড়েছে। তুমি দুর্যোধনকে বুঝিয়ে তাকে ঠিক রাস্তায় নিয়ে এসো।'

গান্ধারী বিদুরকে বলে আবার দুর্যোধনকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজের স্বামীকে বললেনঃ 'মহারাজ! অতি লোভী রাজা রাজ্যের অধিকারী হতে পারে না। দুর্যোধনের বড় হবার ইচ্ছা সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু দুর্যোধনের চেয়ে আপনার দোষ কিছু বেশি। নিজের ছেলের মোহপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আপনি ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে বসেছেন। জেনেশুনে আপনি নিজের ছেলের পাপকে সমর্থন করেছেন। এখন আর তার উপর ফের আপনার আধিপত্য বা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়া দুষ্কর।

'আমার সম্মতির বিরুদ্ধে আপনি তাকে রাজা করেছেন। এখন আপনি আপনার স্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করছেন। আপনি দুর্যোধনের পক্ষ নিয়েছেন আর পান্ডবদের সঙ্গে অন্যায় ও দুর্ব্যবহার করেছেন, যা যে-কোনো ধার্মিক রাজার পক্ষে একান্ত অযোগ্য কাজ। এখন এই কর্মের ফল আপনাকে ভুগতে হবে।'

এরই মধ্যে দুর্যোধন ফের এসে রাজসভায় প্রবেশ করল। কিন্তু তার চোখ যেন আগুনের ভাটার মত জ্বলছিল। তা সত্ত্বেও গান্ধারী তাকে আদর করে বললেনঃ 'বাছা! আমার কথা শোনো। এই কুরুরাজ্যের সম্রাট হবার মত যোগ্যতা তোমার থাকা চাই। যে-মানুষের ভিতর লোভ, দ্বেষ, অহংকার এবং দম্ভ আছে সে রাজ্যের অধিকারী হতে পারে না। যার ইন্দ্রিয়রা নিজের বশে নেই, সে রাজ্যের অধিকারী নয়। এই দৃষ্টান্তে তুমি এই রাজ্যের যোগ্য নও, কেননা তুমি যদি ইন্দ্রিয়দেরই না জয় করে থাকো, তা হলে শত্রুদের আর কেমন করে জিতবে?

'তোমার এই সব দুর্বলতাই তোমার সব চেয়ে বড় শত্রু। এদের নিয়ন্ত্রণ করো, তা হলেই তুমি শত্রুদেরও দমন করতে পারবে। তুমি একটু আমার কাছে বসে শোনো, আমি তোমার সবচেয়ে হিতাকাংক্ষী। তোমার উপর আমার অত্যন্ত স্নেহ, তাই আমি তোমাকে রক্ষা করতে চাই। আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি। যখন তুমি জন্মেছিলে নানা দুর্লক্ষণ দেখা দিয়েছিল কিন্তু আমি সে-সব গ্রাহ্য করিনি, কেননা আমার বিশ্বাস ছিল আমার ছেলে কখনো পাপের অনুসরণ করতেই পারে না। এখন তুমি পাপাচরণ করে সমস্ত বংশের উপর ভয়ঙ্কর বিপত্তি ডেকে আনছ, সেই জন্য এই পথ পরিহার করো, এ পথ থেকে সরে দাঁড়াও।

'কৃষ্ণ এবং অর্জুন এ'রা দুজন নর এবং নারায়ণের অবতার। ওঁদের সঙ্গে শত্রুতা কোরো না। ওঁদের উপর তুমি বিজয় লাভ করতে পারবে না। ধর্ম যেখানে বিজয়ও সেখানে। ধর্ম তোমার পক্ষে নেই, এই জন্য জয় কৃষ্ণ এবং অর্জুনেরই হবে, তোমার নয়। এ'দের হাতেই তোমার সর্বনাশ হবে। এই জন্য আমার কথা শোনো এবং পাপ থেকে দূরে সরে যাও।'

ধৃতরাষ্ট্রও আবার গান্ধারীকে সমর্থন করলেন কিন্তু দুর্যোধন তো রাগের চোটে অগ্নিশর্মা হয়েই ছিল, তাই সে মুখ ঘুরিয়ে নিল এবং রাজসভা থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

রাজসভা থেকে বেরিয়ে দুর্যোধন সোজা কর্ণ, শকুনি এবং দুঃশাসনের কাছে গেল এবং তাদের বলল: 'দেখো, এখন আমার মাকে রাজসভায় ডেকে আমার উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। আমি এই সব চালবাজিতে তিক্তবিরক্ত হয়ে গিয়েছি। সময় এসে গিয়েছে এখন আমি এই সব 'হিতাকাংক্ষী' এবং তাদের 'সুপরামর্শ'কে শেষই করে ফেলি। এরা সবাই স্থির করে ফেলেছে আমাদের চারজনকে বেঁধে বন্দী করে যুধিষ্ঠিরের হাতে সঁপে দেওয়া যাক। বাবাও এই পরামর্শ মেনে নিয়েছেন। এ সবই কৃষ্ণের পরিকল্পনা। তারই এ সমস্ত ফন্দী চালবাজি। তা হলে আমরা কেন কৃষ্ণকেই না বন্দী করে ফেলি? সমস্ত ঝগড়ার মূল তো সে-ই কৃষ্ণই, এজন্য আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কৃষ্ণকেই বেঁধে ফেলা দরকার।'

ভগবানের বিশ্বরূপ

এই সমগ্র ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা সাত্যকি টের পেয়ে গেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কৃতবর্মাকে গিয়ে বললেনঃ 'শোনো, তোমার বন্ধু এবং তাঁর বন্ধু কৃষ্ণকে বন্ধন নিক্ষেপ করার কথা ভাবছেন। তুমি তাড়াতাড়ি নিজের সৈন্যকে একত্রিত করো। আমি সব কথা কৃষ্ণকে বলবার জন্য যাচ্ছি।' সাত্যকি দৌড়ে রাজসভায় গেলেন এবং কৃষ্ণকে সব খবর শোনালেন। ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুরও এই সব মতলবের কথা তার কাছ থেকে শুনলেন। সাত্যকি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেনঃ 'তোমার ছেলের বুদ্ধি একবার দেখো, সে রেশমি কাপড় দিয়ে আগুনকে বাঁধতে চাইছে।'

বিদুর তো শুনে স্তব্ধই হয়ে গেলেন। সকলের বিনাশ যেন তিনি স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখলেন। কিন্তু এর কোনো প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া কৃষ্ণের উপর হতে দেখা গেল না। তিনি তাঁদের সবাইকে শান্ত করলেন এবং বলতে লাগলেনঃ 'তোমরা কেন এত ভয়ে কাতর হচ্ছ? আমাকে বন্ধনে ফেলা অত সহজ কাজ নয়।' আবার তিনি ধৃতরাষ্ট্রের দিকে ফিরে বললেনঃ 'ধৃতরাষ্ট্র! তোমার ছেলেদের পাপের কলসী ভরে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে. এবার ভাঙল বলে।'

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আবার দুর্যোধনকে ডেকে বললেনঃ 'তুমি পাপে তো ডুবে আছই কিন্তু তুমি যে এত দূর যেতে পারো, তা আমি ভাবতে পারিনি। তুমি এ কী বোকামির কাজ করতে চলেছ? কৃষ্ণ একজন মহান্ পুরুষ। তাঁর কেউ ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। দেবতাদেরও সে-শক্তি নেই যে কৃষ্ণকে বন্ধনে বিগাড়িত করেন। তুমি সূর্যকে ধরতে পারো, পৃথিবীকে তুলে ফেলে দিতে পারো, বায়ুকেও বাঁধতে পারো কিন্তু কৃষ্ণকে ধরতে পারবে না।'

কৃষ্ণ দুর্যোধনকে হেসে বললেনঃ 'মূর্খ! তুমি মনে করেছ আমি একলা আছি। তোমার উপর আমার দয়াই হচ্ছে। একটু নজর দিয়ে দেখ কী হচ্ছে।' এই বলতে বলতেই রাজসভা ভীড়ে ভরে উঠল। লোকেরা দেখল, ভীড়ে পাণ্ডব, অন্ধক, বৃষ্ণি, দ্বাদশ মারুৎ, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু সবাই উপস্থিত।

কৃষ্ণ আমার অট্টহাস্য করে উঠলেন। তাঁর মুখের উপর এক অদ্ভুত শান্তি এবং তেজ বিছিয়ে ছিল। দেহ থেকে এক জ্যোতি যেন ঠিকরে পড়ছিল। কৃষ্ণের দেহ এক অদ্ভুত রূপ ধারণ করল। তাঁর ললাটে ব্রহ্মা সমাসীন, দেখা গেল। বক্ষঃস্থলে একাদশ রুদ্র বিরাজমান লক্ষ্য করা গেল। কাঁধের উপর ইন্দ্র, বরুণ, কুবের এবং যমকে দেখা যেতে লাগল। আদিত্য, বসু, অশ্বিনী-কুমার সবাইকে কৃষ্ণের দেহে প্রকটরূপে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। বাঁদিকে সব যোদ্ধারা পাণ্ডবের পক্ষে বসে আছেন দেখা গেল। বাঁদিক থেকে বলরামও বেরিয়ে আসছেন লক্ষ্য করা গেল। ডান দিকে গাণ্ডীব হস্তে অর্জুন দৃষ্টি-গোচর হলেন। ভীম, নকুল, সহদেব এবং যুধিষ্ঠিরও অর্জুনের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন, লক্ষ্য করা গেল। বৃষ্ণিবংশীয় আরও অনেক যোদ্ধা অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে পাণ্ডবদের পক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন, লক্ষ্য কবা গেল। কৃষ্ণের হাজারও হাত দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। কৃষ্ণের হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মও ছিল।

কৃষ্ণের দুই চোখ এবং নাক থেকে যেন আগুনের শিখা বেরিয়ে আসছিল, নজরে পড়ল। মনে হচ্ছিল রূপহীন মৃত্যু যেন আজ এক ভীষণ রূপ ধারণ করে সভার মাঝখানে উপস্থিত হয়ে এই রূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কৃষ্ণের তেজ আর ভীষণ রূপ দেখে সভার সব লোকেরা চোখ বন্ধ কবে ফেলল। সকলেরই চোখ বন্ধ ছিল, শুধু ভীষ্ম, দ্রোণ এবং উপস্থিত ঋষিবৃন্দের চোখ খোলা ছিল, মনে হচ্ছিল যেন দুই চোখ দিয়ে তাঁরা সব এই অদ্ভুত বিশ্বরূপকে পান করছিলেন। ঈশ্বর এঁদের সবাইকে বিশ্বরূপ দর্শন করার শক্তি দিয়ে রেখেছিলেন। সেইজন্য এঁদের চোখ খোলা ছিল।

ইতিমধ্যে আর এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। ধৃতরাষ্ট্র তো অন্ধ ছিলেন কিন্তু ভগবান তাঁকেও বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য চোখ দিয়ে দিলেন। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতেই তিনি নির্নিমেষ নয়নে এই বিশ্বরূপ দেখতেই থাকলেন। দেখেও তাঁর যেন কিছুতেই তৃপ্তি হচ্ছিল না এবং বারবার সেই বিশ্বরূপ ভগবানের দর্শন করতেই থাকলেন।

চারদিকে দিব্য সঙ্গীত শোনা যাচ্ছিল। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। ধৃতরাষ্ট্রের দুই চোখে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি বললেনঃ

'কৃষ্ণ! এই বিশ্বের তুমিই স্বামী। আমার কী ভাগ্য যে আমি তোমার এই রূপ দর্শন করতে পারলাম। আমার এখন আর কিছু চাই না। আমি দেখে নিয়েছি। এবার আমার চোখ ফেরৎ নিয়ে নাও। আমি কৃতার্থ হয়ে গিয়েছি।'

এর পরে বিরাট কোলাহলের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী কেঁপে উঠল। ভূমিকম্প দেখা দিল। সমুদ্র এবং নদীর জল সব শুকিয়ে গেল। লোকেরা ভয়গ্রস্ত হয়ে উঠল। কৃষ্ণ সব লোকের এই ত্রাস দেখে আবার নিজের সৌম্য রূপ ধারণ করলেন।

এবার কৃষ্ণ সকলের কাছে বিদায় চাইলেন। সব সভাসদগণ তাঁকে রথ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এগিয়ে এলেন কিন্তু তিনি কারুর সঙ্গে একটি কথাও বললেন না। কৃষ্ণের চোখে খেদ ছিল। যাবার সময় ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণকে বললেনঃ 'কৃষ্ণ! তুমি তো দেখে নিলে সব। আমি নিতান্ত অসহায়। আমার উপর রাগ কোরো না। পাণ্ডবদের প্রতি আমার কোনো দ্বেষ নেই। কিন্তু আমার হাতে কিছু নেই।'

এই শুনে কৃষ্ণ রথে চড়তে চড়তে বললেনঃ 'সভাসদবৃন্দ! বয়োবৃদ্ধগণ! আপনারা সবাই দেখলেন যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম যাতে শান্তি স্থাপিত হয়, যুদ্ধ না হয়। আপনারা এ-ও দেখলেন যে দুর্যোধন অভিমান এবং অহঙ্কারের বশীভূত হয়ে আমার সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করতে চাইছিল। এখন আমি দুর্যোধনের মূর্খতা এবং তার অহঙ্কারের দরুণ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাচ্ছি। যেটুকু চেষ্টা করতে পারতাম, তা সবই করেছি। এখন যেন কেউ আর না বলে যে কৃষ্ণ শান্তি-স্থাপনের জন্য কোনো চেষ্টাই করেনি। আমার খেদ বা দুঃখ আছে কিন্তু সেই সঙ্গে এইটুকু সন্তোষ বা পরিতৃপ্তিও আছে যে আমি চেষ্টা তো করেছি।'

এর পর বিদুরের গৃহে গিয়ে কৃষ্ণ কুন্তীকে প্রণাম করলেন এবং বললেনঃ 'পিসি! পাণ্ডবদের গিয়ে কি বলব?' কুন্তী বললেনঃ "আমি নিজের ছেলেদের দেখবার জন্য বড় উৎসুক আছি কিন্তু তাদের বোলোঃ 'তোমরা ক্ষত্রিয়, কুন্তীর ছেলে। যখন তোমরা জন্মেছিলে, দেবতারা তোমাদের আশীর্বাদ দিয়েছিলেন। অতএব, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করো।' দ্রৌপদীকে বোলোঃ 'তোমার মত পুত্রবধূ পেয়েছি, এ আমার সৌভাগ্য। আমি তোমার উপর খুশি। কৃষ্ণ তোমাদের সকলের রক্ষক হয়ে আছেন, এজন্য তোমাদের জন্য আমার কোনো চিন্তা নেই, তোমাদের মঙ্গল হোক।'"

কৃষ্ণ চলে যাবার পর ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুর আবার দুর্যোধনকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু তার এতটুকুও হেরফের হল না। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি হতেই থাকল।

মহাভারতে কৃষ্ণের বিভিন্ন কর্মাবলীর যে বর্ণনা আছে—এবং সারা মহাভারতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এইরকম কত না চিত্রে পরিপূর্ণ—তার মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত প্রসঙ্গ হল এই শ্রীকৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরের পক্ষ থেকে শান্তির দূত হয়ে দুর্যোধনের সভায় যাওয়া। যে কার্যকুশলতা এবং দক্ষতার সঙ্গে দুর্যোধনের রাজসভায় কৃষ্ণ ব্যবহার করলেন, যেরকম ভাবে ন্যায়, ধর্ম, নীতি, ব্যবহার সব কিছুকে সামনে রেখে তিনি শান্তির জন্য প্রয়াস করলেন, তা এতই অদ্ভুত যে বর্তমান কালের কূটনীতিজ্ঞরাও, রাজনীতিবিশারদও তা থেকে অনেক কিছু শিখবার প্রচুর উপাদান বা মালমশলা পেয়ে যান।

পাণ্ডবদের প্রতি কৃষ্ণের পক্ষপাত ছিল। দুর্যোধনের সঙ্গে কৃষ্ণের সদ্‌ভাব ছিল না। এ সব সত্ত্বেও কৃষ্ণ নিজের অন্তরের উদারতা দেখিয়ে দুর্যোধন এবং তার সঙ্গীদের বিনাশের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য হস্তিনাপুর গেলেন এবং শান্তির জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করলেন। সভায় কৃষ্ণ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে না ছিল কোনো খোশামুদি, না ছিল কোনো রাগ।

কৃষ্ণ দুর্যোধনের আতিথ্য গ্রহণ করেন নি কিন্তু যখন এ নিয়ে অনেক কথা উঠল, প্রশ্নোত্তর চলতে লাগল তখন পরিষ্কার খোলাখুলি বলে দিলেন যে যতক্ষণ আমার কাজ সমাধা না হচ্ছে, ততক্ষণ তোমার অন্ন গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একটিও রুক্ষ শব্দকে কৃষ্ণ মোলায়েম করেন নি বা মিষ্টি দিয়ে মুড়ে দেন নি।

কৃষ্ণ জানতেন যে দুর্যোধন তাঁর শারীরিক ক্ষতি করারও চেষ্টা করতে পারে তবু তিনি নির্ভয় হয়ে সাহস এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেই বিপদের সম্মুখীন হলেন। কড়া কড়া কথা কাউকে শোনাতেও কৃষ্ণ কোনো কসুর করেন নি, তা সে ধৃতরাষ্ট্রই হোন বা ভীষ্ম বা দ্রোণ অথবা দুর্যোধন যে-ই হোন। এই ধরণের অদ্ভুত আচরণ কেবল এক বিরাট বুদ্ধিমান এবং তেজস্বী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

এই অদ্বিতীয় প্রসঙ্গ থেকে কৃষ্ণের গভীর জ্ঞান, কার্যকুশলতা, তাঁর সাহস, ধর্মবোধ এবং কুশাগ্র ক্ষুরধার বুদ্ধি এ সমস্তই একত্র প্রকাশিত হয়ে যেন সূর্যের মত উদ্ভাসিত করে তুলেছে চতুর্দিক। বিফল হয়েও তার সারা বোঝা বা দায়িত্ব কৌরবদের মাথার উপর চাপিয়ে তিনি এই দেখিয়ে দিলেন যে পাণ্ডবরা শান্তি চায়, দুর্যোধন হিংসা বা যুদ্ধ চান।

যখন কৃষ্ণকে বন্ধনে ফেলবার ষড়যন্ত্র করা হল, তখন তার কিছু মাত্র প্রভাব পড়ল না শ্রীকৃষ্ণের উপর। তিনি শুধু মৃদু হেসে সাত্যকিকে বললেনঃ 'ভয় পাচ্ছ কেন? আমাকে বাঁধা ছেলেখেলা নয়, কেন না আমি একলা নই'।

যখন কৃষ্ণ বললেন, 'আমি একলা নই' তখন তার তাৎপর্য এই ছিল যে

কৃষ্ণের দিকে কেবল শারীরিক বলই ছিল তা নয়, এক বিরাট নৈতিক বলও ছিল।' 'ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্', এক ব্রহ্মতেজ ছিল। সেই তেজেই কৃষ্ণ সভার মধ্যে এমন বিশ্বরূপ দেখালেন যে সেই রূপ প্রদীপ্ত হয়ে সমস্ত সভাকে উদ্ভাসিত করে দিল। সেই বিশ্বরূপ সমস্ত মরুদ্‌গণ, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র এবং সব পাণ্ডবরাও কৃষ্ণের দেহেই উজ্জ্বলরূপে দাঁড়িয়ে আছেন দেখা গেল।

লোকেরা সেই দৃশ্যকে স্থূল চক্ষু দিয়েই দেখে থাকুক বা মনের চক্ষু দিয়েই দেখে থাকুক, তা অপ্রাসঙ্গিক। আসল জিনিস যোট তা হল এই যে, ঐ বিশ্বরূপ দর্শনের ফলে বিপক্ষদলের মধ্যে আতঙ্ক ছেয়ে গেল আর বন্ধুদের মধ্যে ভরসা জেগে উঠল।

এই নিগূঢ় ব্যাপারটি অধ্যাত্ম দৃষ্টিতেই পর্যালোচনা করা উচিত, কেন না এই সম্পূর্ণ বিবরণের মধ্যে একটিই সার কথা আছে, একটিই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং তা হল এই যে, শারীরিক বল বা বাহুবলের চেয়ে নৈতিক এবং ধার্মিক বল লক্ষগুণ বেশি প্রবল। এই হচ্ছে এর সার, এই হচ্ছে এর তাৎপর্য।

শুধু এর শাব্দিক অর্থ নয় কিন্তু এর ব্যাপক মর্মার্থও বোঝা দরকার। সেই বিশ্বরূপ সবাই দেখতে পেলেন না, কেন না সবাই যেন ধাঁধিয়ে গেলেন অর্থাৎ যারা হতবুদ্ধি ছিল তারা চিন্তা করার শক্তিই হারিয়ে বসেছিল, সেই জন্য সেই বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারত না অর্থাৎ তার তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম ছিল না।

ভীষ্ম, দ্রোণ এবং অন্যান্য ঋষিগণ যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং যাঁদের মধ্যে বিবেক-বিচার ছিল, তাঁরা প্রজ্ঞাচক্ষুর সাহায্যে সেই বিশ্বরূপের দর্শন করতে সক্ষম হলেন। ধৃতরাষ্ট্রকেও ভগবান এই জ্ঞান চক্ষু দান করেছিলেন। তারই শক্তিতে সে-ও সেই রূপ দর্শন করতে পারল। কিন্তু সেই দৃশ্য তার কাছে এমন ভীতিপ্রদ মনে হল যে সে বললঃ 'ভগবন্! তোমার এই দিব্য দর্শন শক্তি ফেরৎ নিয়ে নাও। আমি কৃতকৃত্য, কৃতার্থ হয়েছি, আর আমার কিছু চাই না।'

এই হল এই সমগ্র কাহিনীর রহস্য, শাব্দিক বা আক্ষরিক অর্থ কিছুই নয়।

এ যুদ্ধ হচ্ছে এক যজ্ঞ

এরই মধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটল, যা কর্ণের আসল স্বরূপকে উদ্ঘাটন করে দেয়। দুর্যোধনের দলে সামিল হওয়ার দরুণ মহাভারতে কর্ণের এত বদনাম হয়ে গিয়েছে যে সধারণ পাঠকও তাকে দুঃশাসন বা শকুনির মত একজন দুষ্ট ও ধূর্ত লোক বলেই মনে করে। কিন্তু ব্যাসদেব এরকম কোনো পক্ষপাত দেখিয়ে কর্ণের প্রতি অন্যায় করেন নি। তিনি কর্ণের আসল রূপ দেখিয়ে এ-ও বলে দিয়েছেন যে যদিও সে দুর্যোধনের পক্ষে ছিল, কথা-বার্তাতেও অনেক সময় অসহিষ্ণুতা দেখিয়েছে, কিন্তু আসলে সে ছিল একজন মহাপুরুষ। ধর্ম এবং উদারতায় তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। কেবল দুর্যোধনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছাড়া তার মধ্যে আর কোনো দুর্গুণ বা দোষ ছিল না।

ঘটনাটা এইভাবে ঘটল। দুর্যোধনের সভা থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণ যখন উপপ্লব্যের দিকে রওনা হলেন, তখন তিনি কর্ণকে নিজের রথে বসিয়ে নিলেন এবং সাত্যকিকেও সঙ্গে নিলেন। নির্ঝঞ্ঝাটে বিনা দ্বিধায় কর্ণও কৃষ্ণের সঙ্গে রথের উপর বসে গেলেন। এ-ও কর্ণের মহানুভবতার দ্যোতক।

কৃষ্ণ রথ হাঁকিয়ে এক নির্জন জায়গায় গিয়ে দাঁড় করালেন। সেখানে রথ থেকে নেমে, সাত্যকিকে রথেরই উপর বসিয়ে রেখে, নিজে কর্ণের হাত ধরে কিছু দূরে হেঁটে চলে গেলেন দুজনে। সেখানে একান্তে বসে হঠাৎ কৃষ্ণ কথাবার্তা সুরু করলেন এই বলেঃ 'কর্ণ! তুমি হচ্ছ একজন সজ্জন পুরুষ। সত্য-ধর্মে তোমার পুরোপুরি আস্থা আছে, তা হলে তুমি কি বলে পাপী দুর্যোধনকে সহায়তা দিচ্ছ?

'বেদ-বেদাঙ্গ তুমি পড়েছ, শাস্ত্রের পঠন-পাঠন করে তুমি ধর্মের তত্ত্ব জেনেছ, তা হলে এই পাপকর্মে তুমি দুর্যোধনের সঙ্গী কি করে হচ্ছ?'

কর্ণ মৃদু হেসে কৃষ্ণকে বললেনঃ 'কৃষ্ণ! তুমি ঠিকই বলছ। ধর্মাত্মা লোকের কখনো পাপের শরিক হওয়া উচিত নয়, কিন্তু আমার অবস্থা একটু আলাদা। দুর্যোধনের প্রতি আমার পক্ষপাত এত প্রবল যে আমি তার দোষের দিকে নজরই দিই না। সে আমার পরম বন্ধু। লোকে যখন আমাকে সূত-পুত্র বলে গঞ্জনা করত, কেউ আমাকে সমাদর করত না, সেই সময় দুর্যোধনই ছিল একমাত্র লোক যে এই খারাপ ধারণা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছিল। আমি তোমাকে সারা ঘটনাই শোনাচ্ছি, শোনো।

'অনেক কাল আগে আমি পেটের দায়ে হস্তিনাপুরে এসেছিলাম। পাণ্ডব-পুত্রগণ দ্রোণের শিক্ষকতায় শস্ত্রবিদ্যা তখন শেষ করেছে। আমি সূতপুত্র বলে দ্রোণ আমাকে ধনুর্বিদ্যা শেখাতে অস্বীকার করলেন। পরে আমি ভার্গবের অর্থাৎ পরশুরামের কাছে এই বিদ্যা শিক্ষা করি। কিন্তু ভার্গব যখন জানতে পারলেন যে আমি সূতপুত্র, তখন তিনি আমাকে শাপ দিলেন। যা হোক, আমি যখন এলাম, সে-সময় শিক্ষা সমাপ্ত করে সব পাণ্ডবরা রঙ্গমঞ্চে নিজের নিজের কলা-কৌশল দেখাবার আয়োজন করছিলেন। আমার তার সঙ্গে কোনো লেন-দেনের সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু অর্জুনের অহঙ্কার দেখে তাকে প্রতিস্পর্ধা জানাবার জন্য আমার মনে এক ভাবের তরঙ্গ জেগে উঠল, যা আমি সামলাতে পারলাম না। আমি অর্জুনকে 'চ্যালেঞ্জ' বা আহ্বান তো করলাম কিন্তু আমি সূতপুত্র বলে সে আমার সেই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। এইভাবে আমার আবারও গঞ্জনা, অবমাননা ঘটল। আমার অত্যন্ত কষ্ট হল।

'এই পরিস্থিতিতে দুর্যোধনই একমাত্র এমন একজন লোক ছিল যে আমার পক্ষ নিয়ে আমাকে অঙ্গদেশের রাজা করে দিল। এখন অনেক কাল কেটে গিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি সে-উপকার ভুলতে পারি না। এ সংসারে আমার দুজনই হিতৈষী বা শুভার্থী আছেন। এক তো আমার মা রাধা আর দ্বিতীয় হল দুর্যোধন। আমাব এ জীবনের উপর কোনো মোহ নেই অর্থাৎ মমতা নেই। কোনো রস নেই অর্থাৎ আসক্তিও নেই। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত বেঁচে আছি, ততদিন পর্যন্ত আমার জীবন রাধা এবং দুর্যোধন, এই দুজনেরই হাতে আছে।'

কর্ণের এই উক্তি শুনে কৃষ্ণ একক্ষণের জন্য মৌন হয়ে রইলেন, তারপর বললেনঃ 'ঠিক আছে, কর্ণ! উপকারের ঋণ শোধ করা বড় কঠিন কাজ। কিন্তু তোমার জন্ম সম্বন্ধে তোমার নিজের কোনো ধারণা আছে? তুমি নিজের মাকে জানো?' কর্ণ মাথা নেড়ে বললঃ 'বিশেষ জানিনা, তবে আমার অনুমান যে আমি কোনো ভাল বংশের প্রতিষ্ঠিত কুলের কুলবতী





কুমারীর পুত্র। সম্ভবত সে কোনো বড় প্রাসাদে থাকত। হয়তো তার সেই বাড়ী নদীর ধারেই ছিল। সম্ভবত সেই কুমারীর নবজাত শিশুর চেয়ে তুলনায় নিজের প্রতিষ্ঠা, মান-মর্যাদার উপরই বেশি খেয়াল বা নজর ছিল। জন্ম হবার সঙ্গে সঙ্গে তাই সে আমাকে একটি বাক্সে পুরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল, এইরকমই মনে হয়।

'রাধা সেই বাক্সটি তুলে নিয়ে আমাকে বার করে এবং আমার পালনপোষণ করে। আমার আসল মা কখনও আমার কথা ভাবেনও নি, চিন্তাও করেন নি। এইজন্য তিনি কে, তা জানবার জন্য আমি উৎসুক নই। তিনি আমাকে ভুলেই গিয়েছেন। আমার এখন তা জেনেই বা আর কি লাভ হবে?' কর্ণ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর আবার বললেনঃ 'কৃষ্ণ! এই ঘটনার জন্য আমার মনে কোনো দুঃখ নেই। আমার এখনকার মা রাধাই আজ আমার সর্বস্ব। তাকেই আমি আপন বলে জেনেছি এবং সে-ও তাই। আমার অতীত এখন কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। আমি তা ভুলেও গিয়েছি। আমার এখন আর এ বিষয়ে বেশি কিছু বলার দরকারই বা কি?'

কৃষ্ণের আকৃতি প্রসন্ন ও প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। তিনি বড় স্নেহ ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে কর্ণের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কৃষ্ণের চোখে তখন জল। তাঁর কথাও বড় মৃদু ও কোমল, বললেনঃ 'কর্ণ! এ সবই সত্য। তোমার মা এক কুলীন বংশেরই রাজকন্যা। তোমার জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে লোকনিন্দার ভয়ে সে তোমাকে বাধ্য হয়ে ত্যাগ করেছিল বটে কিন্তু তোমাকে ভুলতে সে পারে নি। বর্তমানে তার একেরও বেশি পুত্র আছে, তবুও সে তোমার কথা কেবলই ভাবে। তার হৃদয়ে বড় বেদনা, মনে বড় ব্যথা।'

কর্ণ এ কথা শুনে আশ্চর্য ও বিস্মিত হল। বললঃ 'কৃষ্ণ! তা হলে এর মানে যে আমি সূতপুত্র নই, বরং আমি ক্ষত্রিয়—এ কথা কি সত্য? তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন তুমি আমার মাকে জানো। তা হলে তিনি কি বেঁচে আছেন? আমি কি তাঁর দেখা পেতে পারি? আমাকে সব কথা খুলে বলো। আমি বড় উৎসুক হয়ে আছি। আমাকে এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখো না।'

কৃষ্ণ কর্ণের হাতটি ধরে বললেনঃ 'কর্ণ! একটু সুস্থির হয়ে বোসো। বাস্তব সত্য শুনবার জন্য প্রস্তুত হও। তোমার মার পাঁচটি ছেলে। তারা এমন বীর যে তাদের সমকক্ষ পৃথিবীতে কোথাও কেউ নেই।' কর্ণের ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল, বললেনঃ 'পাঁচ ছেলে আর খুব বীর? তা হলে তারা কি পাণ্ডব?' কর্ণের সারা শরীর ভাবনায় ও উদ্বেগে কাঁপছিল। কৃষ্ণ ধৈর্যের সঙ্গে বললেনঃ 'হ্যাঁ, কর্ণ, ঐ পঞ্চ পাণ্ডব তোমারই ভাই। কুন্তীই

তোমার মা। তুমি হচ্ছ সবচেয়ে বড়, জ্যেষ্ঠ পুত্র। তোমার জন্ম কুন্তীর গর্ভ থেকেই হয়েছে, তখন তিনি অবিবাহিত ছিলেন।' 'কৃষ্ণ! তা হলে আমার বাবা কে?' কৃষ্ণ বললেনঃ 'যে-দেবতার তুমি রোজ পুজো করো এবং যিনি তোমার ইষ্টদেব, সে-ই সূর্যই তোমার পিতা।' কর্ণ এই শুনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

খানিকক্ষণ কাটবার পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। তিনি বিগলিত হৃদয়ে বলতে লাগলেনঃ 'কৃষ্ণ! আমি বড় হতভাগ্য। সূর্য আমার পিতা, কুন্তী আমার মাতা, পাণ্ডবদের মধ্যে ধর্মের প্রতিমূর্তি যুধিষ্ঠির, প্রচণ্ড বলশালী ভীম, বিশিষ্ট বীর অর্জুন, সুন্দর নকুল, বুদ্ধিমান সহদেব এই পাঁচজনই আমার ভাই। তা সত্ত্বেও আমি এতকাল সূতপুত্র বলেই পরিচিত হয়ে রইলাম। ভার্গবের তো অন্তত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এটা জানা উচিত ছিল।' তার দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকল। কৃষ্ণ এবং কর্ণ দুজনেই কিছুক্ষণ মৌন হয়ে বসে থাকলেন, আবার কর্ণ চোখ মুছে বলতে লাগলেনঃ 'কৃষ্ণ! তুমি তো এ ব্যাপারটা জানতে। এতদিন একে লুকিয়ে রেখেছিলে, তা হলে আজ আবার কেন সব খুলে বলতে গেলে? আমার কাছে তো না-জানাটাই, অজ্ঞানই সুখের ছিল। আমি কত বছর ধরে আমার মায়ের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছি, এখন তুমি সব বললে। কিন্তু কেন বললে? এতদিন পাণ্ডব-দের সঙ্গে শত্রুতা করতে আমার আনন্দ হত। কিন্তু এখন এই সারা ব্যাপারটা জেনে আমার মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি।'

কৃষ্ণের হৃদয়েও দয়া উথলে উঠছিল। তিনি বললেনঃ 'কর্ণ! আমি তোমাকে মৃত্যু-মুখ থেকে বাঁচাতে চাইছিলাম। তুমি হচ্ছ ধর্মের জ্ঞাতা। কুমারী কন্যার সন্তান বিবাহের পর তার স্বামীরই সন্তান বলে গণ্য হয়ে থাকে। এই যুক্তিতে তুমি পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ সন্তান। তুমি নিজেও তাই পাণ্ডব। তুমি বৃষ্ণিবংশেরও পরিবারভুক্ত। এবার তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমরা দুজনে যুধিষ্ঠিরের কাছে যাই। তোমার সব ভাইরা তোমার পায়ে পড়বে। তোমাকে রাজ্য-সিংহাসনের উপর বসিয়ে তোমার পুজো করবে। তুমি হবে রাজা, যুধিষ্ঠির হবে যুবরাজ। পঞ্চ পাণ্ডবই তোমার দাস হয়ে তোমার আজ্ঞা পালন করবে। প্রিয় কর্ণ! তুমি বীর, ধার্মিক, তোমার দুর্দিন এবার শেষ হতে চলেছে। আমার সঙ্গে চলো এবং সংসারের আধিপত্য গ্রহণ করো। পাঁচ ভাই এবং তোমার মা সকলেরই তোমাকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ ও সুখ লাভ হবে। এসো, আমরা যাই।'

কর্ণ সব শুনলেন। কিন্তু তাঁর মন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। বললেনঃ 'কৃষ্ণ! তুমি ভালবেসে আমায় সব শোনালে। আমি হচ্ছি পাণ্ডব, কুন্তীর ছেলে,

সূর্যের পুত্র কিন্তু আমার মা তো ত্যাগই করেছেন আমাকে। আমাকে জীবন দান করেছে এবং পালন-পোষণ করেছে রাধাই। অধিরথকেই আমি পিতা বলে মেনেছি। এখন এই সম্বন্ধ ছিন্ন করা আমার পক্ষে একান্ত দুষ্কর। দুর্যোধনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমি তার পক্ষ নিয়ে অর্জুনের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত লড়ব। সে-প্রতিজ্ঞাকে আমি কেমন করে ভুলব? তুমি আমার উপর অত্যন্ত স্নেহ দেখিয়েছ। কিন্তু আমি লোভে পড়ব না। যদি আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি, তা হলে আমার যশ সুনাম সবই শেষ হয়ে যাবে। পাণ্ডবদের মাথার উপর তোমার হাত আছে, তাই বিজয় তাদেরই সুনিশ্চিত। আমার মৃত্যুও অবধারিত। কিন্তু তাতে আমার কীর্তি বৃদ্ধি হবে। সারা জীবনই আমি হতভাগ্য হয়েই কাটিয়েছি। এখন আমার একটিই আকাংক্ষা যে আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে যেন মরি। এই অভিলাষ যেন পূর্ণ হয়, তোমার কাছে আমি এই আশীর্বাদ চাই। অর্জুন আমার অনুজ, ছোট ভাই এই জেনে আমি কি করে প্রাণ খুলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করব? কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধ তো আমি করবই।

'তবে এই আমার জন্ম-রহস্যের কথা খুলে বলে দিয়ে তুমি আমার উৎসাহকে কমিয়ে দিলে। তুমি আমাকে রহস্যের কথা কেন বলতে গেলে?'

কৃষ্ণর ডান হাতখানি ধরে কর্ণ এর পর বলল: 'কৃষ্ণ। তুমি আমাকে কথা দাও যে তুমি এই রহস্য এখন নিজের মধ্যেই ধরে রাখবে, বাইরে আর কাউকে বলবে না। যদি ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির এটা জেনে যায় যে আমি তার বড় ভাই, তা হলে সে কোনো অবস্থাতেই রাজ্য গ্রহণ করবে না। সে ধার্মিক, রাজা তো সেই যুধিষ্ঠিরই হবে। তুমি হচ্ছ তার সহায়ক। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব সবাই বীর। অতএব যুধিষ্ঠিরের বিজয় সুনিশ্চিত।

আমাদের পক্ষ তো নিষ্প্রাণই ধরে নাও। কিন্তু অস্তাচলগামী সূর্যও ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি করে আকাশে এক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে যায়। মরতে তো আমাকে হবেই। মরণ আমার অবধারিত এবং তার জন্য আমার কোনো খেদ নেই। তবে এ-ও সম্ভব হতে পারে যে আমার এই দুঃখের অশ্রুধারা পতিত হয়ে আমার বিফল এবং শুষ্ক জীবনে এক ইন্দ্রধনু রচনা করে আমাকে কিছুটা সান্ত্বনা দিয়ে ফেলতে পারে। যাক্, চল কৃষ্ণ, এখন তোমার-আমার মধ্যে সম্পর্ক ঘটে গেল। উপস্থিত এখানেই এর শেষ। এখন তো যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই আবার আমরা মিলিত হব।'

একটু থেমে আবার সে বলল: 'আমার মৃত্যু এবং পাণ্ডবদের জয় সুনিশ্চিত। এ যুদ্ধ হল এক যজ্ঞ। ভীষ্ম, দ্রোণ এবং সব কৌরবরা এই

যজ্ঞে ভস্মীভূত হয়ে যাবেন। আমি এই যুদ্ধের শীঘ্রই শেষ দেখতে চাই। জীবনের প্রতি আমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি। স্বর্গে যাবার জন্য আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা জেগেছে। আমার আর ধৈর্য নেই। কৃষ্ণ! আমি তোমার সঙ্গে স্বর্গেই মিলিত হব। নিজের ভাইদের, নিজের পিতা এবং নিজের মায়ের সঙ্গে সেইখানেই মিলিত হব। কৃষ্ণ! নমস্কার।' এই বলে কর্ণ কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করলেন দৃঢ় আলিঙ্গনে এবং নিজে ফিরে গিয়ে রথের উপর বসে পড়লেন।

কর্ণ তো চলে গেলেন এবং কৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরের কাছে চলে গেলেন। কিন্তু এ কাহিনী এখানেই শেষ হল না।

কৌরব রাজসভায় কি কি ঘটল তার সমস্ত বিবরণ বিদুর গিয়ে কুন্তীকে শোনালেন। যুধিষ্ঠির শান্তি চাইছিলেন কিন্তু দুর্যোধনের জেদের জন্য যুদ্ধ করাই স্থির হল।

এই সব বিবরণ শুনে কুন্তী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কৌরব-সেনার মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণের মত প্রভূত বলশালী যোদ্ধা আছেন, তাঁদের সামান্য বীর বলে মনে করা ভয়ানক ভুল হবে। কুন্তী জানতেন যে কর্ণও তাঁরই ছেলে। সে অর্জুনকে মেরে ফেলতে পারে। আবার যদি কর্ণ মারা যায়, তা হলে সে-ও তো আমারই ছেলে। দুদিকেই, যাই হোক না কেন, সমান ক্ষতি। আমি কেন না নিজে গিয়ে কর্ণের সঙ্গে দেখা করি এবং তাকে বলি যে আমি কে? আমি কেন না তাকে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে আনার চেষ্টা করি? তার কাছ থেকে যদি কিছু বর বা ভিক্ষা চাই তা হলে নিশ্চয়ই সে তা দিতে অস্বীকার করবে না কারণ সে মস্ত বড় দাতা। এই সব ভেবে কুন্তী কর্ণের সঙ্গে মিলিত হবেন বলে স্থির করলেন।

কর্ণ ও কুন্তী

কর্ণ মধ্যাহ্নকালে গঙ্গাতটে রোজ সূর্যের পূজা করতেন। কুন্তী ঠিক ঐ সময় একলাই গঙ্গাতটে গিয়ে উপস্থিত হলেন, যখন কর্ণ পূজাতে নিমগ্ন ছিলেন। কর্ণ নিজের হাত দুটি তুলে চোখ বুজে সূর্যের দিকে দৃষ্টি স্থির করে সূর্যোপাসনায় যেন সমাধিস্থ হয়ে ছিলেন। কুন্তী কর্ণের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সূর্যের প্রখর উত্তাপ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তিনি কর্ণেরই উত্তরীয় বস্ত্র অর্থাৎ চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে নিলেন এবং দাঁড়িয়ে রইলেন।

কর্ণের পূজা শেষ হল এবং যখন সে ঘুরে দেখল তখন সে একজন নারীর উপস্থিতি টের পেল, যিনি রোদ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তারই চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছিলেন। তার খুব আশ্চর্য বোধ হল।

সে কুন্তীকে পরম অনুরাগে ছায়াতে এনে বসাল এবং প্রণাম করে বলল: 'দেবি! আমি হচ্ছি কর্ণ। তুমি এমন কুল বা বংশের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে যে কোনোরকম শারীরিক কষ্টে অভ্যস্ত নয়। সে যাই হোক, বলো, তুমি কি চাও?

'আমি সূর্যোপাসনার পর দান ধ্যান করি, এই জন্য বলো তোমাকে কী দেব?' কুন্তী যেদিন কর্ণকে বাক্সে বন্ধ করে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তার পরে এই প্রথম সুযোগ এল যখন তিনি আবার নিজের ছেলেকে দেখলেন। কুন্তীর সেই পুরানো স্মৃতি জেগে উঠল। সেই সমস্ত দৃশ্য যেন তাঁর চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল।

যখন বাক্সের মধ্যে পুরে কুন্তী কর্ণকে নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তখন তিনি কর্ণের কুশল-মঙ্গল সব কিছুর ভার ভগবান আর দেবতাদের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। জল-প্রবাহে নামিয়ে দেবার সময় যে শুভ-কামনা এবং আশীর্বাদ কুন্তী দিয়েছিলেন, তার বর্ণনা বড়ই রোমাঞ্চকর:

শিবাস্তে সন্তু পন্থানো মা চ তে পরিপন্থিনঃ।
আগতাশ্চ তথা পুত্র ভবন্ত্বদ্রোহচেতসঃ॥
পাতু ত্বাং বরুণো রাজা সলিলে সলিলেশ্বরঃ।
অন্তরিক্ষেঽন্তরিক্ষস্থঃ পবনঃ সর্বগস্তথা॥
ধন্যা সা প্রমদা যা ত্বাং পুত্রত্বে কল্পয়িষ্যতি।
ধন্যাস্ত্বং তৃষিতঃ পুত্র স্তনং পাস্যসি দেবজ॥

'হে পুত্র! বরুণ এবং পবন সবাই তোমাকে রক্ষা করুন। যে প্রমদা নারী তোমাকে স্তন্যপান করাবে, সে ধন্য।' এই আশীর্বাদের সঙ্গে কর্ণকে দেবতাদের সংরক্ষণে ছেড়ে দিয়ে কুন্তী নিশ্চিন্ত হলেন।

কুন্তী কর্ণকে যে শুভেচ্ছা ও আশিষ দিয়েছিলেন, তা সফল হল। ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনাকে স্বীকার করলেন এবং তার মায়ের রূপে সে রাধাকে লাভ করল।

কর্ণকে ভাসিয়ে দেবার পরের ঘটনা সম্বন্ধে কুন্তী কিছুই জানতেন না। তবে কর্ণকে দেখার পর তিনি এইটুকু অন্তত জানতে পারলেন যে সে তাঁরই ছেলে।

কুন্তী কি বলেন তা শোনার জন্য কর্ণ ধৈর্যের সঙ্গে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষে কুন্তী বললেনঃ 'তুমি আমার সঙ্গে পরিচিত কিনা তা জানি না কিন্তু আমি একটি ভিক্ষা চাইতে এসেছি।' কর্ণ বললেনঃ 'দেবি! আমি তো তোমাকে জানি না কিন্তু তবু আমার মনে হচ্ছে তুমি আমার পরিচিত। আমার মনে হচ্ছে আমি কখনও যেন তোমাকে দেখেছি। তোমার চেহারা, তোমার চোখের জল, তোমার গলার স্বর, সব যেন আমার পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। আমি মনে করতে চেষ্টা করছি যে কোথায় তোমাকে দেখেছি।' তারপর হঠাৎ কর্ণ বলে উঠলঃ 'হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে, তুমি আমার স্বপ্নের সেই দেবী। নিশ্চয়ই তুমি তা-ই।'

কুন্তী মৃদু হেসে বললেনঃ 'স্বপ্নের দেবী বলতে তুমি কী বলতে চাইছ, তার মানে কী, আমাকে একটু শোনাও। আমি বসছি। আমার কোনো তাড়া নেই। আমি খানিকক্ষণ তোমার সঙ্গে কাটাব বলেই এসেছি।'

কর্ণ বললেনঃ 'এটা বড় আশ্চর্যের কথা যে নিজের এই স্বপ্নের কথা আমি আমার মা রাধাকে ছাড়া আর কাউকে আজ পর্যন্ত বলিনি, তা সত্ত্বেও তোমাকে আমি সব কথাই খুলে বলব। জানি না, তুমি জানো কিনা যে আমার নাম হচ্ছে রাধেয়। আমার মা'র নাম রাধা কিন্তু সে আমার আসল মা নয়। আমার বাবা অধিরথ আমাকে গঙ্গায় ভেসে যাওয়া অবস্থায় পেয়েছিল। এই অধিরথই আমাকে নিজের স্ত্রী রাধার হাতে সঁপে দেয়। তাকেই

আমি মা বলে গ্রহণ করলাম এবং অধিরথকে বাবা বলে এবং নিজের নাম রাখলাম রাধেয়।

'আমার বড় দুঃখ যে আমার আসল মা আমাকে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই ত্যাগ করেছিলেন। হয়তো তারই ফলস্বরূপ আমার গাঢ় নিদ্রাকে এই স্বপ্ন দিয়ে সে বারবার ভেঙে দেয়। এই স্বপ্ন বারবার একইভাবে সামনে আসে। স্বপ্নে আমার এক দেবী নারী নজরে পড়ে। তাব বেশভূষা এক রাজকুমারীর মত বহুমূল্য। কিন্তু নিজের মুখ সে সব সময়েই নিজের আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখে। আমি ঘুমিয়ে থাকতাম আর সে সব সময় ঝুঁকে আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে দেখতে থাকত। তার উষ্ণ অশ্রু আমার উপর পড়ে পড়ে আমাকে উত্তপ্ত করে তুলত। মাঝে মাঝে আমি উঠে তাকে জিজ্ঞাসা করতামঃ 'দেবি! তুমি কে? কাঁদছ কেন?' তখন অবরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলতঃ 'আমি তোমার উপর অন্যায় করেছি, সেইজন্য কাঁদছি। আমি তোমাকে আপন করতে চাই। কিন্তু তুমি চিরকালের মত আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছ। আমি এই কারণেই বিলাপ করছি। আমি তোমার সঙ্গে কেবল স্বপ্নেই মিলিত হতে পারি। তা সে-স্বপ্ন তোমারই হোক বা আমার। শুধু এতেই আমার হৃদয়ের জ্বালা জুড়োয়।'

'তারপর আবার সে অন্তর্ধান হয়ে যেত। আমি বলতামঃ 'দেবি। তোমার মুখখানি তো আমাকে দেখাও' কিন্তু সে অদৃশ্য হয়ে যেত। আস্তে আস্তে সময় এগিয়ে যেতে লাগল। তারপরে যেটুকু ছিল, তা-ও শেষ হয়ে এল। এখন অনেক কাল সে আমার স্বপ্নে আর আসেনি। হতে পারে, তার হয়তো অন্য সন্তানাদি হয়েছে ইতিমধ্যে। আমার অনুমান যে সেই স্বপ্নেব দেবীই আমার মা ছিল। কিন্তু এখন সে আমার স্বপ্নের সম্পর্কও ত্যাগ করেছে স্বপ্নে দেখা দেওয়াও বন্ধ করে দিয়েছে। সে যাই হোক, তোমার রূপ-রাগ কিন্তু সেই স্বপ্ন-দেবীর মত। এখন আমায় বলো তো, তুমি কে?'

কুন্তীর মাথা নুইয়ে গেল। সে ঠিক করতে পারল না কী উত্তর দেবে। মনকে শক্ত করে শেষে বললঃ 'তুমি ঠিকই ধরেছ। তোমার সেই স্বপ্নের দেবী আমিই—কুন্তী, পাণ্ডবদের মা। আমি তোমাবও মা। তুমি আমার সবচেয়ে বড় ছেলে।'

কর্ণ বললঃ 'কুন্তী, পাণ্ডবদের মা, অথচ আবার নিজের ছেলে রাধেয়ের কাছে বর চাইতে আসে! আমি কি জেগে আছি? আর আমার সেই স্বপ্ন-দেবী কি আবার আমার সামনে উপস্থিত?' এই বলে সে কুন্তীর দিকে দেখতে লাগল আর কুন্তী কর্ণের দিকে। একক্ষণও কাটেনি, দুজনেই পরস্পরের বাহুপাশে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়ে গেল। কর্ণ বললঃ 'মা! শেষ

পর্যন্ত তুমি এসেই গেলে। মা! তোমার জানা নেই এই সুযোগের জন্য আমি কতকাল ধরে প্রতীক্ষা করছি। আমি চাই যে তুমি উপলব্ধি করো যে এই ক্ষণটির প্রতীক্ষায় আমি কত স্বপ্ন দেখেছি। আমি বারবার তোমার কথা ভেবেছি, এমন কি তুমিও আমাকে এত স্মরণ হয়তো করো নি, আমার কথা এত ভাবোনি।

'স্বপ্নে আমি কত চেয়েছি তোমার আঁচল উঠিয়ে দিযে তোমার মুখখানি তো অন্তত দেখি। মা! তুমি আমায় জন্ম দিয়েছ। তবে আবার এত দীর্ঘ-কাল কেন তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাকলে? তুমি দূরে থেকে কেন আমায় এত দুঃখী করলে? আমি যদি বা চেয়েছি তা কীই বা চেয়েছি, কতটুকুই বা চেয়েছি? মাত্র এইটুকু যে তোমার দেখা যেন পাই। যা হোক, এখন তো তুমি এসে গিয়েছ এবং তুমি নিজের ছেলে বলে আমাকে স্বীকার করে নিয়েছ। এতে আমি এক পরম সুখ ও শান্তি পেয়েছি।'

কুন্তীর চকিত দৃষ্টি কর্ণের দিকে ফিরল। কর্ণ হাসি মুখে আবারও বললঃ 'মা! এখন আমি জানতে পারলাম যে আমি কে। আমি তোমার ছেলে এবং সূর্যের সন্তান। তুমি লজ্জায় পড়ে আমাকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছিলে।' কুন্তী এই শুনে আশ্চর্যে চকিত হয়ে বললেনঃ 'পুত্র! আমি কল্পনাও করিনি যে তুমি এ সব রহস্যের কথা জানো। কিন্তু তুমি এ সবের মর্ম জানলে কেমন করে? আর যদি তুমি জেনেই গেলে তো আমার কাছে চলে এলে না কেন? আমার আসার প্রতীক্ষায় তুমি কেন আটকে রইলে?'

কর্ণ বললঃ 'মা! মাত্র গতকালই শ্রীকৃষ্ণ আমাকে এই সব রহস্যের কথা শোনালেন। কিন্তু এ সব চর্চা এখন ছাড়ো, ও-সব কথা থাক। মা! এখানে এসে বোসো আর আমার সঙ্গে কথা বলো। আমার কপালে এ-সুখ বেশিক্ষণ সইবে না। এই জন্য এই সুখের পাত্রের শেষ বিন্দু পর্যন্ত আমাকে পান করতে দাও। নিজের হাত তোমার কোলে রেখে আমাকে মায়ের সুখ পেতে দাও। কথা আমার কাছে এখন অবান্তর। আমি মৌন থেকেই চুপ করে নিঃশব্দে এই সুখ পান করতে থাকব।'

কুন্তী তার হারানো ছেলেকে ফিরে পেল আর কর্ণ তার ভুলে-যাওয়া মাকে, এর দরুণ দুজনেই অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল।

হঠাৎ কর্ণ দাঁড়িয়ে উঠল এবং বললঃ 'মা! তুমি যে আমার কাছে এলে, এজন্য আমি একান্ত কৃতজ্ঞ। আমি জানি না, আমার এ-সুখ কতক্ষণ স্থায়ী হবে—মাত্র কয়েক ক্ষণ অথবা কয়েক ঘণ্টা। কিন্তু এই শান্ত স্বপ্ন থেকে আমাকে জেগে উঠতেই হবে। এখন বলো মা! কেন তুমি এসেছ?'

'কর্ণ! তুমি নিজেকে রাধেয় বলা ছেড়ে দাও। এখন থেকে তুমি কৌন্তেয়।

তুমি আমার ছেলে। এখন পাঁচ নয়, আমার ছয়টি ছেলে। আমি আজ অত্যন্ত সুখী।'

কর্ণের চোখ অশ্রুজলে পূর্ণ হয়ে গেল। সে বললঃ 'মা! ও মা! তুমি কেন এলে? আর আমাকে এই সব ইতিহাস কেন শোনালে? তুমি জানো আমি নিজেকে কৌন্তেয় বলার জন্য কতটা লালায়িত। তোমার এবং সূর্যের ছেলে বলে আমার কত গৌরব, অহংকার। কিন্তু আমাকে তো রাধেয় হয়েই থাকতে হবে। মা! তুমি বুঝতে পারবে না আমি কত দুঃখী কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা এইরকমই। তুমি কিছু চাইতে এসেছিলে। বলো, আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?'

কুন্তী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, পরে চোখের জল মুছে বললঃ 'পুত্র! তুমি অনেক অপমান সয়েছ, কেননা সংসারের কেউ জানত না যে তুমি কুন্তী আর সূর্যের পুত্র। এখন এই অমাবস্যার কালরাত্রির অবসান ঘটেছে। পঞ্চ পান্ডবের তুমি ভাই, তা না জেনেই তুমি তাদের সঙ্গে শত্রুতা করে এসেছ। কিন্তু এখন তোমার সব জানা হয়ে গিয়েছে। এখন এটা উচিত নয় নিজের ভাইদের সঙ্গে তোমার শত্রুতা থাকে। তুমি আমার সঙ্গে চলো। পাঁচ ভাইয়ের কাছে আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি এখন সংসারের মালিক হয়ে রাজ্য ভোগ করো। তোমার ভাইরা তোমার বন্দনা এবং পূজা করবে। তুমি শান্তি লাভ করবে। এই ভিক্ষা চাইবার জন্যই তোমার কাছে এসেছি।'

কর্ণের চোখের জল চোখেই রয়ে গেল, তা আর বাইরে প্রবাহিত হতে দেখা গেল না এবং কুন্তীর দিকে তাকিয়ে সে বললঃ 'মা! দুদিনের মধ্যেই দুজন মহান হৃদয় ব্যক্তি আমাকে দুনিয়ার সাম্রাজ্য অর্পণ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। আমাকে এ-ও লোভ দেখিয়েছেন যে আমি যদি এই প্রস্তাব মেনে নিই, তা হলে যুধিষ্ঠির আমার দাস হয়ে আমার সেবা করবে। বিধির গতি বড় বিচিত্র! এই প্রস্তাব ভাল করে ভেবে দেখারও আমি অবকাশ পাইনি। কিন্তু মা! বলো তো যদি আমি তোমার কথা শুনে তোমার সঙ্গে যাই তা হলে তার পরিণাম কি হবে?'

'পরিণাম কি?' কুন্তী বললেন, 'তোমরা সব এক হয়ে যাবে। অর্জুন তোমার সেবক হবে। তুমি পান্ডবদের সাহায্যে সারা বিশ্বের সাম্রাজ্য ভোগ করবে। বলরাম এবং কৃষ্ণ দুজনেরই আশীর্বাদ তুমি লাভ করবে। তোমাকে সূতপুত্র না বলে পান্ডব বলে সবাই ডাকবে।' ঠিক সেই সময় আকাশ থেকে এক দৈববাণী ধ্বনিত হল। এ ছিল সূর্যের বাণী। সে বললঃ 'পুত্র! কুন্তীর প্রস্তাব শুভ, তুমি তা মেনে নাও।' কর্ণ শুনল বটে কিন্তু তার উপর তার কোনো প্রভাব পড়ল না।

কিছুক্ষণ ধরে সে তার মার দিকে তাকিয়ে রইল। শেষে সে তার মৌন-ভঙ্গ করে বলল: 'মা! তুমি জানো না আমি তোমার উপর কিরকম চটা, আমার কি রকম রাগ। সেই রাগ ছিল আমার সেই অজানা মায়ের উপর, যে স্বপ্নে আমার কাছে আসত। এ রাগ তোমার উপর ছিল না। কেন না, সেই অজানা মায়ের জন্যই আমাকে এই সমস্ত অপমান সহ্য করতে হয়েছে। আমার নাম, আমার সম্মান, আমার জীবন সবই কলুষিত হয়ে গিয়েছে। হাজারো প্রশ্ন আমার মনে উঠত, যা প্রকাশ করে নিজের তিক্ততাকে আমি কমাতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু তোমাকে দেখতেই আমার সেই রাগ ঠিক এমনই মিলিয়ে গেল, যেমন মরুভূমির উপর জল টিকতে পারে না। এখন আমি তোমার আদরের জন্য লালায়িত হয়ে আছি। রাধা আমার প্রিয় কিন্তু তোমার তুলনায় সে প্রেমও শিথিল ও দুর্বল হয়ে পড়ছে। আবার হৃদয়ও ভাইদের প্রেমে উথলে উঠছে। মায়ের আদর বড় দুর্লভ জিনিস। তোমার এ প্রেম আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরছে না।' এই বলে আরও একবার সে মায়ের সঙ্গে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল। মা ও ছেলের এই অনুরাগ দেখে সূর্য প্রসন্ন হলেন।

কিছুক্ষণ বাদে কুন্তী আবার বলল: 'তা হলে পুত্র। চলো, নিজের ভাইদের সঙ্গে মিলিত হও।' কিন্তু কর্ণ গভীর দুঃখে দুঃখী ছিল। সে বিলাপ করতে করতে বলল: 'না, মা! তা সম্ভব নয়।' কুন্তীর খুব আশ্চর্য লাগল, 'কেন পুত্র! কেন সম্ভব নয়? কেন তুমি দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছ, পিছিয়ে যাচ্ছ?' কর্ণ বলল: 'আমি এখন কোনো অবস্থাতেই দুর্যোধনকে ছাড়তে পারি না। আমি তার কাছে কথা দিয়েছি, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মা! এত-কাল আমি সূতপুত্র ছিলাম, তুমি আমাকে ত্যাগ করে দিয়েছিলে, আমার কোথাও কোনো সম্মান ছিল না। সেই সংকটকালে কেবল এক দুর্যোধনই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। দ্রোণ আমাকে তিরস্কার করেছিলেন। ভার্গবও তাই। রঙ্গমঞ্চে অর্জুনের প্রতি স্পর্ধা জানিয়ে বাণের কৌশল দেখাবার জন্য আমি হস্তিনাপুরে এলাম তো সেখানেও আমার অপমান ঘটল। তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে। তুমি আমাকে নিশ্চয়ই চিনেও থাকবে। কিন্তু তোমার কাছ থেকেও আমি কোনো সাহায্য পাইনি সেদিন। পুরানো কথা বলে তোমার মনে এখন আর দুঃখ দিতে চাই না, কিন্তু যখন সবাই সূতপুত্রকে তিরস্কার গঞ্জনা করত, তখন কেবল এক দুর্যোধনই ছিল যে আমাকে স্বাগত জানিয়ে-ছিল। তাকে এখন ত্যাগ করা আমার পক্ষে অধর্ম হবে। মা! আমার হৃদয়ে এখন এক ঝঞ্ঝা-তুফান, প্রবল ঝড় উঠছে। আজ পর্যন্ত দুর্যোধন ছাড়া আমার আর কেউ সহায় ছিল না। কিন্তু এখন পেয়েছি তোমার বাৎসল্য

স্নেহ। তার উপর ভাইদের টান বা আকর্ষণ। আমার হৃদয় এই প্রেমের চাপে যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। ভাইদের এবং মায়ের প্রিয়পাত্র হবার জন্য সব কিছু করতে আমি প্রস্তুত কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত নই। দুর্যোধনের কাছে আমার গভীর ঋণ। সে হল প্রেমের এবং উপকারের ঋণ, যা লৌহ-শৃঙ্খলে আমাকে বেঁধে রেখেছে তার সঙ্গে। আমি আপন কর্তব্য কেমন করে ভুলব? তুমি এলে, তাই আমাকে এ সব কথাই ভুলতে হবে। কিন্তু কর্তব্যকে তো আমি ভুলতে পারি না। মা! আমার এ মন বা এ শরীর আর আমার নেই। এ সব আমি দুর্যোধনকে সঁপে দিয়েছি। মা! আমার শেষ সময় এসে গিয়েছে। এই শেষ সময়ে আমার যেটুকু যশ আছে তা আমি কি করে খুইয়ে বসি? আমি এবং আমার সব সঙ্গীরা দুর্যোধন-সমেত সর্বনাশের মুখে প্রবেশ করতে চলেছে। এরা সবাই মরবে। পাণ্ডবদের চুলও বাঁকবে না, তাদের কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। তাদের সহায়ক স্বয়ং কৃষ্ণ। এজন্য তাদের সম্বন্ধে সব চিন্তা ত্যাগ কর। আমার কবচ-কুণ্ডল, যা আমাকে অমরত্ব দিয়ে রেখেছিল, তা-ও ইন্দ্র চেয়ে নিয়ে চলে গেল। আমি যখন সূর্যোপাসনা করি, তখন যে কেউ আমার কাছে যা কিছু চায়, আমি তাতে না করি না। তুমিও আমার কাছে কিছু চেয়েছ, তা আমি দিতে পারলাম না, এতে আমার গভীর দুঃখ। তা সত্ত্বেও তোমাকে আমি শূন্য হাতে ফেরৎ পাঠাব না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, অর্জুন ছাড়া আমার নিজের আর কোনো ভাইকে আমি বধ করব না। অর্জুনের সঙ্গে তো আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব। কিন্তু আমিই তার হাতে মরব। অতএব মা! তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যাও। তোমার পাঁচটি ছেলে। সেই পাঁচটিই থাকবে। অর্জুন যদি নিহত হয় তা হলে আমি এসে যাব। তা হলে সেই পাঁচই থাকবে। আমি মরে গেলেও পাঁচই থাকবে। তবে অর্জুনের নয়, মৃত্যু তো আমারই ঘটতে চলেছে।

'মা! তুমি সব অবস্থাতেই পাঁচ ছেলের মা হয়ে থাকবে। যদি কর্ণ না থাকে তা হলে অর্জুন থাকবে। অর্জুন না থাকলে কর্ণ থাকবে। দুজনের একজন তো বেঁচে থাকবেই। এবার মা তুমি বাড়ী যাও এবং নিশ্চিন্তে থাকো।' কান্নায় কুন্তীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, তাঁর সারা দেহ কাঁপতে লাগল। ছেলেকে পেলেন আবার হারালেনও। কুন্তীর যে হৃদয় এতদিন শূন্য ছিল তা যেন আরও রিক্ত, আরও শূন্য হয়ে গেল। বিদ্যুতের দীপ্তি যেমন তার পিছনে রেখে যায় আরও গভীর অন্ধকার, ঠিক তেমনি ছেলের সঙ্গে কাটানো এই ক্ষণিক কাল কুন্তীর হৃদয়ে যেন আরও বেশি অন্ধকার রেখে দিয়ে গেল।

কর্ণ নিজের মায়ের এই দুঃখ উপলব্ধি করল। মাকে গাঢ় আলিংগন করে সে বলল: 'মা! বিধি যা লিখে রেখেছেন, তা খণ্ডাবে কে? তোমার অশ্রু বা আমার প্রার্থনা ঈশ্বরের এই নির্ধারিত রচনায় কিছুই পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। কালের গতিকে মুছে ফেলার বৃথা প্রয়াস কোরো না। তোমার আমার জন্মের আগেই কাল এই সমস্ত ক্রম রচনা করে রেখেছিল। আমাকে আশীর্বাদ করো যেন আমি তাড়াতাড়ি স্বর্গে যেতে পারি। তোমার অশ্রু দিয়ে আমার দুঃখকে ধুয়ে দাও। আমার মনে হবে তোমার অশ্রুই আমার অভিষেক-বারি। তোমার অশ্রু গঙ্গাজলের চেয়েও বেশি পবিত্র। মা! যাও। চলো, এবার আমরা দুজন অন্য কোনো স্বপ্ন দেখিগে।'

কুন্তী এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে কর্ণ তাঁকে ধরে উঠিয়ে দাঁড় করালেন। মা আর ছেলে একে অন্যের সঙ্গে যেন আটকে গেলেন। শেষে কর্ণকে নিজের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়ল। কুন্তী যতক্ষণ চোখের আড়ালে না চলে গেলেন, ততক্ষণ কর্ণ সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়েই রইল। এই বিচ্ছেদ-দৃশ্য আকাশ থেকে দেবতারাও দেখলেন। সকলেই বিলাপ করলেন।

ইন্দ্রের ভিক্ষাপাত্র

কর্ণ যখন কুন্তীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, তখন, যেমন আগেই বলা হয়েছে, সে কুন্তীকে বলেছিল যে আমার কবচ-কুণ্ডল চলে যাওয়ার ফলে আমার অমরত্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই কবচ আর কুণ্ডল কর্ণ কি করে খুইয়ে বসল, সে-কাহিনীও বড় চিত্তাকর্ষক এবং প্রেরণাদায়ক। এজন্য তারও উল্লেখ করা দরকার।

কর্ণ ছিল সূর্যের পুত্র আর অর্জুন ছিল ইন্দ্রের পুত্র। সূর্য স্বভাবত কর্ণের পক্ষে ছিলেন আর ইন্দ্র অর্জুনের পক্ষে। এঁদের দুজনেরই আপন আপন প্রিয়পাত্রের জীবন নিয়ে চিন্তা ছিল। মহাভারত-যুদ্ধের আগে থেকেই অর্জুনের জীবন সম্বন্ধে ইন্দ্রের চিন্তা ছিল, কেননা তিনি জানতেন কর্ণ অত্যন্ত বলবান এবং যতক্ষণ কবচ-কুণ্ডল পরে থাকবে তার দেহের উপর সব বিপত্তি বা আঘাতই নিষ্ফল হবে। এই পরিস্থিতিতে কর্ণের পক্ষ বা দিকটা প্রবল এবং অর্জুনের দিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার ঠিক এমনি সূর্যেরও এই চিন্তা ছিল যে কর্ণ এই দুই অমূল্য রক্ষাকবচ কোথাও আবার খুইয়ে না বসে।

এইজন্য একদিন রাতে কর্ণ যখন গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন, সূর্য তাকে সাবধান করার জন্য ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে স্বপ্নে তার সামনে উপস্থিত হলেন এবং তাকে দর্শন দিয়ে বলতে লাগলেনঃ 'রাধেয়! তুমি রোজ মধ্যাহ্নকালে সূর্যের উপাসনা করে থাক। সেই সময় যে কেউ তোমার কাছে দান চাইতে আসে, তুমি তার ইচ্ছা পূরণ করে দাও এবং কাউকে 'না' বলো না। ইন্দ্র তোমার এই স্বভাবের কথা জানে। সে অর্জুনের পক্ষপাতী। সেইজন্য সে তোমার কবচ ও কুণ্ডল ছিনিয়ে নিতে চায়, যাতে অর্জুনের জীবন নিরাপদ ও নির্ভয় হয়ে যায়। তাই কাল তোমার উপাসনার সময় ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে ইন্দ্র আসবে এবং তোমার কাছ থেকে তোমার কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা চাইবে।

এই দুটি দিয়ে দেওয়া তোমার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হবে। সেইজন্য তুমি ইন্দ্রকে সব কিছু দেবার জন্য প্রস্তুত হলেও ভুলেও যেন কবচ-কুণ্ডল দিয়ে ফেলো না। এ তোমার জীবন-মরণের প্রশ্ন। অতএব তোমাকে সাবধান করে দেবার জন্য আমি উপস্থিত হয়েছি।'

কর্ণ বলল: 'ব্রাহ্মণরূপী দেবতা! আপনি আমার একান্ত হিতৈষী বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনি আপনার পরিচয় তো দিন যে কেন আমার জন্য আপনার এত চিন্তা।' সূর্য রহস্য উন্মোচন করে বলে দিলেন তিনি কে। কর্ণ বলল: 'ভগবন্! আমি বড় কৃতজ্ঞ যে আপনি আমাকে সাবধান করে দিলেন, কিন্তু আপনি তো জানেনই যে সূর্য-পূজার পর যে কেউ আমার কাছে এসে প্রার্থী হয়, আমি তাকে না করি না, ফিরিয়ে দিই না। আমি যবে থেকে এই দানের ব্রত গ্রহণ করেছি, তখন থেকে আমার অত্যন্ত সুখ ও শান্তি লাভ হয়েছে। আমার তো দিতেই সুখ। যদি কেউ আমার অত্যন্ত প্রিয় জিনিসও চায় তা হলে তা দিয়ে আমার আরও বেশি আনন্দ হয়। যদি কেউ আমার প্রাণও চায় তা হলেও আমি 'না' বলতে পারব না। ইন্দ্র যদি আমার কাছে কোনো দান চায়, যাতে পাণ্ডবের মঙ্গল হবে এবং আমার অমঙ্গল, তা হলেও আমি না দিয়ে পারব না। জীবনের উপর আমার কিছু-মাত্র মোহ বা মমতা নেই। আমার শুধু নিজের যশের উপর মোহ বা আসক্তি আছে। সেইজন্য কাউকে 'না' বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। নিজের জীবন-রক্ষার জন্য, প্রাণ বাঁচাবার জন্যও আমি নিজের যশকে খোয়াতে পারব না। ইন্দ্রকে 'না' বলে আমি চিরজীবী হতে পারি কিন্তু সে-জীবন কী কাজের, যখন কিনা, আমার অপযশ দুর্নাম চিরকালের জন্য জীবন্ত থেকে যাবে? যশের নাশের চেয়ে তো আমার মরণই ভালো। অপযশ নিয়ে বেঁচে থাকা এক বিড়ম্বনা, তা জঘন্য।

'আমি এ-ও জানি যে পাণ্ডবদের জয় হবে। কৌরবদের বিনাশ বিধিই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আমার নাশ অবশ্যম্ভাবী, এ জেনেও আমি নিজের ব্রত থেকে কেন বিচ্যুত হতে যাই? নিজের জীবনের চেয়ে আমার কাছে নিজের কীর্তি বেশি প্রিয়। কীর্তিই হচ্ছে সৎপুরুষের জীবন, অপকীর্তিই মৃত্যু। এই বিনাশশীল শরীরের রক্ষার জন্য, একে বাঁচাবার জন্য কীর্তিকে বিলুপ্ত করা এবং তার বদলে এক চিরন্তন অপকীর্তি কেনা, এ এক নিতান্ত মূর্খতা। কীর্তি জীবনকে শুদ্ধ করে। সুতরাং তাই লাভ করার জন্য লড়তে লড়তে মরে যাওয়াই আমার পক্ষে মঙ্গল। এই জন্য আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ কিন্তু পুরো শক্তি লাগিয়ে আমি যুদ্ধ করতে চাই। ইন্দ্রকে আমি 'না' বলব না।'

সূর্য বললেনঃ 'পুত্র! তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাই আমি তোমার রক্ষার জন্যই তোমাকে সাবধান করতে এসেছি। তুমি নিজের, নিজের সহধর্মিণীর এবং নিজের সন্তানের সুখের দিকেও তো একটু দেখো। তুমি তো মরেই যাবে, তা হলে নিজের কীর্তির কথা শুনতে বা দেখতে কোথা থেকে আসবে? তোমার সব চেয়ে বড় আকাংক্ষা রয়েছে অর্জুনকে পরাস্ত করা। কিন্তু কবচ-কুন্ডল দিয়ে ফেললে তুমি অর্জুনকে আর হারাতে পারবে না। কবচ-কুন্ডল থাকতে ব্রহ্মা, বিষ্ণুও তোমকে পরাজিত করতে পারবেন না। এমন অমূল্য জিনিসকে খুইয়ে ফেলা নিতান্ত মূর্খতা।'

কর্ণ গদগদ হয়ে বললঃ 'ভগবন্! আপনার স্নেহ আমাকে বিহ্বল করে তুলেছে। কিন্তু আমি আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি যে আপনার আজ্ঞা আমি পালন করতে পারছি না। আমার ব্রত হচ্ছে অটল, অচল। আমার প্রাণ যায় যাক, কিন্তু আমার ব্রত অখন্ড থাকবে।'

সূর্য বললেনঃ 'পুত্র! তোমার এই ধর্মভাব দেখে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমি তোমার জন্য গর্বিত।' এই বলে সূর্য অন্তর্ধান হযে গেলেন।

পরের দিন কর্ণ যথারীতি সূর্য-পূজা আরম্ভ করলেন। যখন সূর্য মধ্যগগনে এলেন, তখন ইন্দ্র ব্রাহ্মণ সেজে পৌঁছে গেলেন সেখানে।

কর্ণ উপস্থিত হয়ে ব্রাহ্মণকে নমস্কার করে বললঃ 'বলুন হে দেব! আমি আপনার কী সেবা করব? মধ্যাহ্নকালে আমার পূজা শেষ হবার পর যে কেউ এসে আমার কাছে দান চায়, তাকে আমি ফিরাই না। তার ইচ্ছা পূরণ করে থাকি। অতএব, আপনি বলুন, আপনার কি চাই।

ব্রাহ্মণ বললঃ 'রাধেয়! আমার আর কিছু চাইবার নেই। আমি কেবল তোমার কবচ এবং কুন্ডল চাই।' কর্ণ বললঃ 'ব্রাহ্মণ! তোমার এই চাওয়া বড় অদ্ভুত। কবচ-কুন্ডল আমার শরীরের সঙ্গে জোড়া অঙ্গবিশেষ। তাকে কেটে বার করা সহজসাধ্য নয়। কষ্টপ্রদও বটে। আরও অন্য কিছু অস্ত্র-শস্ত্র বা সোনা-রূপো চেয়ে নাও, কিন্তু কবচ-কুন্ডল চেও না।' ব্রাহ্মণ বললঃ 'আমার আর অন্য কিছু চাই না। যদি সত্যি সত্যি তুমি দাতা এবং বীর হও তা হলে ঐ দুটি জিনিসই আমাকে দান হিসাবে দিয়ে দাও।' কর্ণ হাসল এবং বললঃ 'ব্রাহ্মণ! তুমি এদের চাকচিক্যে প্রলুব্ধ হয়েছ বলে আমার মনে হচ্ছে। আসলে এ দুটি অতি সাধারণ জিনিস কিন্তু এর শক্তি আমার পক্ষে অমূল্য। অমৃতের মধ্যে ডুবিয়ে এই দুটি, কবচ এবং কুন্ডল, আমার শরীরের সঙ্গে এই অভিপ্রায়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যাতে এরা আমার জীবনকে রক্ষা করে। তোমার কাছে তো এর কোনো দামই নেই, মহত্ত্বও নেই।

'আর তা ছাড়া আমি আমার বন্ধু দুর্যোধনের কাছে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছি যে যুদ্ধে আমি অর্জুনকে মারব। এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য এ দুটি আমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এইজন্য এ দুটি আর তুমি চেও না।'

কিন্তু ব্রাহ্মণ নিজের জেদ ধরে বসে রইল। তখন কর্ণ হেসে বলল: 'ব্রাহ্মণ! আমি জানি, আপনি কে। আপনি ইন্দ্র। দাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতা হলেন আপনি। এই পৃথিবী আপনারই বরদানে পুষ্পিত ও ফলিত। বলা হয়ে থাকে যে বর্ষার মতই আপনি দেবার ব্যাপারে উদার। স্বয়ং এত বড় দাতা হয়েও আপনি আমার কাছে দান চাইতে এসেছেন, এতে আপনি আমাকে বড় লজ্জায় ফেলেছেন।

'আপনি জানেন যে এগুলো দিয়ে দিলে আমার কিরকম ক্ষতি হবে। তা সত্ত্বেও আমি আপনাকে 'না' বলব না।' আর এই বলে কর্ণ নিজের শরীরকে ছিন্নভিন্ন করে কবচ এবং কুন্ডল আপন অঙ্গ থেকে কাটল এবং ইন্দ্রের পায়ে রেখে বলল: 'নিন্, হে দেব! আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' কর্ণের মুখের উপর এক দৈবী বিভা প্রকাশ পাচ্ছিল। সে বড় খুশি ছিল। সেই আনন্দে সে এত বিহ্বল হয়ে পড়ল যে দুই চোখ দিয়ে অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল। ইন্দ্রও কাঁদতে লাগলেন। আকাশ থেকে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। ইন্দ্র বললেন: 'তুমি সত্যিই মহাত্মা। সূর্য তোমাকে সাবধান করে দিয়ে গেলেন, তা সত্ত্বেও তুমি নিজের ব্রতভঙ্গ করলে না। আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। বলো কী চাও। আমি তোমার সব আশা পূর্ণ করব।'

রাধেয় বলল: 'ইন্দ্র! দিয়ে আবার তার বদলে কিছু দান নেওয়া এ কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুরুষের শোভা পায় না। এরকম করলে দানের মাহাত্ম্যও চলে যায়। যাক, তাসত্ত্বে আপনার কাছে আমি কিছু চাইব, যাচ্ঞা করব শুধু এই কারণেই যে আপনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন লোকে তাকে দুর্ব্যবহারই বলবে এবং তাতে আপনার যশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আপনাকে আমি সেই অপকীর্তি থেকে বাঁচাতে চাই। সেইজন্য আমি কিছু ভিক্ষা করছি। এই দানের দরুণ লোকে আর আপনার দুর্নাম করতে পারবে না।

'লোকে বলবে ইন্দ্র কর্ণের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছেন ঠিকই কিন্তু তার বদলে কিছু দিয়েও ফেলেছেন। ভাল লোকের নিন্দা থেকে এইভাবে আপনি রক্ষা পাবেন। এইজন্য আমি একটি যাচ্ঞা করছি। আমাকে সেই শক্তি দিন, যার দ্বারা আপনি নিজের শত্রুদের সংহার করেছিলেন।' ইন্দ্র এই কথা শুনে যুগপৎ আনন্দিত ও আশ্চর্যান্বিত হলেন। তিনি বললেন: 'কর্ণ! তুমি আজ দেবতাদের রাজার উপরও জয়লাভ করলে। এজন্য আমি তোমার

ইচ্ছা পূর্ণ করব। আমার প্রথম বরদান হল এই যে এই কবচ ও কুণ্ডল তোমার শরীর থেকে কেটে নেবার পরেও এই ঘায়ের কোনো চিহ্ন বা দাগ তোমার দেহে থাকবে না। তুমি আগের মতই সুন্দর অক্ষত থেকে যাবে।

'দ্বিতীয় বরদানে শক্তিও আমি তোমাকে দিচ্ছি কিন্তু তার সঙ্গে একটি শর্ত আছে যে এই শক্তি তুমি একবারই মাত্র প্রয়োগ করতে পাববে। যাকে চাও তুমি তাকেই নিশ্চয় মারতে পারবে। কিন্তু এই শক্তি নিজের কাজ সমাধা করে আমার কাছে আবার ফিরে আসবে। দ্বিতীয়বার আর এর উপযোগ বা ব্যবহার তুমি করতে পারবে না।'

কর্ণ বলল: 'আমার তো এ শক্তি দুবার ব্যবহার করার দরকারও হবে না। আমার তো শুধু একজন শত্রুকেই মারতে হবে।' ইন্দ্র বললেন: 'আমি তোমার অভিপ্রায়ের কথা জানি। তুমি অর্জুনকে বধ করতে চাও। কিন্তু রাধেয়! যতক্ষণ অর্জুনের মাথার উপর কৃষ্ণের হাত আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।' রাধেয় বলল: 'ইন্দ্র! আমার আশা আছে আমি যুদ্ধে জয়ী হব। কবচ-কুণ্ডল হারিয়েও আমি আশা-বাদী।' ইন্দ্র বললেন: 'রাধেয়! তুমি জিতবে বা হারবে, আমার কাছে এর কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু কবচ-কুণ্ডল দিয়ে তুমি এক বিপুল যশ জয় করে নিয়েছ। আজ থেকে তুমি আর রাধেয় নয়, কর্ণ বলে পরিচিত হবে, কেন না তুমি হচ্ছ শ্রেষ্ঠ দাতা। ইতিহাসে তোমার নাম-যশ অক্ষয় হয়ে থাকবে। তুমি আমার সম্বন্ধে বলেছ: 'বর্ষার মত দাতা' কিন্তু এখন থেকে সংসারে সবাই বলবে 'কর্ণের মত দাতা।' এসো, আমাব আশিষ নাও। আমি এবার যাই।' এই বলে ইন্দ্র বিদায় নিলেন। স্বর্গ থেকে আবারও প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি হল এবং জয়ধ্বনি করা হল।

কর্ণের এই সমগ্র কাহিনী তার উদাত্ত চরিত্রকে উদ্ভাসিত ক'রে চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলে। কর্ণ একজন মস্ত মানুষ ছিলেন। তিনি ধর্মাত্মা ছিলেন। কথায় অনড়। 'রঘুকুলরীতি সর্বদাই এই চলে এসেছে যে প্রাণ যায় সে-ও ভালো কিন্তু কথা যেন না যায় অর্থাৎ তার খেলাপ না হয়।' শ্রীরাম বলেছিলেন:

দ্বিশরং নাভিসন্ধত্তে দ্বিঃ স্থাপয়তি নাশ্রিতান।
দ্বির্দদাতি ন চার্থিভ্যো রামো দ্বির্নাভিভাষতে॥

শ্রীরামের এই সব বিভূতি—উদারতা, নির্ভীকতা, মহত্ত্ব, বচনে দৃঢ়তা কর্ণেও বর্তমান ছিল। কুসঙ্গের দরুণ কর্ণের তেজ যেন মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গিয়েছিল বা ঢাকা পড়েছিল। তবু ব্যাসদেব সময়ে সময়ে সেই তেজের ঝলক যেন প্রকট করে দিয়েছেন।

ভগবান রামের স্বভাব কর্ণের মধ্যে যেন পুরোপুরিই নেমে এসেছিল কৃষ্ণ বলেছিলেনঃ 'কর্ণ! তুমি ধর্মাত্মা'। কুন্তীও তাই বলেছিলেন। আর এই কাহিনীর মাধ্যমে ব্যাসদেব তাঁদের সেই কথারই যেন সমর্থন জানিয়েছেন।

মহাভারতের পাত্রবর্গের মধ্যে কর্ণ এক অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন, যাঁর মধ্যে শৌর্য্য, গাম্ভীর্য, সত্য এবং উদাত্ত চরিত্র সবই ছিল। কর্ণ এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, যা দুর্যোধনরূপ ঘন কৃষ্ণ মেঘের দ্বারা আবৃত হওয়ার ফলে তার পূর্ণ খ্যাতি বা মহিমায় প্রকট হতে পারেনি। তা সত্ত্বেও ব্যাসদেব মেঘের অন্তরালে ঢাকা সেই কর্ণকে আলোয় এনে প্রকাশ করে দিয়ে মানব-সমাজের অজ্ঞানকে যেন দূর করে দিয়েছেন।

মহাভারতের শেষে আবার কর্ণ নিজের আসল রূপে পাণ্ডব-পরিবারের সামনে এসে প্রকট হয়েছেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর যুধিষ্ঠির নিজের ভাইদের নিয়ে যখন সকলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে পিণ্ডদান ও জলদানাদি শেষ করে ফেললেন, তখন হঠাৎ কুন্তী বললেনঃ 'একজনকে তো তুমি ভুলেই গিয়েছ, যুধিষ্ঠির!' কৃষ্ণ শুনলেন এবং কুন্তীর অভিপ্রায়ও তিনি বুঝতে পারলেন কিন্তু বললেন না কিছুই। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'কাকে ভুলে গিয়েছি মা?' কুন্তী বললেনঃ 'কর্ণকে।' 'কী বলছ? কর্ণ তো সূতপুত্র ছিল, আমাদের শত্রু। তার উদ্দেশে তর্পণ জলদান? সে আবার কি?' কুন্তী বললেনঃ 'কর্ণ ক্ষত্রিয়ই ছিল।' 'ক্ষত্রিয়? কার ছেলে?' 'আমার ছেলে। কর্ণ তোমার বড়ভাই ছিল।' 'কী বলছ মা?' 'সত্যি বলছি।' আর তারপর যুধিষ্ঠিরকে সব রহস্য খুলে বলে দিলেন।

তখন তো যুধিষ্ঠির আর অর্জুন সবাই বুক চাপড়াতে লাগলেন। হায় রে হায়! আমরা নিজের বড়ভাইকে মেরে ফেললাম! কৃষ্ণ সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে এ কাহিনী শেষ করলেন।

কিন্তু এ কাহিনী হৃদয়-বিদারক কাহিনী। তাৎপর্য হল এই যে কর্ণ ছিলেন একজন অত্যন্ত তেজস্বী মহাত্মা, যাঁর চরিত্র ঢাকা পড়ে ছিল। ব্যাসদেব ঘন কৃষ্ণ মেঘের আড়াল থেকে বাইরে এনে প্রকাশ করে দিয়েছেন। মহাভারতে তেজস্বী পুরুষ গোনা-গাঁথা কয়েকজনই আছেন, তার মধ্যে কর্ণের স্থান অত্যন্ত উঁচুতে এবং চির ভাস্বর সমুজ্জ্বল।

শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ হয়েই গেল। দুই তরফের সেনা কুরুক্ষেত্রে একত্রিত হয়ে লড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তার মধ্যেই এক বিচিত্র ধরনের ঘটনা ঘটল। যুধিষ্ঠির নিজের কবচ খুলে আলাদা করে রেখে দিলেন, সব অস্ত্রশস্ত্রও নিজের দেহ থেকে নামিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং খালি পায়েই ভীষ্ম পিতামহের রথের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। ভীম, অর্জুন,

নকুল, সহদেব এবং কৃষ্ণও তাঁর পিছন নিলেন। সবাই যুধিষ্ঠিরের এই আশ্চর্য আচরণ অবাক হয়ে দেখছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না যুধিষ্ঠির কী করতে যাচ্ছেন। ভীম, অর্জুনাদি সবাই যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসাও করলেন যে এ আপনি কী করছেন, কিন্তু তিনি কাউকে কোনো উত্তর দিলেন না। কেবল কৃষ্ণ জানতেন যুধিষ্ঠিরের কী অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য।

যুধিষ্ঠির খালি পায়ে হেঁটে কৌরবদের সৈন্য-পরিবৃত পিতামহের দিকে চলেছিলেন। সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে এগিয়ে যেতে দিল। পিতামহের কাছে পেঁছে যুধিষ্ঠির তাঁর চরণ স্পর্শ করে বলতে লাগলেন: 'পিতামহ! আজ্ঞা দেন, আমি যুদ্ধ আরম্ভ করি এবং আশীর্বাদ করুন যেন আমি বিজয় লাভ করি।' পিতামহ বললেন: 'বৎস! কৃষ্ণ তোমার রক্ষক, সেজন্য বিজয়ের সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি থাকতে পারে? তুমিই বিজয়ী হবে। আমাকে তো দুর্যোধনের তরফে লড়তেই হবে, কেন না আমি তার অন্ন খেয়েছি। আমি তাই নিরুপায়।'

পিতামহের আশীর্বাদ নিয়ে যুধিষ্ঠির ফিরে এলেন। আবারও তিনি কবচ এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হলেন এবং যুদ্ধের শঙ্খ বাজালেন। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল।

যুদ্ধে অনাসক্তি অপরিহার্য

ইতিমধ্যে অর্জুনের বিষাদ এসে গেল এবং তা কৃষ্ণের উপদেশামৃতে তা দূর হল। সে-কাহিনীর পুনরুক্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল।

কিন্তু অর্জুন যখন যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন, তখন পিতামহের প্রতি অনুরাগ এবং সম্মানবোধের বশবর্তী হয়ে তিনি তেমন জোর দিয়ে যুদ্ধ না করে একটু শিথিলভাবে ঢিল দিয়ে যেন যুদ্ধ করছিলেন। এই শিথিলতা বা ঢিলেমি শ্রীকৃষ্ণের ভাল লাগল না। এইজন্য বিরক্ত হয়ে অর্জুনকে বকে শ্রীকৃষ্ণ বললেনঃ 'এ কী করছ? পিতামহকে না মারা ছাড়া যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব, এইজন্য জোর দিয়ে লড়ো।' তবুও অর্জুন শিথিলতার সঙ্গেই যুদ্ধ করে চলল।

এর ফলে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ এসে গেল। তিনি বললেনঃ 'অর্জুন! তুমি প্রাণ দিয়ে লড়ছ না। তা হলে আমিই লড়ে এই বুড়োকে শেষ করে দেব। এ না মরা অবধি জয়ের আশা রেখো না।' এই বলে শ্রীকৃষ্ণ রথ থেকে নেমে চক্র নিয়ে ভীষ্মের দিকে ধেয়ে গেলেন। ভীষ্ম তো গদগদ হয়ে গেলেন।

ভীষ্ম পিতামহ বললেনঃ 'ভগবন্! এর চেয়ে ভালো আমার আর কী সৌভাগ্য হতে পারে যে আমি আপনার হাতে মরব?' কিন্তু অর্জুন কৃষ্ণকে নিরস্ত করে বললেনঃ 'কৃষ্ণ! কোনো অবস্থাতেই আমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হতে দেব না।'

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ছিল, তিনি যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না। তা সত্ত্বেও কৃষ্ণ যখন মানতে চাইলেন না, তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জাপটে ধরলেন এবং তাঁকে থামিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। তারপর তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে আমি পিতামহের সঙ্গে অসংকোচে নির্দ্বিধায় যুদ্ধ করব।

এইটি শ্রীকৃষ্ণের জীবনে আর একটি উদাহরণ যে পাণ্ডবদের মঙ্গল বা হিতের জন্যই বলো বা ধর্মের রক্ষার জন্যই বলো, তিনি নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতেও নেমে পড়েছিলেন।

অর্জুন কৃষ্ণের কাছে প্রতিজ্ঞা করল যে সে শিথিলতা ত্যাগ করে এবার লড়বে এবং সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে কৌরব-সেনাকে সংহার করতে লাগল। কিন্তু বৃদ্ধ পিতামহের সংহারকারী শক্তিকে সে কিছুমাত্র কমাতে পারল না। পাণ্ডব-সেনার ক্ষয় হয়েই চলল। পাণ্ডবদের স্থির নিশ্চয় জন্মে গেল যে যতক্ষণ পিতামহ জীবিত আছেন, ততক্ষণ জয়ের আশা মরীচিকা মাত্র।

রাত্রিকালে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে কৃষ্ণকে বললেনঃ 'কৃষ্ণ! পিতামহের শক্তি দেখে আমি নিরাশায় ডুবে গিয়েছি। পিতামহ এতই বলবান যে তিনি যতক্ষণ তিনি বেঁচে আছেন, কৌরবদের আমরা কিছুতেই হারাতে পারব না।

কৃষ্ণ বললেনঃ 'যুধিষ্ঠির! ধৈর্য রাখো, এরও পথ বেরুবে। আমি পিতামহের মৃত্যু চাই। পাণ্ডব এবং বিশেষ করে অর্জুন আমার একান্ত প্রিয়। আমি নিজের দেহ টুকরো টুকরো কেটেও অর্জুনের হিতের জন্য তা উৎসর্গ করতে পারি। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছে যে সে পিতামহকে বধ করবে। তার এই প্রতিজ্ঞাকে আমি মিথ্যা হতে দিতে চাই না। অর্জুন সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে যদি যুদ্ধ করে তা হলে সে পিতামহকে বধ করতে পারে। কিন্তু পিতামহের প্রতি তার সশ্রদ্ধ ভাব। কিন্তু যুদ্ধ তো অনাসক্ত হয়েই লড়তে হয়। কিন্তু তোমাদের সব ভাইয়েরই পিতামহের উপর অত্যন্ত স্নেহ এবং সম্ভ্রম ভাব আছে। সেইজন্য তোমরা তাঁকে বধ করার উপযুক্ত নও।'

'কেবল আমিই এই কাজ করতে পারি, কেন না আমি সব দ্বন্দ্ব থেকে বিমুক্ত। সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, মঙ্গল-অমঙ্গল আমার কাছে সবই সমান। বাঘে আর হরিণে আমি কোনো ভেদ দেখি না, কেন না আমি শুভ-অশুভের ভেদকে ভেঙে ফেলেছি। আমার পক্ষে কর্তব্য পালন ছাড়া অন্য কোনো রকমের আসক্তি নেই।

'যদি অর্জুন পিতামহকে না মারতে পারে, তা হলে আমাকেই এ কাজ করতে হবে।'

যুধিষ্ঠিরের চোখে জল এসে গেল। তিনি বললেনঃ 'কৃষ্ণ এ সবই সত্যি, কিন্তু আমি তোমার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের নিমিত্ত হব না কখনও। আমার অভিমত হচ্ছে পিতামহের পায়ে পড়ে' আমরা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করি যে পিতামহ! আপনার মৃত্যু কিভাবে হতে পারে?'

এই প্রস্তাব সকলেরই পছন্দ হল এবং অর্ধ-রাত্রি কেটে যাবার পর অর্থাৎ

মাঝরাতের পর পাণ্ডবরা কৃষ্ণের সঙ্গে পিতামহের শিবিরে গিয়ে ঢুকে পড়লেন।

শিবির শূন্য নিস্তব্ধ ছিল। দলবল শুদ্ধ সবাই পিতামহের কাছে পেঁছে তাঁর চরণে নিপতিত হলেন। ভীষ্ম আপন পৌত্রদের দেখে অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে উঠলেন এবং বললেনঃ 'কৃষ্ণ! তোমাকে আর এই সব বাচ্চাদের দেখে আমার বড় আনন্দ হল।' সবাইকে আলাদা আলাদা আশীর্বাদ দিয়ে পিতামহ বললেনঃ 'অর্জুন! যুদ্ধে তোমার পরাক্রম দেখে আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়েছে। কিন্তু এখন বলো তো, এত রাত হয়ে গিয়েছে, এখন তোমরা সবাই কেন এলে?' যুধিষ্ঠির দুঃখে অবসন্ন ছিলেন, তিনি বললেনঃ 'পিতামহ! আপনি বলেছিলেন যে জয় আমারই হবে কিন্তু যতক্ষণ আপনি এই ঘোর যুদ্ধ করতে থাকবেন, ততক্ষণ আমাদের জিতবার কোনো আশাই নেই।' একটু থেমে, চোখে জল ঝরিয়ে, যুধিষ্ঠির আবার বললেনঃ 'পিতামহ! আপনার মৃত্যুতে আমার অত্যন্ত শোক হবে। কিন্তু দ্বিতীয় উপায়ই বা কি আছে? আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা, প্রীতি, পূজ্যভাব থাকা সত্ত্বেও আমি আপনার মৃত্যুর জন্য উৎসুক। এখন আপনিই বলুন আমার এই ইচ্ছা কি করে পূরণ হবে।' পিতামহ বললেনঃ 'পুত্র! তুমি ঠিকই বলেছ। আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের জয়লাভ অসম্ভব। তবে আমি বেঁচে থাকতে চাই না। আমি তাড়াতাড়ি মরতে চাই। তবে আমাকে বধ করাও অনায়াসসাধ্য নয়। আমি মৃত্যুর জন্য সতৃষ্ণ হয়ে রয়েছি কিন্তু আমার এই অমরত্বই আমার পক্ষে কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছে। তুমি আমার মরণের পথ বা উপায় জিজ্ঞাসা করে ভাল করেছ। দুজন মানুষই আমাকে বধ করবার শক্তি ধরে। এক তো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আর দ্বিতীয় হল অর্জুন। এই দুজনের একজনও যদি আমাকে মেরে ফেলে তা হলে আমি সব দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাই।' অর্জুন এই শুনে কাঁদতে লাগল। পিতামহ বললেনঃ 'বৎস! শোনো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি যুদ্ধে ব্যাপৃত আছি ততক্ষণ আমি অজেয়। কিন্তু আমি যদি শস্ত্র ত্যাগ করে দিই তা হলে আমাকে বধ করা অনায়াস সাধ্য। এর একটিই পথ আছে। আমি কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি না। অথবা যে পুরুষ পূর্ব জন্মে স্ত্রী ছিল কিম্বা কোনো পুরুষের যদি স্ত্রীবাচক নামও হয় তো তার সঙ্গে আমি লড়ি না। এই দিক ভেবে তুমি যদি শিখণ্ডীকে আমার সামনে আনো, তা হলে আমি শস্ত্র ত্যাগ করে দেব। শিখণ্ডী পূর্ব জন্মে স্ত্রীলোক ছিল। কাশীর রাজার মেয়ে অম্বাই এখন শিখণ্ডীর রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। শিখণ্ডী আমার সামনে এলে আমি ধনুর্বাণ ত্যাগ করে যুদ্ধ থেকে উপরত হয়ে যাব। অর্জুন! তুমি এই শিখণ্ডীর পিছনে থেকো।

যে-ই আমি অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করে যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে যাব, তুমি আপন বাণ দিয়ে আমাকে বিদ্ধ করে ফেলো। মনে রেখো, তোমাদের সবাইয়ের উপর আমার আশীর্বাদ আছে। এখন যাও এবং বিজয় লাভ করো। আমিও মরে সুখী হব।'

এতখানি সব কথা বলার পর, ভীষ্মের চেহারার উপর প্রসন্নতা এবং তেজোদীপ্তি যেন ছেয়ে গেল। তিনি যেন স্বস্তি ও শান্তি পেলেন।

কৃষ্ণ হেসে বললেনঃ 'পিতামহ! প্রাণত্যাগ করে দাও ও সুখী হয়ে যাও।'

অর্জুন সব শুনে বললঃ 'কৃষ্ণ! এ তো কুকর্ম, আমি তা কেমন করে করব?' কৃষ্ণ বললেনঃ 'অর্জুন! এই ক্ষত্রিয়-ধর্ম তোমাকে পালন করতেই হবে। একে ধর্ম এবং কর্তব্য বলে মনে করো এবং বিনা দ্বিধায় যুদ্ধ করো।' অর্জুন মেনে নিল এবং সবাই পিতামহের শিবির থেকে দুঃখিত চিত্তে অথচ সন্তুষ্ট হয়েই ফিরলেন।

ভীষ্ম ও অভিমন্যুর মৃত্যু

যুদ্ধের দশম দিনের সকালে সূর্য উদয় হল। ভীষ্ম খুশি ছিলেন। এইজন্য খুশি ছিলেন যে তাঁর দেহত্যাগ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু অর্জুনের মন উদাস ছিল। সে এই কারণে উদাস বা উতলা ছিল যে পিতামহের বধ তারই হাত দিয়ে হবে। অর্জুন বলল : 'কৃষ্ণ! আমি এত দিন ধরে লক্ষ্য করছি যে যে-ই শিখণ্ডী পিতামহের সামনে আসে, অমনি পিতামহ যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে যান। আজ পিতামহ যা বলেছেন, আমি তাই করব। শিখণ্ডীকেই সামনে রাখব এবং পিতামহের ইচ্ছানুসারে তাঁকে বধ করব। কৌরব-সেনার হাত থেকে শিখণ্ডীকে আমরা সবাই রক্ষা করতে থাকব।

কৌরবদের সৈন্য অসুর-ব্যূহ রচনা করেছিল এবং পাণ্ডবেরা দেব-ব্যূহ। যুদ্ধ খুব জোরের সঙ্গে সুরু হয়ে গেল। পিতামহের বাণ-বর্ষণে পাণ্ডব-সেনা বিধ্বস্ত হয়ে যেতে লাগল। দুর্যোধন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল, কেননা সে মনে করল তা হলে পাণ্ডব এবার বিনষ্ট হতে চলেছে। দুর্যোধন পিতামহের আকৃতিতে এক আশ্চর্য প্রসন্নতাও লক্ষ্য করল।

ইতিমধ্যে শিখণ্ডী ভীষ্মের দিকে আক্রমণ করে ধেয়ে গেল। তাকে দেখামাত্র ভীষ্ম বললেন : 'শিখণ্ডী! তুমি পুরুষ নও। আমার কাছে তুমি স্ত্রীলোকই। আমি তোমার সঙ্গে কখনই লড়তে পারি না।' শিখণ্ডী বলল : 'ভীষ্ম! তুমি যাই বলো আর তাই বলো আমি না লড়ে পিছু হটব না।' শিখণ্ডী এই বলে ভীষ্মের উপর বাণ-বর্ষণ আরম্ভ করে দিল। কিন্তু ভীষ্ম তার কোনো প্রত্যুত্তর দিলেন না। কৌরবেরা পিতামহের এই বিরক্তি দেখে নিজেরাই শিখণ্ডীর উপর বাণ-বর্ষণ করতে আরম্ভ করল, ওদিকে পাণ্ডব-সেনাও শিখণ্ডীকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুতই ছিল।

দুর্যোধন পিতামহকে বলল: 'পিতামহ! এ কী করছেন? যুদ্ধ থেকে কি হটে, যাচ্ছেন, বিরত হচ্ছেন? যদি আজ আপনি পাণ্ডবদের নাশ না করেন, তা হলে আমারই বিনাশ সমুপস্থিত।' ভীষ্ম বললেন: 'দুর্যোধন! যুদ্ধের আরম্ভের সময়ই তোমাকে বলে দিয়েছিলাম যে তোমার বিনাশ ঘটবে। আমি তোমাকে বলেছিলাম যে আমি পাণ্ডব সেনাদের নাশ করে দেব। কিন্তু আবারও পুনরুক্তি করে বলছি যে পাণ্ডবদের কেশাগ্রও আমি বাঁকাতে বা ছুঁতে পারব না। অর্জুন আমাকে বধ করবে কিন্তু আমি অর্জুনকে ছোঁবও না। দেবতারাও পাণ্ডবদের হারাতে সক্ষম নন, কারণ তাদের রক্ষক হচ্ছেন কৃষ্ণ। আজ আমি মরে তোমার ঋণ থেকে মুক্ত হতে চলেছি। আমার এতেই তৃপ্তি। এইটি নিশ্চয় জেনে নাও।'

দ্রোণ নিজের পুত্র অশ্বত্থামাকে বললেন: 'পুত্র! আমি দুর্লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। আজ কোনো বড় দুর্ঘটনা ঘটবে।' পিতামহ যুধিষ্ঠিরকে বললেন: 'পুত্র! এবার তাড়াতাড়ি করো। আমাকে এই শরীর থেকে মুক্ত করো।' এর পর পাণ্ডবরা শিখণ্ডীকে আগিয়ে দিল। অর্জুন শিখণ্ডীর পিছনে রইলেন। শিখণ্ডীর বাণ-বর্ষণের কোনো উত্তর দিলেন না পিতামহ এবং নিজের ধনুর্বাণ ত্যাগ করে তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত হলেন।

ভীষ্ম নিজের পূর্ব জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং মনে মনে বলতে লাগলেন স্বগতোক্তিরূপে: 'আমি সবাইকে হারাতে পারি কিন্তু এই পাণ্ডবদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছে। এদের জয় হোক, এই আমার কামনা। আমার জীবনের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন আমার দেহ ত্যাগ করা উচিত।' দেবতারাও উপর থেকে বলে উঠলেন: 'ভীষ্ম! তোমার এ সংকল্প মঙ্গলময়।'

শিখণ্ডী বাণ-বর্ষণ করতে লাগল। ভীষ্ম তাঁর ধনুক এক পাশে রেখে দিয়েছিলেন। এই দৃশ্য দেখে কৃষ্ণ বললেন: 'অর্জুন! এবার এই যজ্ঞকে শেষ করো।' এই শুনে অর্জুনের অত্যন্ত সন্তাপ জন্মাল। কিন্তু সন্তপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সে ভীষ্ম পিতামহের উপর হাজারও বাণ-বর্ষণ করে তাঁর শরীরকে ছিন্নভিন্ন করে দিল।

ভীষ্ম যখন পড়লেন তখন মাটিতে নয়, কিন্তু শরশয্যার উপরই। শরশয্যার উপর পড়ে থেকে ভীষ্ম বললেন: 'আমি আহত হয়ে পড়েছি বটে কিন্তু মরব উত্তরায়ণে। দুর্যোধন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। কৌরব এবং পাণ্ডবের সেনা স্তব্ধ হয়ে ভীষ্মকে দেখতে লাগল। দুই তরফেরই বীরেরা একসঙ্গে কাঁদছিলেন।

শেষে ভীষ্ম বললেন: 'আমার মাথাটা ঝুলে আছে, সেজন্য আমার কষ্ট

হচ্ছে। আমাকে বালিশ এনে দাও।' দুর্যোধন দৌড়ে গিয়ে একটি নরম তাকিয়া আনলেন কিন্তু ভীষ্ম বললেনঃ 'দুর্যোধন! এ বালিশ রণক্ষেত্রের যোগ্য নয়।' আবার অর্জুনকে সম্বোধন করে বললেনঃ 'পুত্র! তুমি আমাকে বালিশ দাও।' তাই শুনে অর্জুন পিতামহের মাথায় আর একটি বাণ নিক্ষেপ করে মাথাটি খাড়া করে দিল। দুর্যোধন ভাল ভাল দক্ষ চিকিৎসকদের ডাকল যাতে পিতামহের চিকিৎসা হয়, কিন্তু ভীষ্ম তাদের কাউকে নিজের কাছে আসতে দিলেন না। ফের দুর্যোধনকে বললেনঃ 'দুর্যোধন! কৃষ্ণ আর অর্জুন এঁরা দুজন নর এবং নারায়ণের অবতার। তোমার জয় হবার আর এখন কোনো সম্ভাবনা নেই। এখনও তুমি এদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও।' দুর্যোধন শুনল কিন্তু তাতে তার উপর কোনো প্রভাব পড়ল না।

ভীষ্ম চোখ বন্ধ করে নিলেন। শর-শয্যায় শুয়ে শুয়ে মহাত্মা ভীষ্ম সংসার এবং সংসারের সমস্ত দুঃখকে ভুলে ঈশ্বরের ধ্যানে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

ভীষ্ম পিতামহের ইচ্ছা-মৃত্যুর বর ছিল। এইজন্য স্বেচ্ছায়ই তিনি সংসার-লীলা সমাপ্ত করলেন। মাটিতে এক সূর্য যেন অস্ত গেল। কিন্তু পিছনে তার আলো রেখে গেল। কৌরব-পাণ্ডব দুজনেই কাঁদতে লাগলেন। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন। মহাভারতের প্রথম দৃশ্যের উপর এইভাবে যবনিকাপাত ঘটেছে।

ভীষ্ম পিতামহ যখন যুদ্ধে নিপতিত হলেন, তখন দুর্যোধন হতাশ হয়ে গেল। গভীর ভাবনা-চিন্তা ও মন্ত্রণার পর এই স্থির হল যে কৌরব-সেনার পরিচালনার ভার এবার দ্রোণাচার্যকে অর্পণ করা হোক। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে দ্রোণাচার্যকে সেনাপতি করে তাঁর অভিষেক সম্পন্ন হল। দ্রোণাচার্য দুর্যোধনকে আশ্বাস দিলেন যে আমি পাণ্ডবদের বিনাশ সাধনের জন্য সব-রকম চেষ্টা করব।

দ্রোণ খুব জোরের সঙ্গে লড়তে লাগলেন এবং তিনি পদ্ম-ব্যূহ রচনা করলেন, যা অভেদ্য বলে মনে করা হত। একে ভেদ করতে সক্ষম একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন অথবা এঁরা ছাড়া কেবল দুজন মহারথীই ছিলেন। যেদিন এই ব্যূহ-রচনা করা হল সেদিন অর্জুন আর দুজন মহারথী অন্য দিকে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। সেই কারণে ব্যূহ ভেদ করতে পারে এমন কোনো মহারথী পাণ্ডবদের সেনায় সেদিন উপস্থিত ছিল না।

পদ্ম-ব্যূহের মাথার দিকে স্বয়ং দ্রোণ ছিলেন এবং তিনি এমন সাংঘাতিক-ভাবে পাণ্ডব-সেনা উজাড় করে দিচ্ছিলেন যে যুধিষ্ঠির একেবারে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করা যায়। কেবল একমাত্র বালক অভিমন্যু

ছিল, যে ব্যূহ ভেদ তো করতে পারত কিন্তু তার ভিতরে প্রবেশ করার পর ব্যূহ থেকে বেরিয়ে ফিরে আসতে জানত না। এই ছিল এক সমস্যা।

কিন্তু সৈন্যদের নাশ হতে দেখে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব সকলে মিলে স্থির করলেন যে ব্যূহ ভেদ করার ভার অভিমন্যুর উপরই অর্পণ করা হোক। তার পক্ষে ভিতরে গিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার কৌশল জানা ছিল না বটে কিন্তু পাণ্ডব মহারথীরা এই বলে মনকে বোঝাল যে অভিমন্যু যখন ব্যূহ ভেদ করে ভিতরে ঢুকবে তখন আমরাও তার পিছন পিছন ঢুকে যাব এবং তাকে ঠিক রক্ষা করতে পারব।

যুধিষ্ঠির এবার অভিমন্যুকে বললেনঃ 'পুত্র! তোমার পিতা তো এখন অন্য দিকে যুদ্ধে আটকে আছেন আর এদিকে পদ্ম-ব্যূহ রচনা করে আচার্য দ্রোণ সৈন্যদের শেষ করে দিচ্ছেন, এইজন্য তুমিই এখন ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করো। আমি তোমাকে এই বিপদে ফেলতে চাই না, কিন্তু দ্বিতীয় আর কোনো পথও তো নেই। আমরা সবাই তোমার পিছু-পিছু ব্যূহে ঢুকে পড়ব এবং সমস্ত বিপত্তি থেকে তোমাকে রক্ষা করে চলব।'

অভিমন্যু বীর ছিল এবং তার এ বিষয়ে গর্ববোধ হল যে এমন এক বিপজ্জনক দায়িত্বের কাজ তার উপর সঁপে দেওয়া হচ্ছে। অভিমন্যু এই ভার সানন্দে স্বীকার করে নিল।

সে তখন প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করতে করতে ব্যূহ ভেদ করে ঢুকে গেল, কিন্তু অন্য পাণ্ডবরা যখন তার পিছু পিছু ঢুকতে গেলেন, তখন জয়দ্রথ ঘোর যুদ্ধ করে ব্যূহের দ্বার বন্ধ করে দিলেন এবং সব পাণ্ডবরা বাইরেই রয়ে গেলেন। পরে কি হল তা সবারই জানা। অভিমন্যু প্রাণপণে লড়লেন কিন্তু ছয়জন বড় বড় মহারথীরা মিলে একেলা অভিমন্যুকে মেরে ফেললেন।

এ এক ভয়ানক অধর্ম ঘটল, যা সমস্ত কুরুবংশকে কলঙ্কিত করল। অর্জুন যখন সন্ধ্যার সময় শিবিরে ফিরে এলেন এবং এই দুর্ঘটনার খবর শুনলেন তখন তাঁর ক্রোধের আর সীমা-পরিসীমা রইল না।

অভিমন্যুর বধ কিভাবে ঘটল, সে-কথা যুধিষ্ঠির এবং সব ভাইয়েরা আলাদা আলাদাভাবে অর্জুনকে শোনালেন। যখন সব ভাইয়েরা বিবরণ দেওয়া শেষ করলেন, তখন অর্জুন একবার তো অজ্ঞান হয়েই পড়ে গেলেন, পরে আবার যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন রাগের চোটে তাঁর সারা দেহ কাঁপতে থাকল।

তিনি বললেনঃ 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে কাল সন্ধ্যার প্রথম দিকেই জয়দ্রথকে মেরে ফেলব। সারা কৌরবরা কোন্ ছার, স্বয়ং দেবাদিদেব শঙ্করও যদি জয়দ্রথকে রক্ষা করতে আসেন, তা হলেও তাকে জীবিত রাখতে সক্ষম

হবেন না। আমি এই গাণ্ডীব হাতে নিয়ে শপথ করে বলছি যে হয় জয়দ্রথকে আমি কাল সূর্যাস্তের আগে আগেই মেরে ফেলব, আর যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তা হলে আমি স্বয়ং অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে নিজে ভস্ম করে ফেলব।'

অর্জুনের এই প্রতিজ্ঞা শুনে পাণ্ডবদের শিবিরে নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল এবং কৌরবদের শিবিরে আতঙ্ক ঘিরে এল। যদি জয়দ্রথ না মারা যায় তা হলে পাণ্ডবদের পক্ষে অভিমন্যু তো গিয়েছেই, অর্জুনকেও তারা হারিয়ে বসবে। পাণ্ডবদের পক্ষে এ এক নতুন সংকট উপস্থিত হল।

জয়দ্রথ যদি না মরে, তা হলে? অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব ধনুতে টঙ্কার দিলেন, যার গুঞ্জন চারিদিক ছেয়ে গেল।

সেই রাতে পাণ্ডবদের শিবিরে কারুর ঘুম এল না আর কৌরবরাও কেউ ঘুমালেন না। কৌরবরা এই ভেবেছিল যে অভিমন্যুর শোকের আঘাতে অর্জুন হতাশ ও বলহীন হয়ে যুদ্ধ থেকে একেবারেই সরে যাবেন। কিন্তু গাণ্ডীবের টঙ্কার ও কৃষ্ণের পাঞ্চজন্যের নাদধ্বনি শুনে কৌরবরা ঘাবড়ে গেল। দূতেরা এসে কৌরবদের অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা শোনাল, তাতে জয়দ্রথ ভয়ে বিহ্বল হয়ে উঠল। সে বললঃ 'আমার বাঁচবার একটাই উপায় আছে যে আমি এখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাই। অর্জুন ধার্মিক পুরুষ, এজন্য পলাতককে সে মারবে না।'

কিন্তু দুর্যোধন এবং অন্যান্য কৌরবরা জয়দ্রথকে সাহস জোগাল এবং বলল যে সমগ্র কৌরব সৈন্য তোমাকে রক্ষা করবে, অতএব তুমি এত ভয়ে ভীত হচ্ছ কেন?

এদিকে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন কৃষ্ণ। অর্জুনের জয়ের সব দায়িত্ব শ্রীকৃষ্ণের উপরই ছিল। এইজন্য জয়দ্রথের বধও যেন তাঁরই দায়িত্ব। তিনি অর্জুনকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলেনঃ 'অর্জুন! তুমি তাড়াতাড়িতে প্রতিজ্ঞা করে বসলে, আমাকে তো একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। যাক্, যা হবার হয়ে গিয়েছে, তার থেকে এখন সরে আসার কোনো অবকাশও নেই আর।'

অর্জুন বললঃ 'কৃষ্ণ! আমি সুভদ্রাকে মুখ দেখাতে পারছি না। তুমিই গিয়ে সুভদ্রাকে সান্ত্বনা দাও।'

সুভদ্রা তো মড়ার মত পড়েছিল। সে-ও কৃষ্ণকে তিরস্কার করে বলে উঠলঃ 'তুমি বেঁচে থাকতে আমার ছেলে কেন মারা গেল?' কৃষ্ণ বললেনঃ 'সুভদ্রা! অভিমন্যুকে অন্যায়ভাবে মারা হয়েছে। আমি তার প্রতিশোধ নেব,

তুমি কান্না থামাও।' এই সান্ত্বনা দিয়ে কৃষ্ণ নিজের মাথার উপর আরও দায়িত্ব চাপালেন।

রাত্রে কৃষ্ণের ঘুম এল না। খাটের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে শুয়ে নানা চিন্তায় কেবল এ-পাশ ও-পাশ করতে থাকেন। সূর্য তখন দক্ষিণায়নে, তাই দিন হত ছোট এবং সূর্যাস্তের আগে আগেই জয়দ্রথের মরণ হওয়া চাই।

মাঝ রাতে শ্রীকৃষ্ণ নিজের সারথি দারুককে ডাকলেন এবং বললেন: 'দারুক! এক বিশেষ সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে এই যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করব না এবং যুদ্ধ করব না, কিন্তু অর্জুন ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না। তাই জয়দ্রথকে মারবার জন্য যদি আমাকে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতেও হয় তা-ও ভাঙব। যদি দ্রোণ আর কর্ণকে মারতে হয় তা-ও আমি মারব। দরকার হয় তো সুদর্শন চক্র এবং কৌমোদকী গদারও সদ্ব্যবহার করব। তাই দারুক! আমার রথ প্রস্তুত করে সুসজ্জিত করো। আমার সব অস্ত্র-শস্ত্র রথে সাজিয়ে রাখো, গরুড়ধ্বজ পতাকাও লাগিয়ে দাও। আমার ঘোড়াদের রথে জুতে দাও, ঘোড়াদের কবচ পরিয়ে দাও। তুমিও কবচ পরে নাও।'

দারুক চুপচাপ সব শুনে বলল: 'প্রভু যা আজ্ঞা দিলেন সবই আমি করব যখন অর্জুনের মাথার উপর আপনার হাত আছে তখন তার জয়ের সম্বন্ধে কোনো চিন্তা বা আশঙ্কাই নেই।'

দ্রোণ ও জয়দ্রথ

মহাভারত যুদ্ধের চতুর্দশ দিন আরম্ভ হল এবং সূর্যাস্ত হবার আগেই জয়দ্রথকে বধ করতে হবে। যুধিষ্ঠির অস্থির বিকল বোধ করছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেনঃ 'কৃষ্ণ! আমার আধার বা আশ্রয় তো তুমিই। অর্জুন ঘোর প্রতিজ্ঞা করেছে, এখন তা পূরণ করা তোমার হাতে।' কৃষ্ণ বললেনঃ 'যুধিষ্ঠির! চিন্তা কোরো না, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।'

অর্জুন যুদ্ধে বেরুবার আগে যুধিষ্ঠিরের চরণ স্পর্শ করল এবং আশীর্বাদ নিয়ে রথে উঠল। যে ঘোর যুদ্ধ হল, তার বিবরণ মহাভারতে আছে।

কৌরবের সৈন্য জান-প্রাণ দিয়ে জয়দ্রথকে রক্ষা করার কাজে ব্যাপৃত ছিল। তা সত্ত্বেও অর্জুন কৌরব-সেনাকে ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে চলেছিল। এত ভীষণ সংগ্রাম হল যে অর্জুনের ঘোড়ারাও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কৃষ্ণ বললেনঃ 'অর্জুন! ঘোড়ারা ঘায়েল হয়ে পড়েছে, ক্লান্তও বটে, ওদের জল খাওয়ানো এবং বিশ্রাম করানো দরকার, আবার এদিকে জয়দ্রথের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারেও এখনও যথেষ্ট দূরত্বের সমাধান করতে হবে।' অর্জুন এই সংকটের কথা উপলব্ধি করে পায়ে হেঁটেই যুদ্ধ করা স্থির করল এবং রথ থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যুদ্ধ করতে লাগল।

শ্রীকৃষ্ণ বললেনঃ 'অর্জুন! এখানে তো জলও পাওয়ার উপায় নেই তা হলে কী করা যায়? ঘোড়াদের জল খাওয়ানো বিশেষ দরকার, কিন্তু কোথা থেকে জল খাওয়াব?'

এই ব্যাপারে ব্যাসদেব এক অলৌকিক বর্ণনা করেছেন যে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রেই বাণ চালিয়ে এক সরোবর সৃষ্টি করে ফেললেন। এই যুদ্ধে সাত্যকি এবং ভূরিশ্রবার যুদ্ধেরও বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে এত

বিপর্যস্ত করলেন যে সে বেহুঁশ হয়ে গেল। ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে মারতেই চাইছিল, এবং মেরেই ফেলত, ইতিমধ্যে অর্জুন লাফিয়ে পড়ল মাঝখানে এবং বাণ দিয়ে ভূতিশ্রবার হাত কেটে দিল। এ-ও ধর্মযুদ্ধের নীতি বিরুদ্ধ কাজ, কিন্তু সাত্যকিকে তো বাঁচাতে হবে।

যখন ভূরিশ্রবা হাত হারিয়ে অসহায় হয়ে হতাশ হয়ে পড়ল, তখন সে অর্জুনকে বলল যে আমি তো এখন যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে দেহত্যাগ করব, আর লড়ব না। এই বলে সে কুশাসন বিছিয়ে তার উপর পদ্মাসনে বসে ঈশ্বরের ধ্যান করতে করতে যোগের দ্বারা দেহত্যাগ করতে উদ্যত হতে না হতেই সাত্যকি তলোয়ার দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলল। তার এই কাজের সবাই প্রচুর নিন্দা করল। যে যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে গিয়েছিল, যুদ্ধ করা ছেড়ে দিয়েছিল, তাকে মারা মোটেই ধর্মের কাজ হয়নি।

অর্জুনেরও এ কাজ ভাল লাগেনি, কিন্তু দেবতারা সাত্যকির সমর্থনে এক বিচিত্র যুক্তি পেশ করলেন। ভূরিশ্রবা সাত্যকির হাতে মরবে এই ছিল বিধিলিপি, তাকে সাত্যকি কি করে খণ্ডাবে? এ এক অদ্ভুত আজব রায় কিন্তু দেবতাদের এই বিধানের পর সবাই চুপ করে গেল এবং এ কাহিনী এখানেই শেষ হয়ে গেল।

আসল যুদ্ধ তো জয়দ্রথকে মারার জন্যই হচ্ছিল। সূর্যাস্ত হতে চলেছিল অথচ তখনও অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করে উঠতে পারেনি এই কারণে অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ দুজনেরই চিন্তা হতে লাগল। যেমন যেমন অর্জুনের রথ এগিয়ে চলল তেমন তেমন কৌরব সেনারাও জয়দ্রথকে ঘিরে তাকে রক্ষার জন্য সজাগ হয়ে উঠল।

শেষে অর্জুনের রথ একেবারে জয়দ্রথের সামনে এসেই উপস্থিত হল। অর্জুন জয়দ্রথের উপর বাণ-বর্ষণ আরম্ভ করল এবং জয়দ্রথও অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে চলল। সূর্যের তেজ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল, তাতে রক্তিমাভা এসে গিয়েছিল। যদি আরও কিছুক্ষণ জয়দ্রথ বেঁচে থাকে, তা হলে তো অর্জুনকে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে ভস্ম হয়ে যেতে হবে। আর অর্জুন গেলে পাণ্ডবও শেষ। এই ছিল ভয়ঙ্কর বিকট সমস্যা।

কৃষ্ণের সম্মুখে যেন এই সমগ্র ভয়াবহ পরিস্থিতি একেবারে বাস্তব হয়ে ফুটে উঠছিল। তিনি বললেনঃ 'অর্জুন! জয়দ্রথকে সন্ধ্যার আগে বধ করা অসম্ভব। এর দুঃখজনক পরিণাম যে কী হতে পারে, তা-ও আমি জানি, সেইজন্য আমি আমার কৌশলকে কাজে লাগাব। যখন আমি বলব 'মারো' তখন তুমি নিজের সবচেয়ে জোরালো অস্ত্র প্রয়োগ কোরো। আমার আজ্ঞা ঠিক মত পুরোপুরি পালন কোরো, এই এখন একমাত্র উপায়।'

শ্রীকৃষ্ণ নিজের সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করলেন এবং তাকে আজ্ঞা দিলেন যে সে যেন সূর্যকে ঢেকে রাখে। সূর্যকে ঢাকা মাত্রই অন্ধকার হয়ে গেল. কৌরবদের উল্লাসের আর সীমা রইল না এবং অর্জুনও সব আশা ছেড়ে দিলেন। জয়দ্রথের খুশির তো কোনো শেষই ছিল না। অন্ধকার হতেই সূর্য অস্ত হয়ে গিয়েছে কিনা এই ব্যাপারটা যাচাই করার জন্য জয়দ্রথ চোখ দুটি সূর্যের দিকে তুলল এবং ঠিক সেই সময় কৃষ্ণ বলে উঠলেনঃ 'অর্জুন! মারো।'

অর্জুন তখন পাশুপত অস্ত্র ছুড়লেন এবং জয়দ্রথের মাথাকে তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'অর্জুন! পাশুপতকে প্রেরিত করো যেন সে জয়দ্রথের মাথাটি তার বাবার কোলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয়।' কৌরবরা দেখল যে অর্জুনের বাণ জয়দ্রথের মাথাটি নিয়ে তাব বাবার দিকে চলেছে। জয়দ্রথের মাথা গিয়ে তার বাবার কোলে পড়ল। তখন তার বাবা সায়ংকালীন সন্ধ্যাবন্দনা পূজো করছিলেন। যে-ই তাঁর সান্ধ্য-পূজা শেষ হল. অমনি জয়দ্রথের মাথা তার পিতার কোলে পড়ল। পড়তেই তার পিতার মাথাও হাজার টুকরো হয়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রকে ফিরিয়ে নিলেন এবং ফিরিয়ে নিতেই সূর্য পূর্ণ প্রকাশে আকাশে ফুটে উঠল। কৌরব সৈন্যদের মধ্যে শোক ছেয়ে গেল। এইভাবে জয়দ্রথের বধ হয়ে গেল।

এই সমগ্র কাহিনীতে কিছু বিবরণ অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ এবং বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণ জয়দ্রথকে মারবার জন্য নিজের প্রতিজ্ঞাও ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন এবং শেষে সূর্যের উপর ঢাকনি দিয়ে বা আবরণ রচনা করে নকল সূর্যাস্ত সৃষ্টি করে জয়দ্রথকে বিভ্রান্ত করে, ভুলের মধ্যে ফেলে মারালেন। তাৎপর্য হল যে জয়দ্রথকে 'যেন তেন প্রকারেণ' ঠিক বা ভুল, সাধু বা অসাধু উপায়ে মারাই শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্য বা অভীষ্ট ছিল।

ছল-কপটতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার তো করা হলই। তারই সঙ্গে সঙ্গে জয়দ্রথের নষ্টামিকেও শেষ করে দেওয়া হল। পৃথিবীর ভার হালকা করবার ছিল এবং কৃষ্ণ সেই কাজ অত্যন্ত দ্রুত এবং কৌশলের সঙ্গে করে চললেন।

জয়দ্রথ মারা যাবার পর কৌরব সৈন্যদের মধ্যে ঘোর নৈরাশ্য ছেয়ে গেল। দুর্যোধনের মনে হল পান্ডবদের প্রতি স্নেহের দরুণ দ্রোণ তাঁর পুরো শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করছেন না। দুর্যোধন নিজের এই ক্ষোভ বেদনার কথা দ্রোণাচার্যকে জানাল এবং নিজের আশঙ্কা প্রকাশ করল যে যদি আপনি সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে না লড়েন তা হলে বিজয়-লাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব। দ্রোণাচার্য





দুর্যোধনকে সান্ত্বনা দিলেন এবং আশ্বস্ত করলেন যে পাণ্ডবদের বিনাশ-সাধনের জন্য আমি পুরোপুরি চেষ্টা করব।

সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে গুরু দ্রোণাচার্য এবার অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলেন।

ধর্ম-যুদ্ধের এই হচ্ছে নিয়ম যে দৈবী অস্ত্রাদি, যেমন ব্রহ্মাস্ত্র ইত্যাদির বিশেষ কারণ ছাড়া যেন প্রয়োগ না করা হয়। বিশেষ করে এই জাতীয় অস্ত্র খুব বিশিষ্ট যোদ্ধার বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হত। কিন্তু দ্রোণাচার্য, সাধারণ সৈনিকদের উপরও এই অস্ত্রের প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে দিলেন। এক চোটেই দ্রোণের হাতে প্রায় বিশ হাজার পাণ্ডব সৈনিক হতাহত হয়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেনঃ 'যুধিষ্ঠির! দ্রোণ যে একেবারে রাক্ষসের মত লড়ছে এবং ধর্ম-যুদ্ধ তো করছে না। এতে বিজয় লাভ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব এবং যদি এই রীতিতে যুদ্ধ চলতে থাকে তা হলে পাণ্ডব-সেনার মধ্যে একটি সৈনিকও বেঁচে থাকবে না। তা হলে এমন কোনো উপায় করতে হবে যাতে কিনা দ্রোণ নিজেই যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে যান এবং সে-উপায় হল এই যে তাঁকে অশ্বত্থামার মৃত্যুর খবর জানানো হোক। যদি দ্রোণের এই বিশ্বাস হয়ে যায় যে অশ্বত্থামা সত্যি সত্যি মারা গিয়েছে, তা হলে শোকাতুর হয়ে তিনি যুদ্ধ করা ছেড়ে দেবেন।'

এই প্রস্তাব অর্জুন তো মেনে নিল কিন্তু যুধিষ্ঠিরের এই মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া মনঃপূত হল না। শেষ পর্যন্ত চাপে পড়ে যুধিষ্ঠিরও একমত হলেন।

পাণ্ডবদের সৈন্যের মধ্যে অশ্বত্থামা নামে একটি হাতি ছিল। তাকে মেরে ভীম দ্রোণাচার্যকে গিয়ে বললঃ 'গুরুদেব! অশ্বত্থামা মরে গিয়েছে।' শোনা মাত্র দ্রোণাচার্য অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কিন্তু জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আবার দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করতে লাগলেন এবং আবারও ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করতে লাগলেন।

ঋষি এবং দেবগণ, যাঁরা আকাশ থেকে যুদ্ধ দেখছিলেন, দ্রোণাচার্যের এই অধর্ম দেখে বললেনঃ 'দ্রোণাচার্য! তুমি এমন অধর্ম করছ কেন? এর চেয়ে বরং ভাল তোমার মৃত্যু হয়ে যায়। আমাদের দিকে তাকাও এবং অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করো। তুমি তো বেদ-বেদাঙ্গের জ্ঞাতা, বোদ্ধা লোক। তোমার মত ব্রাহ্মণের এই নিষ্ঠুরতা শোভা পায় না।'

আকাশবাণী শুনে দ্রোণাচার্যের উৎসাহ শিথিল হয়ে গেল, তিনি দমে গেলেন। নিজের সামনে যুধিষ্ঠিরকে দেখে দ্রোণাচার্য বললেনঃ 'বৎস! তুমি

ঠিক করে বলো তো অশ্বত্থামা বেঁচে আছে না সত্যি সত্যি মারা গিয়েছে।' দ্রোণের বিশ্বাস ছিল যুধিষ্ঠির কখনও মিথ্যা বলবে না।

যুধিষ্ঠির দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। তাতে শ্রীকৃষ্ণ বললেনঃ 'যুধিষ্ঠির! যদি দ্রোণাচার্য এইভাবেই লড়তে থাকেন তা হলে পাণ্ডব-সেনার একটি সৈনিকও জীবিত থাকবে না। দ্রোণাচার্য অধর্ম যুদ্ধ করে যাচ্ছেন, এইজন্য তোমার কর্তব্য হল যে তুমি অসত্য বলো। অসত্য আচরণ পাপ, কিন্তু এরকম অবস্থায় তা পাপ নয়।'

যুধিষ্ঠির এ কথা মেনে নিল। এইজন্য যখন দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন, তখন উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেনঃ 'অশ্বত্থাম মারা গিয়েছে।' কিন্তু আস্তে আস্তে তাতে এটুকুও জুড়ে দিলেন যে সে মানুষ অশ্বত্থামা, না ঐ নামের হাতি, তা ঠিক জানি না।' এই অসত্য বাক্য বলার সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের যে-রথ বরাবর মাটি থেকে চার আঙুল উপরে চলত তা মাটির মধ্যে বসে গেল।

যুধিষ্ঠির শেষ কথাগুলি এত মৃদু স্বরে বললেন যে দ্রোণ তা শুনতে পারলেন না এবং অশ্বত্থামার মৃত্যুর খবর বিশ্বাস করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

এইভাবে ভীষ্মের পরে দ্রোণেরও শেষ হল। ভীষ্ম গেলেন, জয়দ্রথ গেল, দুঃশাসন গেল এবং এখন দ্রোণাচার্যও গেলেন। কৌরব-সেনার মধ্যে গভীর নৈরাশ্য ছেয়ে গেল। দুর্যোধন হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

দ্রোণের মৃত্যুর পর খুব ভেবেচিন্তে সে যুদ্ধের ভার কর্ণের উপর সঁপে দিল কারণ এখন এই একমাত্র পথ ছিল। এমনিতে কর্ণ তো উপযুক্ত ছিলই। কিন্তু ধর্ম কৌরবদের বিপক্ষে। কৌরবরা বিজয় লাভের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ল।

পৃথিবীর ভার হালকা হয়ে চলেছে ক্রমশ আর এদিকে কর্ণও এখন সেই ধারায় এসে দাঁড়িয়ে যমের দুয়ারে যেন করাঘাত করতে চলেছে।

কর্ণের মৃত্যু

পনেরো দিনের যুদ্ধের মধ্যে দুই মহাযোদ্ধার বিনাশ ঘটে গেল। পিতামহও গেলেন, এবং আচার্য দ্রোণও গেলেন। কৌরবদের পক্ষে এ যেন ভয়ঙ্কর বজ্রপাতের ধারার মত। সেই রাতে কৌরবদের শিবিরে শ্মশানের শূন্যতা যেন ছেয়ে গেল. সবাই নিরাশ হয়ে পড়ল।

দুর্যোধন তাব সঙ্গীদেব এক পরামর্শ-সভা ডাকল। তাতে সে সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করল। সবচেয়ে আগে অশ্বত্থামা নিজের অভিমত সকলের সামনে উপস্থিত করলঃ 'নতুন সেনাপতি এমন হওয়া চাই, যিনি শক্তিমান হবেন, চতুর হবেন, দক্ষ হবেন এবং যিনি নিঃসংশয়ে বিজয়ী হবেন। দুর্যোধন! তোমার যোদ্ধাদের কোনো কমতি নেই। সেইজন্য হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। অমরা সবাই তোমাব জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তবে এই সেনাধ্যক্ষ পদের জন্য যদি যোগ্য ব্যক্তি কেউ থাকে সে হচ্ছে একমাত্র কর্ণ। ভীষ্ম এবং দ্রোণ. দুজনে যুদ্ধ করেছেন ঠিকই কিন্তু তাঁদের হৃদয়ে ছিল পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহ। এঁদের দুজনকেই ধর্মযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে মারা হয়েছে। তাঁদের আত্মা যুদ্ধে অনাসক্ত ছিল। কিন্তু কর্ণের কথা আলাদা। সে সমস্ত শক্তি দিয়ে লডবে। এইজন্য কর্ণকেই সেনানায়ক করা হোক।' এই প্রস্তাব দুর্যোধনের পছন্দ হল। সে কর্ণকে বললঃ 'রাধেয়! এখন তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। এই ভার আমি তোমাকেই সমর্পণ করতে চাই।'

দুর্যোধনের এই প্রস্তাব শুনে কর্ণের মনে উদ্দীপনা জেগে উঠল। সে বললঃ 'দুর্যোধন! আমি যে তোমার বিশ্বাসের পাত্র, এতে আমি বিশেষ তৃপ্তি বোধ করছি। আমি কালকের মধ্যে অর্জুনকে খতম করে পৃথিবীকে তোমার পায়ে সমর্পণ করে দেব।'

এরপর রাধেয় সেনানায়ক হয়ে গেলেন। ষোড়শ দিনের সকাল থেকে কর্ণ নিজের হাতে লাগাম ধরে যুদ্ধ আরম্ভ করল।

যুধিষ্ঠির দ্বিতীয় দিন কর্ণের ব্যূহ-রচনা দেখে দুঃখিত মনে অর্জুনকে বললেনঃ 'অর্জুন! দেখো, ষোল দিনে কত বদল হয়ে গেল। কৌরবদের কত বিনাশ হয়ে গেল। যে এক বিশাল সেনা ছিল এখন তার এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে। তুমি যদি কর্ণকে শেষ করে দাও, তা হলে ধরে নিতে পারো তুমি জয়ী হয়ে গিয়েছ।' অর্জুন তাঁর এই উক্তির সংগে একমত ছিল।

এখন কর্ণ খুব মেতে গিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। রাধেয়র বাণ-বর্ষণের সামনে পান্ডব-সেনার উপস্থিত হওয়া মানে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া। দুই পক্ষের যোদ্ধাই একে অপরের সংগে মুখোমুখি হচ্ছিল। দুই তরফেই প্রচুর হতাহত হল, কিন্তু প্রথম দিনের যুদ্ধে কোনো নিশ্চিত ফলাফল দেখা গেল না। দুই সেনা-শিবিরেই তাই না ছিল আনন্দ উল্লাস, না ছিল বিষাদ হতাশা। ষোড়শ দিনের এই যুদ্ধে শুধু দুর্যোধন নিরাশ বোধ করছিল, অর্জুন তখন জীবিত রয়েছে দেখে।

রাত্রিকালে রাধেয় দুর্যোধনের শিবিরে গেল। সে দুর্যোধনের নিরাশার কথা জানত। শিবিরে তখন দুর্যোধন একলাই ছিল। রাধেয় তাকে বললঃ 'দুর্যোধন! আমার খুব দুঃখ যে আমি আজ অর্জুনকে শেষ করতে পারিনি। কিন্তু কাল আমি অর্জুনের সংগে তুমুল যুদ্ধ করব। আমার সব কথা ভাল করে শোনো। আমি সব দিক দিয়ে অর্জুনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমি তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী। আমার প্রখ্যাত বিজয় নামক ধনু তার গান্ডীবের চেয়েও অনেক ভাল। কাল আমি অর্জুনকে শেষ করতে চাই কিন্তু আমার দিকে একটাই ঘাটতি বা কমতি আছে। অর্জুনের সারথিরূপে আছেন কৃষ্ণ. তিনি অত্যন্ত দক্ষ। কিন্তু আমার সারথি মোটামুটি সাধারণ ধরনের। তুমি যদি শল্যকে বুঝিয়ে আমার সারথি করে দিতে পার. তা হলে আমি অর্জুনের উপর বিজয় লাভ করতে পারি।' দুর্যোধন কথা দিল যে সে শল্যকে বুঝিয়ে তার সঙ্গী সারথি করে দিতে পারবে।

রাধেয় নিজের শিবিরে ফিরে এল। অনেক চেষ্টা করেও তার ঘুম এল না। কর্ণ নিশ্চিত বুঝেছিল যে তার জীবনের আজকেই শেষ রাত্রি। যেখানে কৃষ্ণ, বিজয় সেখানেই। শল্য সারথি হয়েও কৃষ্ণের সংগে মোকাবিলা করবে কেমন করে? রাধেয় এইরকম নানা ভাবনার তরংগে যেন ডুবে ছিল। সে নিজের দুই মায়ের কথা স্মরণ করল। রাধার জন্য তার বড় মমতা ছিল। আবার তার কুন্তীর কথাও মনে এল। তাঁর শান্ত মূর্তি ও স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি

তাকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। মাত্র অল্প সময়ই সে কুন্তীর সঙ্গে কাটিয়েছিল কিন্তু তবু তাকে সে ভুলতে পারেনি।

কর্ণের শক্তি ছিল। সে যুদ্ধ-বিশারদও ছিল। কিন্তু গুরুর শাপ ছিল যে সঙ্কট কালে সে মন্ত্রের স্মৃতি হারিয়ে বসবে এবং তার রথের চাকাও সংকট মুহূর্তে কাদায় আটকে যাবে এবং তাতেই তার মৃত্যু ঘটবে।

কিন্তু রাধেয়ের এজন্য কোনো চিন্তা ছিল না। সে জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যু যেন তার কাছে চিরনিদ্রার মতই ছিল। সে দুর্যোধনের ঋণ থেকে মুক্ত হতে চাইছিল। মৃত্যুই ছিল তার একমাত্র পথ। মৃত্যুর পর পাণ্ডবদের বারম্বার অপমান কবার এই কুকর্ম তো আর তাকে করতে হবে না। তার এরই একান্ত অভিলাষ ছিল। সে জানত যে কৃষ্ণের তার উপর পূর্ণ অনুকম্পা আছে। তবুও কৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তি ছিল। কিন্তু সে দুর্যোধনের ঋণে বাঁধা ছিল। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের একমাত্র সমাধান ছিল মৃত্যু। সে তাকেই আহ্বান করছিল। এই টানা-পোড়েনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে রাধেয়র রাত কাটল।

দ্বিতীয় দিন দুর্যোধন শল্যের কাছে প্রার্থনা করল যে সে যেন রাধেয়র সারথি হয়। শোনামাত্র তো শল্য একেবারে রেগে আগুন হয়ে উঠল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে মেনে নিল। শল্য বললঃ 'দুর্যোধন! তোমার কথায় আমি রাধেয়ের সারথি তো হব কিন্তু তাই বলে তার সমালোচনা করা থেকে আমি কখনও বিরত হব না।' এই শর্ত মেনে নেওয়া হল।

শল্য রথ হাঁকিয়ে রাধেয়ের সামনে এসে উপস্থিত হল। কর্ণ রথটি প্রদক্ষিণ করল। নিজের পিতা সূর্যকে স্মরণ করল এবং তারপর রথে গিয়ে বসে দুর্যোধনকে বললঃ 'দুর্যোধন! আমি যথাশক্তি লড়ব কিন্তু ফল আমার হাতে নয়।' এই ছিল তার শেষ বিদায়। রাধেয়ের চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হল।

শল্য রথ হাঁকালেন। দুর্লক্ষণ দেখা দিল। রাধেয় জানত এই সব দুর্লক্ষণের তাৎপর্য কি। শল্য রথ চালিয়েও যেতে লাগল এবং পাণ্ডবদের প্রশংসাও করে চলল।

কর্ণ বললঃ 'শল্য যেমন তোমার নাম, আসলেও তুমি ঠিক তাই। কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত আছি। ভগবানের রাজত্বে মানুষ এক অসহায় সামান্য প্রাণী মাত্র। ভীষ্ম গেলেন, দ্রোণ গেলেন। কিন্তু মানুষ অসহায় হওয়া সত্ত্বেও নিজের প্রারব্ধের সে স্বাধীন স্রষ্টা। আমি আমার মৃত্যুকে রুখতে পারি না কিন্তু যশ নিয়ে মরতে পারি। এটা আমার হাতে। আমি আমার কর্তব্য পালন করতে করতে লড়ব এবং মরে স্বর্গে পৌঁছুব।'

এবার ঘোর সংগ্রাম শুরু হল। যুধিষ্ঠির সম্মুখে এলেন। কর্ণ তাঁর রথ ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল। তাঁর ধনুকও কেটে দ্বিখণ্ড করে দিল। যুধিষ্ঠিরের দেহ রক্তাপ্লুত ঘায়েল হয়ে গেল। অসহায় হয়ে অস্ত্র-শস্ত্র বিহীন যুধিষ্ঠির রাধেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কর্ণ বলল: 'যুধিষ্ঠির! তুমি ক্ষত্রিয় বংশে জন্মেছ বটে কিন্তু স্বভাবে তুমি ব্রাহ্মণ। আমি তোমাকে হত্যা করব না। আমাকে তো আসলে অর্জুনের সঙ্গে লড়তে হবে।' এই বলে যুধিষ্ঠিরকে অসহায় অবস্থাতেই ছেড়ে দিয়ে কর্ণ তার সামনে থেকে সরে গেল।

যুধিষ্ঠির এত আহত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁকে বিশ্রাম নিতে নিজের শিবিরে ফিরে যেতে হল।

রাধেয়ের বাণ দেহে এত ক্ষত সৃষ্টি করেছিল যে তার ব্যথা-বেদনায় অস্থির হয়ে যুধিষ্ঠির নিজের শিবিরে বিশ্রামের জন্য গিয়ে খাটের উপর শুয়ে রইলেন। কিন্তু মন তাঁর অত্যন্ত দুঃখে অবসন্ন ছিল। স্বভাবত শান্তিপ্রিয় হওয়ার দরুণ তিনি এই কলহ এবং যুদ্ধের জন্য অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর সেই অসন্তোষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু যখন একবার যুদ্ধে নেমে পড়েছেন তখন তার থেকে পিছু হটাও আর সম্ভব ছিল না।

কর্ণের বাণের চেয়ে তার বচনের আঘাতে তিনি বেশি পীড়িত ছিলেন। তিনি চাইছিলেন এই যুদ্ধ যত তাড়াতাড়ি হয় শেষ হোক। কিন্তু সে তো বিজয় লাভ হলে তবেই সম্ভব।

অর্জুন এখনও পর্যন্ত তেমন বড় কিছু কেরামতি দেখাতে পারেনি। সেজন্যও তাঁর মনে অসন্তোষ ছিল। সাধারণ সৈনিকদের তো রোজ অজস্র সংহার করে চলেছিল অথচ রাধেয়কে শেষ করে উঠতে পারল না এখনও। রাধেয়ের ঐ কথা যে 'যুধিষ্ঠির তুমি তো হচ্ছ ব্রাহ্মণ', তাঁকে কাঁটার মত পীড়া দিচ্ছিল।

অর্জুন যখন শুনল যে যুধিষ্ঠির বাণের দ্বারা আহত হয়ে নিজের শিবিরে ফিরে শুয়ে আছেন, তখন সে কৃষ্ণকে বলল: 'কৃষ্ণ! ভাইকেও একটু সামলানো দরকার।' দুজনে তখন যুধিষ্ঠিরের শিবিরে গেলেন। সেখানে শিবিরে প্রবেশ করতেই দেখলেন যে যুধিষ্ঠির বিষাদের বোঝায় যেন চাপা পড়ে একলাই শোকমগ্ন হয়ে ছটফট করছেন।

তাঁদের দুজনকে দেখে যুধিষ্ঠির ভাবলেন হয়তো এরা দুজন কর্ণকে বধ করে সেই খবর দেবার জন্য তার কাছে এসেছেন। এইজন্য তিনি আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: 'অর্জুন! তুমি আমার হৃদয়ের কাঁটা আজ দূর করে দিয়েছ। রাধেয়ের বাক্য-শেল আমাকে বাণের চেয়েও বেশি পীড়া দিচ্ছে। তুমি তাকে বধ করে এসেছ এতে আমি খুশি হয়েছি।' অর্জুন তখন বলল:

'স্বামিন্! আমার বড় খেদ যে এখনও পর্যন্ত আমি রাধেয়কে বধ করে উঠতে পারিনি।' এই শুনে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়লেন। রাগও হল তাঁর। কড়া কথাও বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। বললেন: 'অর্জুন! গাণ্ডীব ফেলে দাও। তোমার দ্বারা কিছু হবে না। এই রাধেয়কে তো আমিই মারব।' এই কথা শুনে অর্জুনেরও রাগ এসে গেল। কিন্তু কৃষ্ণ দুজনকেই শান্ত করলেন। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করলেন যে যুদ্ধে রাধেয়কে পরাজিত করে তবেই তিনি ফিরে আসবেন, নচেৎ নয়।

বাইরে আসার পর কৃষ্ণ বললেন: 'অর্জুন! তুমি প্রতিজ্ঞা তো করলে কিন্তু রাধেয় সাধারণ যোদ্ধা নয়। সে কাশিরাজ এবং জরাসন্ধের মত বীর-দেরও একলাই হারিয়ে দিয়েছে। রাধেয় শুধু তোমার সমানই নয় বরং তোমাকে সে অনেক ছাড়িয়ে-ছাপিয়ে আছে। অগ্নির মত তেজ, বায়ুর মত গতি, ক্রোধে ইন্দ্রের সমান, এমনই হল ঐ রাধেয়। সে হচ্ছে বীর, ধার্মিক এবং দাতা। তার কমতি বা ন্যূনতা শুধু এইটুকুই যে সে দুর্যোধনের কাছে বাক্যবন্ধ হয়ে পাপের পক্ষ নিয়ে লড়ছে।'

অর্জুন বলল: 'তুমি আমাকে সাবধান করে দিলে, এটা ভালই করলে। এ তোমার দয়া বা অনুকম্পা। কিন্তু তোমার আশীর্বাদে আমি শেষ পর্যন্ত বিজয় লাভ করবই। এবার আমার রথ রাধেয়ের সম্মুখে নিয়ে চল।'

অর্জুনের রথকে নিজের সামনে আসতে দেখে রাধেয় শল্যকে বলল: 'রাজন্! আজ আমি জয়লাভের চেষ্টা করব এবং ঘোর যুদ্ধ করব। অর্জুনকে বধ করার প্রতিজ্ঞা আছে আমার। কিন্তু আমি যদি যুদ্ধে মারা যাই তা হলে শল্য! তুমি কি করবে?' শল্য ভাবের আবেগে বলে উঠল: 'রাধেয়! যদি তুমি কালগ্রস্ত হয়ে যাও, তা হলে আমি অর্জুন এবং কৃষ্ণ দুজনকেই মেরে তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব।' শল্যের এই কথা শুনে রাধেয়ের মনেও এক নতুন উৎসাহ এসে গেল।

এদিকে অর্জুনকে উৎসাহ দেওয়াতে গিয়ে কৃষ্ণ বললেন: 'অর্জুন! তুমি অবশ্যই জিতবে। কিন্তু তুমি যদি নিহত হও তা হলে এ কথা নিশ্চয় জেনো যে আমি রাধেয় এবং শল্য দুজনকেই মেরে ফেলব। ক্রোধে সমস্ত বিশ্বকে ভস্ম করে ফেলব। অর্জুন! সূর্য ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেতে পারে, অগ্নি নিজের উষ্ণতাকে ত্যাগ করতে পারে কিন্তু তোমার জয় সুনিশ্চিত।' এই সব কথায় অর্জুনের উৎসাহ চতুর্গুণ বেড়ে গেল, তার রথ এবার রাধেয়ের দিকে ঘুরল।

অশ্বত্থামা অর্জুনের রথকে সামনে এগিয়ে আসতে দেখল। দুর্যোধনের ভাই দুঃশাসন এর একদিন আগেই ভীমের হাতে মারা গিয়েছিল। ভীম নিজের প্রতিজ্ঞা অনুসারে দুঃশাসনকে মেরে এক চুমুকে তার বুকের রক্ত পানও

করে ফেলল। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে দুই পক্ষের যোদ্ধারাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু ভীমের এই-ই প্রতিজ্ঞা ছিল।

দুর্যোধন এই সমস্ত ঘটনায় বিহ্বল হয়ে পড়ছিলেন। এই শোকাবহ পরিস্থিতি দেখে অশ্বত্থামা বললঃ 'দুর্যোধন! দেখো এই দুই বীর এবার মুখোমুখি হতে চলেছেন। একে অপরকে মারবার জন্য নেমে পড়েছেন, এ কতখানি দুঃখের কথা। এই প্রলয়ঙ্কর কলহ এবার বন্ধ করো। পাণ্ডবরা সৎ লোক। তারা যুদ্ধ চায় না। আমার বাবা গেলেন। ভীষ্ম গেলেন। এখন রাধেয়ও আজ যাবার মুখে। সন্ধির প্রস্তাব কৃষ্ণের কাছে শুভ বলে বোধ হবে। যুধিষ্ঠির তো শান্তিপ্রিয় আছেই। আমি হচ্ছি অমর। কৃপাচার্যও তাই। তা সত্ত্বেও তোমার পরাজয় এবং পাণ্ডবদের জয় সুনিশ্চিত।'

শুনে দুর্যোধন চুপ করে রইল। পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললঃ 'অশ্বত্থামা তুমি যা বলছ তা সত্যি। কিন্তু আমার ভাই দুঃশাসন কালই মারা গিয়েছে। আমি আর এখন বেঁচে থেকে কী-ই বা করব? আমাকেও যুদ্ধ করতে করতে মরতে দাও। এখন এছাড়া আর কোনো রাস্তাই নেই।'

রাধেয় এবং অর্জুনের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়ে গেল। দুই পক্ষেরই পাঁয়তাড়া, উদ্যোগ-আয়োজন প্রথম দিকে একটু ঢিমা তেতালায় চলছিল কিন্তু তার পরই অতি দ্রুত গতিতে যুদ্ধের গতি বৃদ্ধি পেতে লাগল।

অর্জুন দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ করবে বলে স্থির করে প্রথম কর্ণের দিকে আগ্নেয়াস্ত্র ছুঁড়ে দিল, যার উত্তরে রাধেয় বরুণাস্ত্র ছুঁড়ল। অর্জুনের আগ্নেয়াস্ত্র যে-আগুন লাগাল তা বরুণাস্ত্র নিভিয়ে দিল। কর্ণ মন্ত্র পড়ে আবার ভার্গবাস্ত্র ছুড়ল। তার ফলে পাণ্ডবদের সেনারা ভীষণভাবে সংহার হতে লাগল। তাই দেখে ভীম অর্জুনকে বকে উঠলেনঃ 'তুমি তো মেয়ে-দের মত যুদ্ধ করছ, এর চেয়ে বরং আমি কর্ণের মুখোমুখি হয়ে ভিড়ে যাই।' কৃষ্ণও এই ভর্ৎসনা বা অনুযোগ সমর্থন করে অর্জুনকে বললেনঃ 'অর্জুন! মনে রেখো যে তুমি হচ্ছ নরের অবতার। এক বিশেষ কারণে তোমার জন্ম হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ ভাবে সফল করো এবং নিজের শক্তির কথা স্মরণ করে দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করো।'

এই কথার পর অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্র ছুড়ল। তার ফলে কৌরব-সেনার ভয়ঙ্কর ধ্বংস হতে লাগল কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো জয়-পরাজয়ের নির্ণয় সম্ভব হল না। রাধেয় তীব্র ও তীক্ষ্ণ সব বাণ ছুড়তে লাগল। তাতে পাণ্ডব-সেনার সংহার হতে লাগল ঠিক কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো নিশ্চিত পরিণাম বা ফলাফল দেখা গেল না যখন, তখন সে নিজের বহুমূল্য নাগাস্ত্র ব্যবহার করবে বলে স্থির করল। ইন্দ্রের দেওয়া শক্তি তো অমোঘই ছিল কিন্তু তা তো সে

ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ই ব্যবহার করে ফেলেছিল। সে-শক্তি ইন্দ্রের কাছে ফিরে চলে গিয়েছিল। এইজন্য এখন সে অর্জুনের মাথা লক্ষ্য করে নাগাস্ত্র প্রয়োগ করল।

শল্য বলল: "কর্ণ! মাথার উপর নয়, অর্জুনের বুকের উপর এই অস্ত্র চালাও।' কর্ণ বলল: 'কর্ণ বার বার তার লক্ষ্য বদল করে না—দ্বিশরং নাভিসন্ধত্তে।' এই বলে সে নাগবাণ ছুঁড়ে দিল। কৃষ্ণ যখন দেখলেন যে এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র অর্জুনের দিকে ধেয়ে আসছে, তখন তিনি সারথির চাতুর্য প্রয়োগ করে ঘোড়াকে একটু দাবিয়ে দিলেন। তারই সঙ্গে রথকেও একটু দাবিয়ে দিলেন, ফলে সেই নাগবাণ অর্জুনের মাথায় না লেগে তার মুকুটের উপর এসে লাগল। এইভাবে বাণ নিষ্ফল হল।

রাধেয় এবার হতাশ হয়ে পড়ল। তার কাছে আর তেমন কোনো বড অস্ত্র আর রইল না। কিছু দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে চাইছিল কিন্তু শাপের দরুণ তার স্মরণ শক্তি নষ্ট হয়ে গেল। রাধেয় বুঝল যে কালের বিধান কেউ টলাতে পারে না।

অর্জুন তীক্ষ্ম বাণ চালিয়ে রাধেয়ের রথের চাকার রক্ষকদের বা সহিসদের তাড়িয়ে দিল। সহিস পালিয়ে যাওয়ায় রথের চাকা সামলাবার আর কেউ রইল না ফলে কর্ণের চাকা কাদায় বসে গেল। কর্ণের স্মরণ-শক্তিও চলে গেল। কাদা থেকে চাকা তোলার জন্য সহিস তো ছিল না। সেজন্য রাধেয়কে নিজেই রথ থেকে নেমে চাকা তোলার জন্য পরিশ্রম করতে হল। কিন্তু অর্জুনের বাণ-বর্ষণ বন্ধ হ'ল না।

রাধেয় বলল: 'অর্জুন! এটা ধর্ম-যুদ্ধ হচ্ছে না। আমি যতক্ষণ রথের চাকা কাদা থেকে না টেনে তুলছি, ততক্ষণ তোমার বাণ-বর্ষণ বন্ধ করো।'

শ্রীকৃষ্ণ তাতে হেসে বললেন: 'রাধেয়! তুমি তো ধর্মকে কবে থেকেই বিসর্জন দিয়ে বসে আছ। তোমার আবার এখন ধর্মের দোহাই দেবার কী অধিকার আছে? যখন পান্ডবদের জতুগৃহে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? দ্রৌপদীকে সভায় টেনে হিঁচড়ে আনা হ'ল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? অভিমন্যুকে কি তোমরা সবাই ধর্মযুদ্ধে মেরেছিলে? এই কথা শুনে রাধেয় মাথা নীচু করে ফেলল, কেন না এ সবই ছিল কঠোর রূঢ় সত্য।

কর্ণ রথের চাকা টেনে তুলে উর্দ্ধ ক'রে আবার লড়াই করতে লাগল, চাকা আবারও বসে গেল। আবারও তুলে লড়তে লাগল। কিন্তু বিধির বিধান ছিল তার প্রতিকূল। চাকা আবার বসে গেল। কর্ণ আবার নেমে চাকা তুলতে ও বার করতে লাগল, তখন কৃষ্ণ বললেন: 'অর্জুন আর দেরী

কোরো না। রাধেয় আবার যদি লড়তে আরম্ভ করে, না জানি কি ক'রে বসবে। এইজন্য ওকে শেষ করো।' রাধেয় দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন ক্রমশ। দৈব্য অস্ত্রের সব মন্ত্র ভুলে বসেছিলেন। যখন চাকা তুলছিলেন বা'র করছিলেন তখন অর্জুন বাণ দিয়ে তার হাত কেটে ফেলল এবং শেষে এক তীক্ষ্ম বাণ চালিয়ে তার মাথাও ধড় থেকে আলাদা ক'রে ফেলল।

কর্ণ শেষ হয়ে গেল। কৌরব সৈন্যে হাহাকার জেগে উঠল।

রাধেয়ের জীবনাবসানে দুর্যোধনের ভয়ানক আঘাত লাগল। শোকে-বিহ্বল হয়ে সে কিছু সান্ত্বনা লাভের আশায় শরশয্যায়* শয়ান পিতামহের কাছে গিয়ে কাঁদতে লাগল। পিতামহ বললেনঃ 'দুর্যোধন! এখন আর কেঁদে কী লাভ? রাধেয় ক্ষাত্র-ধর্ম পালন করতে করতে দেহ ত্যাগ করেছে। এতে শোকের কি আছে?' 'ক্ষত্রিয় ধর্ম? পিতামহ! বলছ কি? রাধেয় তো সূতপুত্র ছিল। আপনি তাকে ক্ষত্রিয় বলছেন কি ক'রে?' পিতামহ বললেনঃ 'বৎস! রাধেয় সূতপুত্র নয়। ক্ষত্রিয়-পুত্রই ছিল।' 'পিতামহ! আমাকে বলুন্ সে কা'র সন্তান ছিল?' পিতামহ বললেনঃ 'এ রহস্য আমি বলতে পারব না কেননা আমি রাধেয়কে কথা দিয়েছিলাম যে তার জন্মের কথা আমি গোপন রাখব। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা করো যে এই রহস্য আর কাউকে বলবে না, তবেই আমি তোমাকে বলতে পারি। দুর্যোধন বললঃ 'পিতামহ! আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে এ-রহস্য আমি গোপন ক'রেই রাখব।' পিতামহ বললেনঃ 'দুর্যোধন! তুমি শুনে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তবু মন শক্ত ক'রে শোনো। রাধেয়, রাধেয় নয়, বলতে কি কৌন্তেয় ছিল। পাঁচ পাণ্ডব ভাইদের সে-ই ছিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।' ভীষ্ম পিতামহের কথা শুনে দুর্যোধন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তারপর চৈতন্য হলে সে শুধু আবার বললঃ 'হায়! আমি এমন একজন ধর্মাত্মাকে মারালাম। আমার জন্য তার ভাইদের সঙ্গে লড়ে প্রাণটা দিল। অথচ এ রহস্য সে কোনোদিন আমাকে বলেনি। এমন মহাপুরুষকে আমি মারালাম।' পিতামহের কাছে সান্ত্বনা নিয়ে দুর্যোধন নিজের শিবিরে ফিরে গেল।

আশা বড় বলবান্। বড় বড় যোদ্ধা সব নিহত হলেন। তবু জয়ের আশায় দুর্যোধন শল্যকে সেনাপতি করল। কিন্তু মাত্র এক দিনের যুদ্ধেই তারও শেষ হয়ে গেল। এইভাবে আঠারো দিনে মহাভারতের যুদ্ধ সমাপ্ত হ'ল।

*একজন চিন্তাশীল লোক শরশয্যার এক নতুন অর্থ করেছেন। শর অর্থাৎ মুঞ্জা ঘাস। সেই ঘাসের তৈরী চাটাই বা মাদুরই হচ্ছে শরশয্যা। অর্থাৎ পিতামহ মুঞ্জা-ঘাসের মাদুরের উপর শযান ছিলেন।

দুর্যোধনের আত্মবল

যুদ্ধ তো শেষ হল কিন্তু দুর্যোধন তখনও জীবিত, সেইজন্য এ কথা বলা তখনও চলে না যে পাণ্ডবদের সম্পূর্ণ বিজয় লাভ হয়ে গিয়েছে। কৌরবদের এগারো অক্ষৌহিনী সেনার মধ্যে একটি সৈনিকও জীবিত ছিল না। তবু দুর্যোধন তো জীবিত ছিলই। এ ছাড়া কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্মাও জীবিত ছিলেন। এর তাৎপর্য হল এই যে কৌরব-সেনা এখন আর সৈনিকদের সমষ্টি রইল না। মাত্র কয়েকজন যোদ্ধা স্বতন্ত্র চিহ্নিত হয়ে থাকল। পাণ্ডব-সেনাদের অবশিষ্ট রইল দুশো রথ, সাতশো হাতি, এক হাজার ঘোড়া আর কিছু সৈনিক। আঠারো দিন পূর্বে দু পক্ষেরই যে বিশাল সৈন্য ছিল, তা এখন নামমাত্রই রয়ে গেল। এই গৃহ-কলহের পরিণাম এখন সবাই উপলব্ধি করল বটে কিন্তু মহাভারত-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি এখনো বাকি রয়ে গিয়েছিল।

দুর্যোধন রণক্ষেত্রের দিকে শোকাহত দৃষ্টিতে তাকাল। বিদুরের সেই কথা যে 'তুমি সারা ক্ষত্রিয় কুলকেই শেষ বা ধ্বংস করবে।' তার কানে বাজছিল।

শোকে বিহ্বল এবং উদ্বেগে আকুল দুর্যোধন হতবুদ্ধি হয়ে রণক্ষেত্র থেকে চলে গেল। তার শরীর বড় উত্তপ্ত বোধ করছিল। কোনো ঠাণ্ডা জায়গার খোঁজে সে চলতেই থাকল। সামনে একটি শান্ত সরোবর দেখতে পেল, তখন সে ভাবল, চলো, এই সরোবরে ডুব দিলে তো খানিকটা শান্তি পাওয়া যাবে।

একলা দুঃখিত মনে সে সরোবরের দিকে চেয়েই রইল। এমন সময় আকস্মিক যোগাযোগে সঞ্জয় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাকে এই পরিস্থিতিতে দেখে তাঁর দুই চোখ জলে ভরে গেল। দুর্যোধনও সঞ্জয়ের এই ব্যথিত মূর্তি দেখে কেঁদে ফেলল।

সঞ্জয় দুর্যোধনের ঐ সংতপ্ত দশা দেখে স্নেহার্দ্র হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

দুর্যোধন সব আশাশূন্য হয়ে একলা সেই সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে ছিল জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণা নিয়ে। সঞ্জয় দুর্যোধনের কাছে গেলেন। কিন্তু শোকসন্তপ্ত দুর্যোধন তাঁকে ভাল ক'রে চিনতেও পারল না। দুর্যোধনের চোখ এবং হৃদয় দুই-ই যেন নিস্প্রাণ, স্পন্দহীন। সঞ্জয় বললেন, 'মহাভারত! আমি সঞ্জয়। ধৃতরাষ্ট্রের সারথি, আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি।' দুর্যোধন একটু সামলে নিয়ে বললঃ 'সঞ্জয়! আমি খুশি যে তুমি পান্ডবদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছ এবং জীবিত আছ।' সঞ্জয় বললেনঃ 'মহারাজ! আমি নিজের শিবিরে ছিলাম। পান্ডবরা সমস্ত সৈন্যকে যমালয়ে প্রেরণ করেছে এবং তারপর আপনার খোঁজে তারা সবাই আমার শিবিরে এসেছিল। সাত্যকি আমাকেও মারতে চেয়েছিল কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন বলল যে একে মেরে কী লাভ হবে? তা সত্ত্বেও সাত্যকি আমাকে মারবার জন্য ধেয়ে এসেছিল. তখন ব্যাসদেব তাকে থামিয়ে বললেন, 'ওকে ছেড়ে দাও এবং ওকে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ফিরে যেতে দাও। এইভাবে আমি মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা পেয়েছি। কিন্তু মহারাজ! আপনার কী হ'ল? আপনার মন যেন বিক্ষিপ্ত, বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে, এইরকম মনে হচ্ছে।' দুর্যোধন বললঃ 'সঞ্জয়! সত্যিই আমার বুদ্ধি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে। আমি অত্যন্ত দুঃখ এবং কষ্টের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ছটফট করছি। এখন তো আমার মৃত্যুতে শোক করার মতও কেউ রইল না। কেবল আমার পিতা এবং তুমি আছ। যারা আমার জন্য বিলাপ করবে। সঞ্জয়! তুমি গিয়ে আমার পিতাকে বোলো যে দুর্যোধন সরোবরের গভীরে শুয়ে আছে। তার শরীর আগুনের মত উত্তপ্ত, তাই শীতল জলের তলায় শুয়ে সে একটু জুড়োতে চাইছে। আমি আর বাঁচব না। আমার হ'য়ে তুমি পিতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কোরো। তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ো। পিতা সব সময়ই আমাকে আদর দিয়েছেন। সেজন্য তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন আমাকে। আমার মাকে বোলো যে আমি এমন বিদুষী মায়ের যোগ্য পুত্র নই। বোলো, আমি কারও সামনে মাথা নোয়াইনি, কিন্তু আমার মায়ের পায়ে আমার মাথা আপনিই নুইয়ে আসে। বোলো যে আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে পরের জন্মেও যেন আমি গান্ধারীর মত মা পাই।' এই ব'লে দুর্যোধন সরোবরে ডুব দিল এবং সঞ্জয়ও সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

ফিরে যাবার সময় পথে সঞ্জয়ের সঙ্গে অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্যের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁদের সঞ্জয় সমস্ত বৃত্তান্ত শোনালেন। তাই শুনে

দুঃখিত হয়ে অশ্বত্থামা বলল: 'দুর্যোধন জানে না যে আমরা তিনজন এখনও জীবিত আছি এবং এখনও পাণ্ডবদের পরাস্ত করতে পারি। সেইজন্য তার নিরাশ হওয়া উচিত নয়।'

এদিকে পাণ্ডবদের তরফ থেকে চারদিকে দুর্যোধনের খোঁজ-খবর, তল্লাসি চলছিল। পাণ্ডবরা জানত যে দুর্যোধন ভীরু কাপুরুষ নয়। কিন্তু তার হল কী? তারা চারদিকে দুর্যোধনের অনুসন্ধানের জন্য গুপ্তচর পাঠাল।

সন্ধ্যার সময় সেই সরোবরের ধারে কৃপাচার্য প্রভৃতিরা পৌঁছুলেন, যার জলের তলায় দুর্যোধন বিশ্রাম করছিলেন। সেখানে পৌঁছে তাঁরা দুর্যোধনের নাম ধরে ডেকে বললেন: 'মহারাজ! আপনি এত ভেঙে পড়েছেন কেন? আমরা তিনজন এখনো বেঁচে আছি এবং পাণ্ডবদের হারাতে পারি। আপনি বেরিয়ে আসুন এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোন।' দুর্যোধন এঁদের গলার আওয়াজ শুনে আনন্দিত হয়ে বলল: 'হে বীরগণ! তোমরা বেঁচে আছ, আমি জানতাম না। এখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে এবং আমি অত্যন্ত পীড়িত। এজন্য কাল সকালে বাইরে বেরুব এবং তখন গিয়ে আমরা সবাই পাণ্ডবদের সঙ্গে লড়ব।'

ইতিমধ্যে সেই সরোবরে জল পান করবার জন্য কিছু ব্যাধ এসেছিল। তারা এই কথাবার্তা শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে খবর দিল এবং দুর্যোধন যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছিল, সেই জায়গারও সন্ধান পাণ্ডবদের বলে দিল।

ভীম এই সমস্ত কথা শুনে আনন্দে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠল। যুধিষ্ঠিরও সেই ব্যাধদের কাছ থেকে সব কাহিনী শুনলেন। পাণ্ডবরা তখন নিজেদের অবশিষ্ট যোদ্ধাদের নিয়ে দ্বৈপায়ণ সরোবরে গিয়ে পৌঁছুলেন, যেখানে দুর্যোধন লুকিয়ে ছিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, দ্রৌপদীর ছেলে যুধামন্যু, উত্তমৌজা এবং শিখণ্ডীও পাণ্ডবদের সঙ্গে দ্বৈপায়ন সরোবরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সকলের সঙ্গে ছিলেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। অশ্বত্থামা এবং দুর্যোধনের অন্যান্য সঙ্গীরা পাণ্ডবদের আসতে দেখে দুর্যোধনকে বলল: 'মহারাজ! পাণ্ডবরা আসছে, সেইজন্য আমরা এখান থেকে একটু দূরে সরে যাচ্ছি।' এই বলে তারা সবাই একটি বটগাছের তলায় বসে মন্ত্রণা করতে লাগল।

সবাই শোকাচ্ছন্ন ছিল। এখন কি আর পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে? দুর্যোধন কি করবেন? এইরকম জল্পনা-কল্পনা নিয়ে শোকাতুর হয়ে বট-বৃক্ষের তলায় সবাই বসে গেল।

যুধিষ্ঠির সরোবরের কাছে পৌঁছে কৃষ্ণকে বলতে লাগলেন: 'কৃষ্ণ'

দুর্যোধন এখানে লুকিয়ে আছে। কিন্তু আমরা তাকে এখন আর বেঁচে থাকতে দেব না।' এই বলে তিনি দুর্যোধনকে ডাক দিলেন এবং বললেনঃ 'প্রিয় দুর্যোধন! নিজের সব আত্মীয় স্বজনদের মৃত্যু ঘটিয়ে এখন তুমি সরোবরে লুকিয়ে বসে আছ, এ তোমার শোভা পায় না। বেরিয়ে এসো এবং আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। তোমার সে-অহঙ্কার কোথায় গেল যে তুমি এখন এইরকম ভীরুতা, কাপুরুষতা দেখাচ্ছ? তুমি হচ্ছ ক্ষত্রিয়, তুমি বীর বলে চিরকাল পরিচিত হয়ে এসেছ। কিন্তু তোমার এই ধরনের আচরণ জানিয়ে দিচ্ছে যে তুমি আসলে কাপুরুষ। তোমার এই পাপ তোমাকে স্বর্গে যাওয়া থেকে বঞ্চিত করবে। সবাইকে মারিয়ে এখন নিজে বেঁচে থাকতে চাইছ, এর চেয়ে বড় পাপ আর কী হতে পারে? শকুনি গিয়েছে, কর্ণও গিয়েছে। তোমার সব সময়ই নিজের শৌর্য-বীর্যের অহঙ্কার ছিল। তা হলে এখন আবার লুকোচ্ছ কেন? বাইরে বেরিয়ে এসো এবং যুদ্ধ করো। যদি তুমি আমাকে হারিয়ে দাও তা হলে তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে যাবে আর যদি তুমি মরে যাও, তা হলে স্বর্গে যাবে। সেজন্য, দুর্যোধন তুমি কাপুরুষ হোয়ো না। বাইরে বেরিয়ে এসো এবং নিজের পুরুষত্ব প্রমাণ করো।'

দুর্যোধন এই ভর্ৎসনা বা তিরস্কার শুনল, এবং, তখন তার রাগ হয়ে গেল। উত্তরে সে যুধিষ্ঠিরকে বললঃ 'যুধিষ্ঠির! তোমার এই নিরর্থক বাজে বকা বন্ধ করো। আমি ভয় পেয়ে যুদ্ধ থেকে পালাইনি। সমস্ত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের বিনাশ ঘটতে দেখে আমি অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে পড়েছিলাম আমার ঘোড়াও আহত হয়েছিল। সে-ই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে কিন্তু এখানে আসতে আসতেই সে মরে গেল। এই সরোবরটি দেখে আমি ভাবলাম যে এখানে কিছুটা শান্তি পাব। এইজন্য এর জলে নিজেকে শীতল করার জন্যই আমি এর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছি, জলের তলায় ঢুকেছি। আমি ভয়ে ভীত নই। আমার জীবনেরও কোনো আকাংক্ষা নেই। তুমিও ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছ। আমাকে একটু সুস্থ হতে দাও, তুমিও বিশ্রাম করে নাও। আমি সুস্থ হয়ে উঠে কাল অবশ্যই তোমাদের সবাইযের সঙ্গে যুদ্ধ করব।'

যুধিষ্ঠির বললেনঃ 'দুর্যোধন! আমার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। আমাদের বিশ্রামের কোনো দরকার নেই। অতএব বাইরে বেরিয়ে এসো।' দুর্যোধন বললঃ 'যুধিষ্ঠির! আমার তো এখন না আছে জীবনের প্রতি কোনো মোহ বা আসক্তি, না আছে রাজ্যের লালসা। আমার বন্ধু-বান্ধব সবাই পরলোকে চলে গিয়েছে। আমার এখন আর এই পৃথিবীতেও কোনো আকর্ষণ

নেই। তবু তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করার জন্য আমি নিশ্চয়ই লড়ব। ভীষ্ম গিয়েছেন, দ্রোণ এবং কর্ণও গিয়েছেন। এখন তুমিই এই মরুভূমিকে ভোগ করো। আমার কোনো ঈর্ষা নেই। আমি এই রাজ্য দান করে দিতেও প্রস্তুত আছি এবং নিজে বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণ করে বাণপ্রস্থ গ্রহণের জন্যও তৈরী আছি। ভোগ করো যুধিষ্ঠির! এই বিধবা ভূমিকে তুমিই ভোগ করো।'

যুধিষ্ঠিরের কাছে এই কথা বড় কটু বলে বোধ হল। রেগে গিয়ে সে বলল: 'দুর্যোধন! কতখানি নির্লজ্জ তোমার এই ধৃষ্টতা যে তুমি আমাকে রাজ্য দান করার গর্ব দেখাচ্ছ, হাঁকডাক করছ! আমি হচ্ছি ক্ষত্রিয়। তোমার দান আমার চাই না। শত্রুর কাছ থেকে কোনো দান আমার নেবারও নেই। আমি তো তোমাকে হারিয়ে এই রাজ্য ভোগ করব। এক সময় ছিল, যখন তুমি সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি ছিলে। যা আমাদের নিজস্ব জায়গা ছিল সেখান থেকেও আমাদের সবাইকে নির্বাসিত হতে তুমি বাধ্য করেছিলে। অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে এসে যখন আমরা নিজস্ব অধিকার ফিরে চাইলাম, যা ছিল একান্ত ন্যায় সঙ্গত, সেই সময় তোমার এই উদারতা কোথায় লোপ পেয়ে গিয়েছিল?

'আমরা কৃষ্ণকেও দূত করে তোমার দুয়ারে পাঠিয়েছিলাম। সে-সময় তুমি বলেছিলে যে সূচ্যগ্র ভূমিও তুমি দিতে প্রস্তুত নও। এখন হঠাৎ এ-রকম উদারতা তোমার মধ্যে কোথা থেকে গড়িয়ে পড়ল? মনে হচ্ছে তোমার বিবেক বিচার সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দুর্যোধন, সকলের মাথার উপর একচ্ছত্র সম্রাট, যে পাঁচটি গ্রামও দিতে প্রস্তুত ছিল না, সে কিনা আজ সমগ্র পৃথিবী আমাদের দান করতে আগ্রহী হয়ে পড়েছে। কী আশ্চর্য!

'মহারাজ দুর্যোধন! আপনার কাছে এখন আর রাজ্য আছেই বা কী, যা আপনি আমাদের দান করতে চাইছেন? আপনি এইভাবে যুদ্ধ থেকে ভয়ে সরে পড়তে চাইছেন, এ হল কাপুরুষতা। বাইরে আসুন এবং যুদ্ধ করুন। আমাদের শেষ করার জন্য আপনি একটা নয়, অনেক পাপ-কর্ম করেছেন। অনেক কুকর্ম করেছেন। এখন পরাজিত হয়ে উদারতার বুলি আওড়াচ্ছেন আর মৃত্যু থেকে পালাতে চাইছেন। সে আর হবে না। আমি হচ্ছি জয়ী। এখন আমি কেবল আপনার মৃত্যুই চাই। যুদ্ধ করে রণ-শয্যায় দেহত্যাগ করে আপনি স্বর্গে যেতে পারেন। এই স্বর্গ-দ্বার পর্যন্ত পৌঁছুবার সুযোগ আপনাকে দিচ্ছি। পালাবেন না। আসুন, আসুন, যুদ্ধ করুন।'

দুর্যোধন এরকম অপমানজনক কথা আজ পর্যন্ত কখনও শোনেনি। শব্দ-শেলে আহত হয়ে সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। অভিমানী দুর্যোধন কখনও

ভাবতে পারেনি যে যুধিষ্ঠিরের মত একজন সৌম্য শান্ত মানুষও এমন উগ্র রূঢ় হতে পারে। দুর্যোধন হাত কচলাতে লাগল। সে চেয়েছিল যে মাত্র এক রাত্রির মত একটু বিশ্রাম যদি সে পায়। কিন্তু সে তাতেও বঞ্চিত হল। যুধিষ্ঠিরের তীক্ষ্ম বচন তার হৃদয়কে যেন বিদ্ধ করে দিল। সে ছটফট করতে লাগল।

দুর্যোধন বলল: 'যুধিষ্ঠির! তুমি ধর্মাত্মা বলে নিজেকে দাবী করো কিন্তু তোমরা সবাই মিলে একত্র হয়ে একলা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছ। না আমার কাছে আছে রথ, না কোনো সৈনিক। তার উপর আমি আহত। তা সত্ত্বেও তোমরা সবাই মিলে একলা আমাকে যুদ্ধ করার জন্য স্পর্ধিত আহ্বান জানাচ্ছ। আমি তোমাদের কাউকেই ভয় করি না। আমার দুঃখ শুধু এই কারণে যে তোমরা সবাই মিলে একজন অসহায় নিরস্ত্র বীরকে বধ করতে উদ্যত হয়েছ। শেষকালে মানুষের সঙ্গে শুধু ধর্মই যায়. কিন্তু ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তুমি সেই ধর্মকেও আজ পরিত্যাগ করতে চলেছ। তা যা হোক, এর পরিণাম বা ফলাফল তুমিই ভোগ করবে। আমার কোনো চিন্তা নেই। আমি ক্ষত্রিয়। কুরু-বংশে জন্মেছি। আমি নিরস্ত্র সহায়-সম্বলহীন হয়েই তোমাদের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত আছি। যদি মরে যাই, সে-ও আমার পক্ষে ভালই। যারা আমার আগে স্বর্গে পেঁছে গিয়েছে তাদের সঙ্গে স্বর্গে আমার দেখা হবে, এজন্য আমার মন বড় উন্মুখ হয়ে আছে। আমি রাধেয়ের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বড উৎসুক। তুমি আর কি করে জানবে রাধেয় কত বড় উচ্চস্তরের মানুষ এই পৃথিবীর মাটিতে পা রেখেছিল। যদি তোমাদের সবাইকে আমি যুদ্ধে মেরেও ফেলি. তা হলেও আমি শেষে নিজেকেই নিজে বধ করব। রাধেয়ের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আমার তীব্র উৎকণ্ঠা। নাও, এই আমি বাইরে আসছি।'

যেমন মেঘে ঢাকা সূর্য তার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে. ঠিক তেমনি দুর্যোধন জলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তখন তাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল। ঝলমল করছিল তার তেজ। তার বলিষ্ঠ বাহু দুটি দেখে যুধিষ্ঠির খুশি হয়ে বলল: 'দুর্যোধন! আমার এত গর্ব বোধ হচ্ছে যে তুমি আমার ভাই, কাপুরুষ হয়ে দাঁড়াওনি। আমি অত্যন্ত খুশি। কৌরব-কুলের তুমি গৌরব। তুমি বীর। আত্মসম্মানের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত। তুমি নিজের জীবন এবং যশকে উজ্জ্বল করেছ।

'প্রিয় দুর্যোধন! তুমি ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়ের মতই আচরণ করছ। তুমি একলাই আমাদের সবাইকে যুদ্ধে আহ্বান করছ. এ তোমাতেই শোভা পায়। কিন্তু এ অধর্ম আমার দ্বারা হবে না। আমরা সবাই একলা তোমার সঙ্গে

যুদ্ধ করব না। তুমি আমাদের মধ্যে যে কোনো একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করো, যার সঙ্গে ইচ্ছা। যে শস্ত্র তোমার প্রিয় তুমি তাই হাতে তুলে নাও। যদি জয় তোমার হয়, তাহলে এ পৃথিবীও তোমার। যদি তুমি মরে যাও, তা হলে স্বর্গের দুয়ার তোমার জন্য খোলা।'

গদাযুদ্ধ

যুধিষ্ঠির যখন তাঁদের মধ্যে যে কোনো একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দুর্যোধনকে আহ্বান করলেন, তখন যুধিষ্ঠিরের এই বোকামি কৃষ্ণের কাছে ভাল লাগল না। কিন্তু যুধিষ্ঠির নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল ছিলেন। 'যা বলেছি তা বলেছি, তার থেকে সরে আসার কোনো কথাই হতে পারে না।'

কিন্তু দুর্যোধনও অনেক উন্নতভাবের অধিকারী ক্ষত্রিয় ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের এই মহানুভবতা দেখে সে ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে পড়ল। সে বলল: 'ভাই যুধিষ্ঠির: আমার জীবনের এই অস্তলগ্নে আমরা সবাই বন্ধু হতে চলেছি। আমি তোমার এই প্রস্তাব সানন্দে স্বীকার করে নিচ্ছি। তুমি বলছ, আমি যেটা ভাল মনে করি, সেই শস্ত্র যেন হাতে তুলে নিই। কিন্তু তুমি জানো যে সব শস্ত্রের মধ্যে গদাই আমার সবচেয়ে প্রিয়। এ আমার বন্ধু হয়ে আছে চিরদিন। আমি শেষ সময় পর্যন্ত গদার সঙ্গেই বন্ধুত্ব করে যাব। আমি তোমাদের সবার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত আছি এবং এক এক করে আমি তোমাদের সবাইকে শেষ করে দেবার শক্তি ধরি। এবার আমি প্রস্তুত।'

দুর্যোধনের এই কথা যুধিষ্ঠিরের ভাল লাগল। সে দুর্যোধনকে বলল: 'তা হলে আমার সঙ্গেই লড়াই করো না কেন, যাতে তোমাকে বধ করে আমি নিজের হাতেই তোমাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিতে পারি।' দুর্যোধনের চেহারায় যেন তেজ ঠিকরে পড়ছিল। সিংহের মত গর্জন করতে করতে সে বলল: 'যার সঙ্গে তুমি চাও আমি তারই সঙ্গে যুদ্ধে ভিড়ে যাব।'

যুধিষ্ঠিরের এই যুদ্ধের জন্য আহ্বান কৃষ্ণের কাছে বোকামি বলে মনে হল। তিনি বললেন: 'যুধিষ্ঠির! কী বোকামি করছ? তোমার এত শক্তি নেই যে তুমি দুর্যোধনকে পরাজিত করবে। কেবল এক ভীমই আছে, যে গদা-যুদ্ধে দুর্যোধনের সমকক্ষ। কিন্তু শক্তিতে সে-ও দুর্যোধনের চেয়ে

অনেক কম। যদি দুর্যোধন তোমার আহ্বান স্বীকার করে নেয় এবং তোমার সঙ্গে সংঘর্ষ লেগে যায়, তা হলে আমাদের সমস্ত জয়লাভই বরবাদ হয়ে যাবে।' কিন্তু ভীম বলল: 'কৃষ্ণ! কোনো চিন্তা করার দরকার নেই, দুর্যোধনের সঙ্গে আমারই যুদ্ধ হবে এবং আমি সুনিশ্চিত যে সে আমারই হাতে মারা যাবে' ভীমের এই কথা শুনে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হলেন।

এর পর ভীম দুর্যোধনকে উত্তেজিত করার জন্য স্পর্ধিত আহ্বান জানিয়ে বলল: দুর্যোধন! আমাদের যুদ্ধ তো এখন শুধু তোমার এবং আমার মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছে। পুরানো সব ঘটনা স্মরণ করো। বারণাবর্তের কথা মনে করো। ছলনা করে পাশা খেলার কথা খেয়াল করো। দ্রৌপদীকে অপমানিত করেছিলে, তা-ও মনে করো। তুমি তো এইসব কথা ভুলে গিয়েছ কিন্তু আমি তো ভুলতে পারি না। তৈরী হয়ে নাও। আমার হাতেই তোমার বধ অবধারিত।' ভীমের এ সব কথা বড় কঠোর, রূঢ়, ক্রোধে যেন মথা। দুর্যোধন ভীমের দিকে ব্যঙ্গ কটাক্ষ করে বলল: 'ভীম! বকবক্ করছ কেন? বচনে তো পরাক্রম সিদ্ধ হয় না, কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিছু করে দেখাও। অনেক কাল থেকে আমি এই সুযোগের প্রতীক্ষা করছি। গদা-যুদ্ধে ইন্দ্রও আমার সামনে দাঁড়াতে পারে না। পাঁচজন পাণ্ডবের মধ্যে এক তুমিই আছ যে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার মত শক্তি ধরো। চলো, এবার এসে যাও।'

যুধিষ্ঠির বলল: 'দুর্যোধন! কবচ পরে নাও, চুলও গুছিয়ে বেঁধে নাও, আরও যুদ্ধের জন্য তোমার যা যা দরকার ঠিক করে নাও।' যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনে দুর্যোধন গদগদ হয়ে পড়ল। দু চোখে জল ভরে এল। সে নিজের সোনার কবচ পরে নিল। মাথার উপর মুকুটও লাগিয়ে নিল সূর্যের আলোয় দুর্যোধনকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন অস্তাচলগামী সূর্য প্রচণ্ড রক্ত-আভা নিয়ে অস্ত যাচ্ছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় বলরাম এসে উপস্থিত হলেন। তিনি নারদের কাছে শুনেছিলেন যে তাঁর দুই শিষ্যের মধ্যে গদা-যুদ্ধ হতে চলেছে। দুর্যোধন তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র শিষ্য ছিল। সেইজন্য তাঁর আগমনে দুর্যোধনের অত্যন্ত আনন্দ হল। বলরাম বললেন: 'আমি এই সবে তীর্থ-পর্যটন করে ফিরেছি। আমি শুনেছি যে তোমাদের দুজনের মধ্যে গদা-যুদ্ধ হবে। স্যমন্তপঞ্চক বলে যে তীর্থ তা এখান থেকে খুব কাছেই। সেখানে যে মরে, সোজা স্বর্গে যায়। সেইজন্য আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে তোমাদের দুজনের মধ্যে যুদ্ধ সেখানেই হওয়া উচিত।' যুধিষ্ঠির বলল: 'আপনার এই প্রস্তাব খুবই ভাল, আমি সানন্দে তা স্বীকার করে নিচ্ছি।'

তারপর সবাই স্যমন্তপঞ্চকের দিকে রওনা হলেন। দুর্যোধন খুবই খুশি ছিল। বলরামের উপস্থিতির দরুণ তার সাহস আরও বেড়ে গেল। কৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি প্রভৃতি সকলেই স্যমন্তপঞ্চকের দিকে যাত্রা করলেন।

দুই যোদ্ধাই সামনা-সামনি দৃঢ়তার সঙ্গে উদ্যত হয়ে খাড়া হলেন। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য! দুই ভাই এবং দুজনেই বলরামের শিষ্য। দুজনেই একে অপরকে মারবার জন্য উদ্যত। এ দৃশ্য যেমন অদ্ভুত তেমনি শোকাবহ। দুই-ই বীর এবং সুন্দর যোদ্ধা। এঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু অবধারিত, অবশ্যম্ভাবী।

দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে বললঃ 'আপনারা সব ভদ্রলোকেরা বসে যান। এই যুদ্ধ আপনাদের সকলেব পক্ষেই বিশেষ প্রেরণাদায়ক হবে। আপনাবা সব আমার প্রিয়জন। এইজন্য এ যুদ্ধও সকলের জন্য সুখদাযকই হবে।

যুদ্ধ আরম্ভ হল। দুজনেই বলবান্। ঘোর যুদ্ধের পর দুজনের ক্লান্তিও বোধ হল, সেইজন্য কিছুক্ষণের জন্য দুজনে বিশ্রাম নিলেন। তারপর আবার পূর্ণ শক্তিতে একে অন্যকে গদা-প্রহার করতে সুরু করলেন। মনে হতে লাগল যুদ্ধের শেষেও অমীমাংসিতই থেকে যাবে এর ফল। যুদ্ধ চলছিল, তখন অর্জুনেব মনে অস্বস্তি আরম্ভ হল। সে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলঃ 'কী বুঝছ?' কৃষ্ণ বললেনঃ 'দুজনেই শক্তিশালী, কিন্তু দুর্যোধনের পাল্লাই ভারী মনে হচ্ছে। যদি ধর্মযুদ্ধ চলতে থাকে তা হলে দুর্যোধনকে কেউ হারাতে পারবে না। ভীমের যদি দুর্যোধনকে মারতে হয়, তা হলে তাকে ন্যায়েব পথ ছাড়তে হবে, তা থেকে সরে আসতে হবে। যুধিষ্ঠির যুদ্ধে আহ্বান করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়নি। দুর্যোধন জীবন পণ করে লড়ছে। তার যুদ্ধ কৌশলও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। যাই হোক, এখন এ যুদ্ধের যে কোনো উপায়ে শেষ ঘটাতেই হবে।'

ভীমের দৃষ্টি এক ক্ষণের জন্য অর্জুনের দিকে ফিরল, তখন অর্জুন নিজের উরুব উপর চাপড় মারল। ভীম এই ইশারা বা ইঙ্গিত বুঝে নিল। ভীমের প্রতিজ্ঞা ছিল যে সে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করে তাকে মারবে। যুদ্ধে দুই বীরই নানা কলা-কৌশলে লড়ে যাচ্ছিলেন। ভীম দুর্যোধনের বুকের উপর গদা চালাল কিন্তু দুর্যোধন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উপরে উঠে গেল। দু-তিনবার এই চালে যুদ্ধ চলতে লাগল কিন্তু তৃতীয় বার যখন দুর্যোধন বুকের উপর আঘাত বাঁচাবার জন্য লাফ দিল তখন ভীমের সেই চোট গিয়ে তার উরুর উপর পড়ল।

দুর্যোধনের উরু ভেঙে গেল এবং সে নিরুপায় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আহত সর্পের মত সে গজরাতে লাগল।

দুর্যোধন অন্যায়ভাবে নিহত হল। উরুতে আঘাত করা ধর্মযুদ্ধের নিয়ম-বহির্ভূত। এই অন্যায়ের জন্য আকাশে হাহাকার ছেয়ে গেল। পৃথিবী কেঁপে উঠল। ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করবে। এই বলে সে দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে রেখেছিল। চোদ্দ বছর পরে এখন তার সেই প্রতিজ্ঞা সে পূরণ করল।

সে ধরাশায়ী দুর্যোধনের মাথার উপর পা রেখে তাকে থেঁতলাতে লাগল।

যুধিষ্ঠির দৌড়ে মাঝখানে এসে গেলেন এবং ভীমকে সেখান থেকে ধরে হিঁচড়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন। বললেনঃ 'ভীম! এই কুকর্ম কোরো না। তোমার প্রতিজ্ঞা তো পূর্ণ করা হয়েছে। এবার এ শত্রুতা শেষ করো। দুর্যোধনের এখন আর অবমাননা কোরো না। দুর্যোধন হচ্ছে রাজা। এগারো অক্ষৌহিনীর সে সেনানায়ক ছিল। সে এখন অবশ্য সব কিছুই খুইয়ে বসেছে। আমি দুর্যোধনকে আর এখন অপমানিত হতে দেব না।'

যুধিষ্ঠিরের দুই চোখ জলে ভরে এল। দুর্যোধনের কাছে গিয়ে সে বলতে লাগলঃ দুর্যোধন! যা কিছু ঘটেছে, তাতে আমার কোনো দোষ নেই কিন্তু তোমাকে এই অবস্থায় দেখে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, তুমি তো এখন স্বর্গে চললে। মহারাজ দুর্যোধন! তোমাকে আমার নমস্কার।

বলরাম ভীমের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেনঃ 'ভীম! তোমাকে ধিক্। তুমি দুর্যোধনকে অন্যায়ভাবে মেরেছ। এ কলঙ্ক তোমার গুরুর উপরও এসে পড়েছে। আমি এখন তোমাকে মেরেই এই কলঙ্ক দূর করব। এই বলে বলরাম ভীমের দিকে ধেয়ে গেলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাকে ধরে আটকে দিলেন এবং বললেনঃ 'বলরামদাদা! ক্রোধ ত্যাগ করো। ভীম ধর্মের নিয়ম অবশ্যই লঙ্ঘন করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে দুর্যোধন পাণ্ডবদের সঙ্গে কত কত অন্যায় ব্যবহার করেছে। পাণ্ডবরা যুদ্ধ চায় না, আমি নিজে তাদের দূত হয়ে হস্তিনাপুরে গিয়েছিলাম। আমি আপ্রাণ চেষ্টাও করেছিলাম যাতে যুদ্ধ না হয়। কিন্তু আমি ব্যর্থ হলাম। লোক-ভর্তি সভার মধ্যে দ্রৌপদীর চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে আনা হল। আত্ম-সম্মান বোধ যার আছে, এমন কেউ কি এহেন কুকর্ম সহ্য করতে পারে?

দুর্যোধনের উরু সেই সময়ই বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, যখন সে দ্রৌপদীকে অপমান করেছিল কিন্তু এতদিন দেরী হল তার কারণ যুধিষ্ঠিরের সহিষ্ণুতা। ভীম কেবল নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করেছে। আপনি দুর্যোধনের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে বলে রেগে আগুন হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আমি পাণ্ডব-দের প্রতি যে সব অন্যায় করা হয়েছে কুড়ি বছর ধরে তা দেখে আসছি এবং সহ্য করে যাচ্ছি। তাই আপনার এই রাগ পক্ষপাতেরই নিদর্শন।

বলরাম এবার একটু ঠাণ্ডা হলেন বটে কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। কৃষ্ণ ফের বললেনঃ 'বলরামদাদা, কলির প্রবেশ ঘটে গিয়েছে, এখন যুদ্ধে বিশুদ্ধ ন্যায়ের আশা করা নিরর্থক। কাল-ধর্ম নিজের প্রভাব বিস্তার করছে। বিধির কাজের রীতি বড় অদ্ভুত। সাধ্য বা লক্ষ্যের প্রাপ্তি বা উপলব্ধির জন্য সে সাধনকে মহত্ত্ব দেয় না, অতএব ক্রোধকে শান্ত করে বিধি যা কিছু ঘটিয়েছেন তা মেনে নিন।'

কিন্তু বলরামের সন্তুষ্টি হল না এতেও। দুর্যোধনকে আশীর্বাদ দিয়ে পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই বলরাম দ্বারকায় চলে গেলেন। তাতে কৃষ্ণের মনে কোনো ক্ষোভ হল না। বলরাম গেলেন তো নিষ্কৃতি পাওয়া গেল, এই মনে করে সন্তুষ্ট হয়ে থাকলেন।

বেচারা ভীম চারদিক থেকে ধর্মযুদ্ধের উল্লঙ্ঘনের রব এবং ভর্ৎসনায় কিছুটা ম্লান হতশ্রীর মত হয়ে গেলেন। কৃষ্ণের মনে হল ভীমকে সামলানো উচিত।

ভীম ভাবছিল যে আমি যখন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে দুর্যোধনের উরু বিদীর্ণ করে দ্রৌপদীর প্রতি লাঞ্ছনা অপমানের প্রতিশোধ নেব, তখন তা সবারই জানা ছিল। কিন্তু এখন যখন সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করলাম তখন সবাই বকুনি-ঝকুনি, নিন্দা-গঞ্জনা সুরু করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত অর্জুনের ইঙ্গিত থেকেই আমি দুর্যোধনের উরুতে আঘাত করার প্রেরণা লাভ করেছিলাম। এখন সেই অর্জুনও উদাসীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কৃষ্ণ অন্তর্যামী, তাই তিনি বুঝলেন ভীমের মনে নানা চিন্তা-ভাবনার ঝড় বইছে। ভীমের এই মনঃসন্তাপে তাঁর সহানুভূতি ছিল। তিনি ভীমের কাছে গেলেন এবং স্নেহ পূর্বক তার হাতটি ধরে বলতে লাগলেন, 'ভীম! আমি তোমার কাজের সম্পূর্ণ সমর্থন করি। তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা পুরোপুরি পালন করেছ।' যুধিষ্ঠিরও ভীমের দিকে স্নেহ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। ফলে এবার ভীম যেন কৃতার্থ ও ভাবে গদগদ হয়ে গেল।

সে যুধিষ্ঠিরের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে কাঁদতে লাগল এবং বললঃ 'মহারাজ! এখন এই পৃথিবী আপনার। আমার যুদ্ধ এবার শেষ হচ্ছে। এখন এই পৃথিবীকে ভোগ করুন। দ্বেষের এই অধ্যায় এবার সমাপ্ত হল। এখন থেকে দ্রৌপদী মাটির উপর না শুয়ে খাটের উপর শোবে। আমি যা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তা সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আপনার আশীর্বাদ ভিক্ষা করছি।' যুধিষ্ঠির ভীমকে তুলে নিয়ে গলা জড়িয়ে ধরলেন। বলরামের ক্রোধের ফলে পরিবেশ যে বিক্ষোভে ভারী হয়ে উঠেছিল, এখন তা কেটে গেল।

সব পাণ্ডবরাই ভীমের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তাকে সাধুবাদ দিতে

লাগলেন। এবার কৃষ্ণের কিছু বলার দরকার পড়ল। কৃষ্ণ বললেনঃ 'মরাকে মারা নিরর্থক। দুর্যোধন কারুর সদুপদেশ মানেনি, গ্রাহ্য করেনি। পাপের ফল সে পেয়ে গিয়েছে। এখন সবাইয়ের এখান থেকে বিদায় নেওয়া উচিত।

দুর্যোধন এ সব শুনছিল, সে বললঃ 'কৃষ্ণ! এই সমস্ত কুকর্মের জন্য দোষী একমাত্র তুমিই। তুমি যদি সত্যি সত্যি চাইতে, তা হলে এ কুকর্ম কখনো ঘটত না। কিন্তু তুমিই ধর্ম-যুদ্ধের বিরোধী সব কুকর্ম করার জন্য পাণ্ডবদের প্রেরণা দিয়েছ।

'তুমি ভাল করেই জানো, কৌরবরা পুরোপুরি ধর্ম-যুদ্ধ করেছে। তার বিপরীত পাণ্ডবরা প্রতি পদে ধর্ম থেকে সরে গিয়ে অধর্ম আচরণ করেছে, তার জন্য দোষী ভীম নয়, তুমি। আমি তোমার সমস্ত চালবাজি দেখে যাচ্ছিলাম। ভীম তোমার ইশারাতেই আমার উপর আঘাত করল। শিখণ্ডীকে সামনে এনে, পিতামহকে তুমিই মারিয়েছ। দ্রোণকেও যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে অসত্য আচরণ করিয়ে তুমিই শেষ করেছ। কর্ণকেও অন্যায়ভাবে মারাবার কর্তাও তুমিই। জরাসন্ধকে তুমি ছল করে মারিয়েছ। এইজন্য সমস্ত পাপকর্মের জনক এক-মাত্র তুমিই। যদি যুদ্ধে ধর্মের নিয়মসমূহ পালিত হত, তা হলে পাণ্ডবদের জয়লাভ অসম্ভব ছিল। তাই পাপী আমি নই, তুমি, যে-তুমি যুদ্ধের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করেছ পদে পদে।

কৃষ্ণ দুর্যোধনের এই সক্রোধ উক্তি শুনে কিছুটা উদ্দীপ্ত হয়ে বললেনঃ 'দুর্যোধন! শোনো', কৌরবদের বিনাশের পাপ তোমারই মাথায় চাপবে। ভীষ্ম গেলেন, কারণ তিনি তোমার পাপ-বুদ্ধির বিরোধিতা করেননি। আচার্য দ্রোণেরও উচিত ছিল হস্তিনাপুর ছেড়ে বনে চলে যাওয়া। তিনিও তোমাকে সমর্থন করে পাপ কিনলেন। কর্ণ তোমার পাপ জেনেও তোমার সমর্থন করল। সেই কারণেই এদের সবাইকে মরতে হল।

তোমার সব বন্ধু-বান্ধব তোমার অধর্মের সমর্থনের দরুণই গত হল। এইজন্য এদের সবার হত্যার দায় তোমারই মাথার উপর। তুমি এই গৃহ-কলহের দোষ আমার উপর চাপাচ্ছ। কিন্তু এটা কি ভুলে গিয়েছ যে আমি পাণ্ডবদের দূত হয়ে শান্তি-স্থাপনের জন্য তোমার সভায় এসে শেষে কেবল পাঁচখানি গ্রাম তোমার কাছে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও তুমি লোভ আর অহংকারের বশীভূত হয়ে 'না'-এর উপরই জেদ ধরে রইলে। যে অহঙ্কার আর বিদ্বেষের বীজ তুমি বুনলে, যাকে দুঃশাসন ও শকুনি সিঞ্চন করে করে পুষ্ট করল, তার ফল বিনাশ ছাড়া আর কী হতে পারত? তাই তোমার মৃত্যুতে আমার কোনো শোক নেই, দুঃখ নেই। যেমন তুমি বুনেছ তেমনি তুমি ভুগেছ বা তার ফল পেয়েছ। কেন আর বৃথা প্রলাপ বকে যাচ্ছ?'

দুর্যোধন মৃদু হেসে নিস্পৃহভাবে কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলল: 'কৃষ্ণ! আমি বেদ পড়েছি। আমি প্রচুর দান-ধ্যান করেছি। আমি অনেক রকম যশস্বী কাজ করেছি। এই পৃথিবীকে আমি ন্যায় অনুসারেই শাসন করেছি, ভোগও নানারকম উপভোগ করেছি। সারা জীবনই আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান্। যদি আমার অতীত সুখময় হয়ে থাকে আমার ভবিষ্যৎও সুখময় হবে। যে-স্বর্গে আমার বন্ধু-বান্ধব এবং হিতৈষীরা পেঁছে গিয়েছেন, সেখানেই এখন আমি যাচ্ছি। সেখানে রাধেয়, যে আমার অত্যন্ত প্রিয়, তার সঙ্গে আমার দেখা হবে। অধীর হয়ে আমি তার মিলনের জন্য প্রতীক্ষা করছি। আমি ভাগ্যশালী ছিলাম এবং ভাগ্যশালী হয়েই স্বর্গে যাচ্ছি। এই দুঃখময় সংসারকে আমি পাণ্ডবদের জন্য ছেড়ে যাচ্ছি বা রেখে যাচ্ছি।

ভীম আমার মাথার উপর পা রেখেছিল, তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই। কিছুক্ষণ পরে তো কাক, চিল ও শকুনিরা আমাকে টুকরো টুকরো করে খাবে।'

দুর্যোধন যখন এই সব কথা বলল, তখন আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল। স্বর্গবাসীরা যখন দুর্যোধনের এই সব কথার অনুমোদন করল, তখন পাণ্ডব-দের মাথা হেঁট হয়ে গেল লজ্জায়।

কৃষ্ণের এতে রাগ হয়ে গেল। গর্জন করে তিনি বললেন: 'সবাই শোনো, কৌরবপক্ষের বড় বড় মহারথীরা নিশ্চয়ই ছল-কপটতার সাহায্যে নিহত হয়েছেন। ভীষ্ম পিতামহ প্রভৃতি সকলেই ক্ষত্রিয় বংশের শিরোভূষণ, মুকুটমণি ছিলেন। তাঁদের হারিয়ে দেওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। তাঁদের বধ অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ভীষ্মের ইচ্ছা-মৃত্যুর বর লাভ করা ছিল। পাণ্ডব-দের সব ধনুর্বাণ এবং দিব্য অস্ত্র এই সব মহারথীদের শক্তির কাছে একান্ত তুচ্ছ ছিল। ন্যায়-যুদ্ধে কি কখনও ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এবং দুর্যোধনের বধ সম্ভব ছিল বা হতে পারত? তা হলেও জন-কল্যাণের জন্য এঁদের সকলেরই মৃত্যু বাঞ্ছনীয় ছিল।

'পরিপূর্ণ সভাগৃহের মাঝখানে দ্রৌপদীকে নগ্ন বিবস্ত্র করবার প্রয়াস যে এক ঘোর পাপ কর্ম, তাতে সন্দেহ নেই। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে এই অন্যায় আমি ধ্বংস করবই। ভীষ্ম সে-সময় উপস্থিত ছিলেন কিন্তু মৌন ছিলেন। কেন মৌন ছিলেন? তিনি জানতেন যে পাপ হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি আঙ্গুল পর্যন্তও তোলেননি। দ্রোণ পাপের সাথী হয়ে গেলেন। কর্ণও তাই করলেন। সেই কারণে এই অন্যায় ঘোচাবার জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। এটা ঠিক যে আমি এঁদের সবাইকে যুদ্ধে ছল-

কপটতা দ্বারা মারিয়েছি। তার জন্য দোষী শুধু আমিই। কিন্তু এ সবই জন-কল্যাণের জন্যই, ধর্ম-সংস্থাপনের জন্যই আমি করেছি। আমার জীবনের প্রয়োজন ছিল সাধুদের রক্ষা করা, ধর্মের সংস্থান করা, এবং পাপের বিনাশ করার জন্য। সে-প্রয়োজন এখন পূর্ণ হয়েছে। চলো এখন এখান থেকে।'

ক্রোধই পাপের মূল

মহাভারত-যুদ্ধ তো এখানেই শেষ হল। কিন্তু কৃষ্ণ-অবতারের মূল কারণ বা উদ্দেশ্য এখনো সাধিত হয়নি, তা এখনো বাকি। অন্তিম অধ্যায়েরও এখন অন্ত হতে চলেছে। ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য অধর্মের পথ অবলম্বন করার দুঃসাহস একমাত্র কৃষ্ণের পক্ষেই সম্ভব ছিল। কর্মের গতি বড় গহন, জটিল, এই কথা বলা হয়ে থাকে; সেইজন্য সাধারণ লোক যে-কর্মকে অজ্ঞানের দরুণ-অধর্ম মনে করে থাকে তাই শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছিল ধর্ম। কেননা, ধর্মের সংস্থাপনই ছিল তাঁর জীবনের মূল উদ্দেশ্য বা হেতু। কৃষ্ণের কর্মে কোনো আসক্তি ছিল না। সেইজন্য সবরকম কর্মই তাঁর পক্ষে ধর্ম ছিল। কিন্তু এই ধরণের সর্বনাশা সিদ্ধান্ত বা মতবাদ যদি সব মানুষ নিজের জীবনে লাগাবার বা অনুসরণ করার প্রয়াস করে, তা হলে সে শুধু পাপের ভাগী হবে, কেননা একমাত্র অনাসক্ত মানুষই এই ধরণের সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন বা আচরণ করতে সক্ষম বা তার একমাত্র অধিকারী।

কৃষ্ণ যখন অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করলেন তখন তাকে অনাসক্তি যোগেরই উপদেশ দিলেন। যে অনাসক্ত সে না কারুর বধ করে, না করায়। কৃষ্ণের এই উক্তি ভাগবত ধর্মের সিদ্ধান্তেরই পুনরুক্তি।

দুর্যোধন প্রাণ বিসর্জন দেবার আগে, অশ্বত্থামা কর্তৃক দ্রৌপদীর পুত্রদের বিনাশের খবরও পেয়ে গেল। আশ্চর্যের কথা যে এই খবর শুনে তার আনন্দ হল এবং সে প্রসন্ন মনে প্রাণত্যাগ করল। দ্বেষের ফলে মানুষ ধর্ম ও অধর্মের ভেদও ভুলে যায়।

কৌরব-কুলে পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষের এখনো শেষ হল না। ধৃতরাষ্ট্রও এই বৈরিভাব ত্যাগ করতে পারলেন না। প্রকৃতির নিয়ম এমনই বিচিত্র যে পাপের দণ্ডটুকু পেলেই, মাত্র তা দিয়েই মানুষের পাপ-বুদ্ধি দূর হয়ে যায়

না, বরং পাপাচরণের জন্য দণ্ড পাওয়ার পরেও পাপ প্রজ্বলিত হয়েই থাকে। বিবেক এবং বিচারের দ্বারাই পাপ-বুদ্ধির অবসান ঘটে থাকে। কিন্তু এত দুঃখকষ্ট পাওয়ার পরেও ধৃতরাষ্ট্র এই বিবেক থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেল।

দুর্যোধনের মৃত্যুর পর সব মৃত জনের যখন দাহ করা হয়ে গেল, তখন যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। ধৃতরাষ্ট্র তো ক্রোধ এবং বিদ্বেষের দরুণ আগুনের মত উত্তপ্ত হয়েই ছিলেন কিন্তু যখন যুধিষ্ঠির রাজা হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে এসে প্রণাম করলেন, তখন অন্তত দেখাবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন। ভীমও যুধিষ্ঠিরের মত ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদন করার জন্য এগিয়ে আসতে চাইছিল কিন্তু কৃষ্ণ তাকে আটকে দিলেন। কৃষ্ণ জানতেন যে ধৃতরাষ্ট্র ভীমকে কখনো ক্ষমা করার পাত্র নন, সেইজন্য কৃষ্ণ এখানেও চালাকি করলেন। কুস্তির আখড়াতে, মল্লশালায় ভীমের একটি লোহার মূর্তি তৈরী করা ছিল, যার উপর গদা-প্রহার করে দুর্যোধন রোজ অভ্যাস-অনুশীলন করত। কৃষ্ণ সেটিকে তুলে আনলেন এবং ভীমের বদলে ধৃতরাষ্ট্রের বাহুপাশে সেই মূর্তিটিকেই এগিয়ে দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাকেই ভীম মনে করে আলিঙ্গন করে সেই লৌহ-মূর্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললেন।

কিন্তু এই ঘটনার পর ধৃতরাষ্ট্র, এই ভেবে যে সে এক ভীষণ পাপকর্ম করে ফেলেছে, অত্যন্ত বিকল হয়ে চিৎকার করে বিলাপ করে উঠল: 'হায়! আমি রাগের চোটে ভীমকে মেরেই ফেললাম।' যখন কৃষ্ণ দেখলেন ধৃতরাষ্ট্রের রাগ পড়ে গিয়েছে, তখন ধৃতরাষ্ট্রকে বাস্তব ঘটনা জানিয়ে বললেন: 'মহারাজ! আমি আপনার রাগকে ঠিকই চিনে নিয়েছিলাম, এইজন্য ভীমের বদলে আমি ভীমের লৌহ-মূর্তিই আপনার বাহুপাশের দিকে ঠেলে দিয়েছিলাম। আপনি শান্ত হোন এবং ভবিষ্যতের জন্য এই ক্রোধ-বুদ্ধি ত্যাগ করুন। পাণ্ডবদের নিজের সন্তান মনে করে তাদের সঙ্গে পিতার মত ব্যবহার করুন।'

ধৃতরাষ্ট্র এবার শান্ত হয়ে গেলেন। বললেন: 'আমি নিজের ভুল এখন বুঝতে পারছি এবং সমস্ত পাণ্ডব বন্ধুদের আমি আলিঙ্গন করতে চাই।' তখন ভীমও কাছে এল এবং ধৃতরাষ্ট্র প্রেমভরে তাকে আলিঙ্গন করলেন। তেমনি অর্জুন, নকুল, সহদেবকেও তিনি আলিঙ্গন করলেন।

কিন্তু গান্ধারীর ক্রোধ তখনও যেন টগবগ করে ফুটছিল। তিনি সমস্ত পাণ্ডব আত্মীয়দের শাপ দিতে চাইছিলেন। তার উদ্দেশ্য ব্যাসদেব বুঝে গেলেন। সেইজন্য তাঁর কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন: 'মা' ক্রোধই পাপের মূল, তা ত্যাগ করে তুমি শান্ত হয়ে যাও। তোমার ছেলে পাপের বশীভূত হয়ে বিদ্বেষের দরুণ এই কুকর্ম করেছে, তারই ফল এই;

'যখন দুর্যোধন যুদ্ধের আগে তোমার কাছ থেকে আশীর্বাদ চাইতে এসেছিল, তখনই তুমি বলেছিলে, পুত্র! ধর্মেরই জয় হবে। তুমি জানতে যে দুর্যোধনের আচরণ ছিল ধর্মবিরোধী এবং তুমি জানতে যে তার পরাজয় হবে। তুমি যা জানতে তাই ঘটেছে, সেইজন্য এখন ক্রোধ ত্যাগ করো, পাণ্ডব ক্রোধের পাত্র নয়।'

গান্ধারী ব্যাসদেবের কথা শুনে বললেনঃ 'বাবা! আমি পাণ্ডবদের উপর রাগ করিনি। পাণ্ডবদের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছিল এবং আমার পুত্রই তার জন্য দোষী ছিল। কিন্তু ভীম ছল করে দুর্যোধনকে মারল, দুঃশাসনের রক্ত পান করল, এ যে বড় নৃশংস কর্ম। তার জন্যই আমার এ ক্রোধ।'

এই শুনে ভীম গান্ধারীর কাছে এসে অত্যন্ত বিনম্রভাবে বলতে লাগলঃ মা! এ কথা সত্য যে আমি ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে দুর্যোধনকে হারিয়েছি কিন্তু আর কোনো পথ ছিল না। ধর্ম-যুদ্ধে দুর্যোধনকে ইন্দ্রও মারতে পারতেন না। তিন লোকেই তার সমকক্ষ যোদ্ধা কেউ ছিল না। সে অজেয় ছিল। কিন্তু সে আমাদের সবাইয়ের সঙ্গে অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করেছিল। সেজন্য তাকে মারাই উচিত ছিল। আমি তার উরুতে আঘাত করেছিলাম, তা ছিল নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু মা! যখন সে দ্রৌপদীকে অপমান করেছিল, তখনই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে তার উরুভঙ্গ করে দেব। কৌরব-সভায় যখন দ্রৌপদী অপমানিত হল, তখনই আমি তার উরু ভেঙে দিতাম কিন্তু আমাকে যুধিষ্ঠির আটকে দিয়েছিলেন।

গান্ধারী বললেনঃ 'ভীম! আর সব ব্যাপারের জন্য তোমাকে ক্ষমা করছি কিন্তু তুমি দুঃশাসনের রক্তপান রূপ নৃশংস কর্ম কেন করলে?' ভীম বললঃ 'মা! আমি এক বিন্দুও রক্ত পান করিনি, শুধু ঠোঁট দিয়ে স্পর্শমাত্র করেছিলাম।'

গান্ধারী এই সব শুনে ভীমকেও ক্ষমা করে দিলেন। এর পর যুধিষ্ঠির হাত জোড় করে সম্মুখে এলেন, তখন গান্ধারী তাঁর উপরও রেগে গেলেন। রাগের চোটে শাপ না দিয়ে বসেন, এইজন্য মনকে সংযত করে গান্ধারী মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। চোখ কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল কিন্তু তার নীচে দিয়ে যুধিষ্ঠিরেব নখের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়েই গেল এবং তার ফলে যুধিষ্ঠিরের নখ কালো হয়ে গেল। এই সব ঘটনা দেখে অর্জুন তো গান্ধারীর কাছে আসতেও সাহস করল না। গান্ধারীর তপস্যা ও তেজ এত বিশিষ্ট ও সর্ববিলক্ষণ ছিল যে তাঁর শাপে এদের সবাইকে ভস্ম করে দেবার শক্তি ছিল।

সব শেষে দ্রৌপদী গান্ধারীর চরণ স্পর্শ করল এবং তাতে গান্ধারী একে-

বারে গদগদ হয়ে গেলেন। দ্রৌপদীকে অনেক রকমে সান্ত্বনা দিয়ে তাকে আশীর্বাদও করলেন।

কিন্তু যখন কৃষ্ণ কাছে এলেন তখন আবার হঠাৎ গান্ধারীর ক্রোধের সমুদ্রে যেন ঝঞ্ঝা-তুফান এসে গেল। ক্রোধে অভিভূত হয়ে তিনি বললেনঃ 'কৃষ্ণ! এই সমস্ত ধ্বংস বিনাশ তোমার যথেচ্ছাচার ও ত্রুটির জন্যই হয়েছে। তুমি যদি চাইতে তা হলে এই গৃহ-কলহ কখনও হত না। তুমি পক্ষপাতশূন্য ছিলে না। শোনো, যেমন তোমার বেপরোয়াগিরির জন্য কৌরব এবং পাণ্ডব নিজেদের মধ্যে লড়াই করে নাশ হয়ে গেল, তেমনি আজ থেকে ছত্রিশ বছর পরে তোমার পরিবারের লোকেরাও নিজেদের মধ্যে লড়ে মরবে। এই আমার শাপ। এ শাপ মেটানও যাবে না।'

গান্ধারীর কথায় কৃষ্ণের ক্রোধ জাগল না, বরং স্মিতহাস্যে তিনি তাঁকে বললেনঃ 'মা! তুমি এই শাপ দিয়ে আমারই কাজ করে দিয়েছ। যে-সব শক্তিমানদের জন্য ন্যায়ধর্ম হ্রাস পাচ্ছিল, তারা সবাই এই যুদ্ধে শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বৃষ্ণি বংশের শক্তিও বাঞ্ছনীয় নয়। তাদের দাবিয়ে রাখার মত কোনো শক্তিমান লোক এ সময়ে দুনিয়ায় নেই। তাই এদের ক্ষয় একমাত্র গৃহ-কলহেই হতে পারে। আমাকে এই সব চিন্তা, জল্পনা-কল্পনা কষ্ট দিচ্ছিল। এখন তুমি এই শাপ দিয়ে আমার কাজ সোজা ও শেষ করে দিলে।

'কিন্তু গান্ধারী! আমার বেপরোয়ামির কথা উল্লেখ করে তুমি আমার প্রতি ন্যায়-বিচার করোনি। আমি কৌরবদের সভায় শান্তিদূত হয়ে এসে-ছিলাম, তখন তুমি আমাকে কী সাহায্য করেছিলে? তোমার ছেলে পাপ-কর্মে লিপ্ত ছিল, তার মৃত্যু বাঞ্ছনীয় এবং অবশ্যম্ভাবী ছিল। তুমিও দুর্যোধনকে এই কথাই বলেছিলে যে ধর্ম তোমার সঙ্গে নেই। এইজন্য জয় পাণ্ডবদেরই হবে এবং তাই হয়েছে। তোমার ক্রোধ এবং আমাকে তিরস্কার এ সমস্তই অপ্রাসঙ্গিক। আমি বেপরোয়াগিরি করিনি বরং যুদ্ধ আটকাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু তোমার ছেলে অহংকারের বশে পাপ থেকে নিবৃত্ত হল না, তারই পরিণাম হল এই।' কৃষ্ণের এই কথা শুনে গান্ধারী চুপ করে রইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রয়োজন এখনো বাকী ছিল। তা-ও শেষ হল ছত্রিশ বছর পরে প্রভাস-ক্ষেত্রে।

মুক্তি অবশেষে

ছত্রিশ বছর পরে যাদবদের গৃহ-কলহ আরম্ভ হল এবং সমস্ত যদুকুলের ধ্বংস হয়ে গেল। এ কলহ সাধারণ কথা নিয়েই আরম্ভ হয়েছিল। কৃতবর্মা এবং সাত্যকি দুজনেই মদ্যপান করে মদমত্ত বেহুঁস হয়ে গিয়েছিল, পরস্পর কিছু কথা কাটাকাটি হল এবং একজন আর একজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এর পর কেউ সাত্যকীর আবার কেউ কৃতবর্মার পক্ষ নিল এবং দলবদ্ধ হয়ে একে অপরকে মারতে লাগল। এই নিজেদের মধ্যে সংগ্রামেই সারা যদুকুল শেষ হয়ে গেল।

বলরাম এই ব্যাপারে অত্যন্ত বেদনা বোধ করলেন। তিনি সমুদ্রতটে চলে গিয়ে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুতি করতে লাগলেন।

কৃষ্ণও ভাবতে লাগলেন, আমার জীবনের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এবার আমার চলে যাওয়া উচিত।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। কৃষ্ণ ভাবছিলেন যে আমার দেহত্যাগের সময় এসে গিয়েছে এবং এই কথা মনে আসতেই অতীত দিনের সব স্মৃতি জেগে উঠল। মনের আয়নায় পিছনে ফেলে আসা সব ছবি একের পর এক ফুটে উঠতে লাগল। গোকুল, শৈশবকাল, যশোদা, নন্দ, তৃণাবর্ত, অঘাসুর, গিরি গোবর্ধন, কালিয়দমন, স্নেহশীল গোপ-গোপীরা—এই সব মনশ্চক্ষুর সামনে এক এক করে প্রকট হতে থাকল। তরঙ্গের মত প্রত্যেকটি ঘটনা মনশ্চক্ষুর উপর ছাপ ফেলে যাচ্ছিল। একটি এল, আবার চলে গেল। আবার দ্বিতীয় আর একটি এল, এবং সেটিও চলে গেল।

আবার মথুরা। ভীত ত্রস্ত জনগণকে কংসের অত্যাচার থেকে মুক্ত করলেন।

জ্ঞানচক্ষু বা অন্তর্দৃষ্টির সামনে আবার নতুন নতুন দৃশ্য আসতে থাকল।

এবার পাণ্ডবদের ছবি সামনে এল। তাঁদের জীবনের দুঃখময় দৃশ্য সম্মুখে আসতে লাগল।

আবার যুদ্ধ। পৃথিবীর সব ক্ষত্রিয়দের নাশ। দুর্যোধনের মৃত্যু। গান্ধারীর শাপ।

গান্ধারীর শাপের ফল দেখার জন্য বেঁচে থাকা দরকারই ছিল। অভিমন্যুর সন্তান গর্ভে ছিল, তাকে রক্ষা করাও প্রয়োজন ছিল।

ভাবতে ভাবতে শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলে স্মিত হাস্যের রেখা ছড়িয়ে পড়ল। অভিমন্যুর সন্তানকে রক্ষা করা বড় দুষ্কর কাজ ছিল। কিন্তু তা-ও সফল হল। পাণ্ডবদের শেষ পর্যন্ত রক্ষা করলেন। আর বাকি কী থাকল? এবার যাত্রা শেষ।

হ্যাঁ, একটি চাওয়া তখনও থেকে গেল। যাবার আগে অর্জুনের সঙ্গে দেখা হওয়াটা দরকার। সেটা তো এখনও বাকি রয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, তা-ও অসম্ভব নয়। আবারও স্মিত হাস্য। মনের তরঙ্গকে অর্জুনের মন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে দুই মনকে এক করা মোটেই অসম্ভব নয়। কৃষ্ণ শান্ত হয়ে বসে গেলেন।

অর্জুন হস্তিনাপুরে ছিলেন। কৃষ্ণের মনের তরঙ্গ অর্জুনকে জাগাল। কৃষ্ণের মন অর্জুনের মনে প্রবেশ করে একরস হয়ে গেল। বীণার দুটি তার যখন একই স্বরে গুঞ্জন করে, তখন দুটিতে একরকমেরই ঝংকার উঠে থাকে। এক্ষেত্রেও তাই হল। কৃষ্ণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

অর্জুন হস্তিনাপুরে নিজের বাসভবনে বসে ছিল। আকস্মিকভাবে তার কৃষ্ণের কথা মনে এল। মনে আসতেই ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠলঃ 'অর্জুন! শুয়ে পড়ো, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।' অর্জুন শুয়ে পড়ল। ঘুমন্ত অবস্থায় কৃষ্ণের মন অর্জুনের মনে প্রবিষ্ট হয়ে গেল। 'অর্জুন! তোমার মনে আছে যে আমি বলছিলাম, আমরা সবাই এক একটি বিশেষ কারণ বা প্রয়োজন নিয়ে জন্মাই এবং সেই প্রয়োজন শেষ হলেই আমরা সবাই চলে যাব।' অর্জুন বললঃ 'প্রভু! আমার ভাল মতই মনে আছে। যখন আমার রথ পুড়ে ছাই হয়ে গেল সেই সময়ই আপনি এ কথা বলেছিলেন।' 'অর্জুন! আমার জীবনের কর্ম এখন শেষ হয়েছে, তাই আমি যাচ্ছি। অর্জুন! প্রত্যেক প্রাণীর, তা সে মানুষই হোক বা পশু-পক্ষীই হোক, এই হচ্ছে নিয়ম। এই জীবন এক অদ্ভুত তাৎপর্য পূর্ণ যাত্রা। যাকে আমরা জীবন বলি, তা অর্থহীন বা নিরর্থক নয়। এর বিশেষ কোনো অর্থ আছে। কিন্তু প্রাণী যখন নিজের ঘরে পৌঁছে যায় তখন তার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। তার জীবনের তাৎপর্যও শেষ হয়ে যায় বা ফুরিয়ে যায়। তাই তার

যাওয়াও অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রকৃতির এই অলঙ্ঘ্য নিয়ম সব প্রাণীর জন্যই সুব্যবস্থিত।'

অর্জুন তখন বলল: 'প্রভু! এ কী বলছ? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।' কৃষ্ণ বললেন: 'অর্জুন! ধৈর্য ধরো। শীগ্‌গিরই বুঝে যাবে। যাবার আগে আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছিলাম। এখন আমরা দুজনে মিলিত হয়ে নিলাম। আমার মনস্কামনা পূর্ণ হল। আমার সন্তুষ্টি, পরি-তৃপ্তি হয়ে গেল।'

কৃষ্ণের মুখারবিন্দ তখন তেজে উদ্ভাসিত ছিল। সে-সময় তাঁর যেমন মুখখানি ছিল, অর্জুন স্বপ্নেও ঠিক তেমনই দেখলেন। দুই অভিন্ন বন্ধু মিলিত হয়ে নিলেন। মনও তাঁদের অভিন্নই ছিল। বিদায় নেওয়া শেষ হল।

এবার কৃষ্ণ ধীরে ধীরে উঠে একান্ত নির্জন স্থান খুঁজতে চললেন। তিনি সমাধিস্থ হয়ে যোগীর মত দেহত্যাগ করতে চাননি। সাধারণ মানুষের মত প্রাণ ত্যাগ করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

কৃষ্ণ একটি গাছের তলায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। একজন ব্যাধ কাছের জঙ্গলে শিকার করছিল। দূর থেকে সে কৃষ্ণের শায়িত দেহটি দেখল। পীতবসন দিয়ে ঢাকা কৃষ্ণকে সে কোনো হরিণ বলে মনে করল এবং তাকে লক্ষ্য করে একটি বাণ ছুঁড়ল। সেটি কৃষ্ণের পায়ের তলায় গিয়ে বিঁধল এবং ভিতরে শরীরের মর্মস্থলে গিয়ে ঢুকে গেল। তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগল।

ব্যাধ তীর ছুঁড়েই কৃষ্ণের দিকে দৌড়ে গেল কিন্তু যখন গিয়ে দেখল যে যাকে সে হরিণ মনে করেছিল এবং যাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়েছিল, সে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তখন সে অত্যন্ত ভয়ে ভীত হয়ে কৃষ্ণের চরণে লুটিয়ে পড়ল এবং ক্ষমা চাইতে লাগল। ব্যাধ অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত, ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল কিন্তু কৃষ্ণ তাকে বললেন: 'ভাই বন্ধু! ভয় পেয়ো না। তুমি আমার মঙ্গল সাধন করেছ। আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, আমার যাবারই ছিল। কিন্তু ভাবছিলাম কি করে যাই? তুমি আমার কাজ সম্পূর্ণ করে দিয়েছ। ধন্যবাদ।'

দেহত্যাগ হয়ে গেল। যে অভিপ্রায়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, সেই অভি-প্রায়, সেই লক্ষ্য, সেই কারণ, সেই উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে। যেখান থেকে এসেছিলেন, সেখানেই গেলেন। কৃষ্ণের জীবন শেষ হল। পৃথিবী থেকে এক অদ্ভুত মহান্ চরিত্র চলে গেলেন। সাধকদের জন্য কৃষ্ণের জীবন এক উৎকৃষ্ট সাধন রেখে গেল।

কৃষ্ণ-বিসর্জনের পর পট-পরিবর্তন হল। দ্বারিকাকে সমুদ্র গ্রাস করে নিল।

যখন অর্জুন দ্বারকায় পৌঁছুল তখন আর কৃষ্ণকে পেল না।

পাণ্ডবদের পক্ষে সংসার এখন নিষ্প্রাণ ও নীরস হয়ে গেল। জীবনও অর্থশূন্য হয়ে গেল। সেই জন্য তারাও হস্তিনাপুর থেকে স্বর্গারোহণের জন্য প্রস্থান করলেন।

সংসার কৃষ্ণময়

সংসার-যাত্রা এক অত্যন্ত দুস্তর প্রয়াস। জীবনে অনেকরকম সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। ধর্ম-সংকট উপস্থিত হয়। এটা করি না ওটা করি—এইরকম প্রশ্ন বুদ্ধির সামনে এসে উপস্থিত হয় নির্ণয়ের জন্য। গীতাচার্য বলেছেনঃ 'কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ' 'গহনা কর্মণো গতিঃ'।

উপনিষদের ঋষিরাও বলেছেনঃ 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।'। জ্ঞানীরা এই পথকে দুর্গম বলেছেন। যখন জ্ঞানীরাও সংশয়ে পড়ে যান, তখন সাধারণ মানুষের বুদ্ধির কাছে এ কত কঠিন, তার কি কোনো হদিশ বা ঠিকানা আছে?

এই দুর্গম পথকে সুগম করা যায় কি করে? কোনো উপায় আছে? মহাপুরুষদের জীবন-চর্যা অধ্যয়ন করা, তাকে মনন করা এবং তাঁদের আদর্শকে কাজে লাগানো, এই হল এক অব্যর্থ ঔষধ। সংকটকালে মহাপুরুষেরা কিরকম আচরণ করেছিলেন, তা জেনে আমাদেরও সেই প্রসঙ্গে কী নির্ণয় করা উচিত, তার পথের নির্দেশ মিলে যায়।

মহাভারত এক অদ্ভুত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মানুষের মনের অনুপম চিত্র ভরা আছে।

মহাভারত আমাদের বলে যে ঈশ্বরের এই সৃষ্টিতে না আছে কোনো খাঁটি নির্ভেজাল শুদ্ধ দেবতা, না আছে নিরেট অমিশ্রিত দৈত্য। জড়-চেতনের এই সৃষ্টিতে গুণ-দোষ দুইয়েরই সংমিশ্রণ আছে। এইটি এইরকম বুঝেই আমাদের যাত্রা সম্পন্ন করতে হবে।

ভীষ্ম পিতামহ মহান্ পুরুষ ছিলেন কিন্তু দ্রৌপদীর অপমানে তিনি মৌনই রয়ে গেলেন। এই কলঙ্ক তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে গেল চিরতরে। কাশিরাজের কন্যাদের তুলে নিয়ে চলে এলেন, যা বর্তমান সংস্কৃতির দৃষ্টিতে

নিয়ম বিরুদ্ধ। তার উপরও একটি তিরস্কৃতা অপমানিতা কন্যার অসন্তোষের দরুণ পিতামহকে শিখণ্ডীর হাতে মরতে হল।

ভীষ্ম অজ্ঞানী ছিলেন না। ধর্মের পূর্ণ জ্ঞান তাঁর মধ্যে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে এই সব করতে হল। কেন? তিনি বললেন যে মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারুর দাস নয়। কিন্তু তাঁর এই উক্তিতে কেউ সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

আচার্য দ্রোণও ধর্মের প্রতিমূর্তি ছিলেন। কিন্তু মন তাঁর পাণ্ডবদের দিকে আর শরীর দুর্যোধনের পক্ষে। কর্ণকেও মন্দের সহযোগিতা করতে হল।

কর্ণও ধর্মে অনভিজ্ঞ ছিল না। সে বীর ছিল, উদার ছিল, দাতা ছিল, জ্ঞানী ছিল। কথাতেও ধনী ছিল। ভগবানের ভক্ত ছিল। কৃষ্ণের উপর তার পূর্ণ আস্থা ছিল। তা সত্ত্বেও দুর্যোধনের দুষ্কর্ম সমূহে তার যোগ ছিল।

বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি ছিলেন কিন্তু মেনকার কাহিনী তাঁর জীবনের উপর একটি ছাপ রেখেই গেল।

দুর্বাসা মহাপুরুষ হওয়া সত্ত্বেও ক্রোধের মূর্তি ছিলেন। নারদের তরল-মতি ফষ্টিনষ্টি তো জগৎ প্রসিদ্ধ। পরশুরামকে অবতার বলে গণ্য করা হয়েছে কিন্তু তিনি পিতার আজ্ঞায় মাতাকে বধ করে ফেললেন। তিনি পুনর্জীবিত হয়ে গেলেন বটে কিন্তু বধ তো তিনি করেই দিয়েছিলেন।

দেবতাদের রাজা ইন্দ্রও কলঙ্ক থেকে মুক্ত ছিলেন না। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা বলতে হল। শ্রীকৃষ্ণ তো 'যেন তেন প্রকারেণ', যে-কোনো উপায়ে কৌরবদের নাশ করার জন্য সর্বদা উদ্যতই ছিলেন।

এই সব উদাহরণ থেকে আমাদের এই শিক্ষাই মেলে যে মহাপুরুষদের গুণকেই গ্রহণ করা উচিত। যে-সব দোষ আমাদের নজরে পড়ে, তাদের উপেক্ষা করা উচিত।

সহিষ্ণুতা হচ্ছে এক দৈবী সম্পদ। এরই নাম ক্ষমা। যে অসহিষ্ণু সে ধর্ম থেকে বিমুখ। অহঙ্কারের বশীভূত হয়েই মানুষ অসহিষ্ণু হয়ে থাকে। কাউকেই তিরস্কার করা পাপ। এইজন্য মহাপুরুষদের যে-সব দোষ আমাদের চোখে পড়ে, তা উপেক্ষা করাই হচ্ছে ধর্ম।

সময়ে সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে সোজা পথ থেকে সরে আসতে হয়েছে। কেন? ন্যায় এবং ধর্মের রক্ষার জন্য। সাধুদের ক্লেশ দূর করার জন্য। অসাধুদের শেষ করার জন্য। ভূতবর্গের বা জীবগণের হিতের জন্য সব কিছু করা হল কিন্তু অনাসক্ত হয়ে। এ পথ বড় কঠিন, কেননা অনাসক্ত হয়েই তবে এই কঠিন পথকে অবলম্বন করা সম্ভব। এ যেন খাঁড়ার ধারের উপর দিয়ে হাঁটা

ব' চলার মত কাজ। কিন্তু এই-ই তো এই সব মহাপুরুষদের জীবন থেকে শিখবার জিনিস।

মহাভারতের পাত্রদের জীবন চরিত্র এবং সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণের জীবন গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে, তার মনন করলে এবং তাদের আদর্শ গুলিকে আচরণ করলে, জীবনে প্রতিফলিত করলে মানুষের কাছে এই দুর্গম পথ সুগম হয়ে যায়।

ব্যাসদেবের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত মানুষকে জন-কল্যাণের জন্য কর্মমার্গে প্রবৃত্ত করানো। কর্ম এমন হোক যা 'সর্বভূতহিতে রতাঃ' হোক। আমাদেরও এই স্বাধ্যায়ে বা শাস্ত্রালোচনায় এই-ই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

'শ্রীকৃষ্ণ' এই শব্দটি আত্মার পর্যায়বাচক। আত্মা এবং কৃষ্ণ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সর্বভূতে স্থিত এই আত্মা অবিভক্ত, সর্বত্র আছেন এবং একই আছেন। এইজন্য কৃষ্ণ দেবকীনন্দন নন কিন্তু আমার আপনার সকলের তিনি আত্মা। আত্মা এবং পরমাত্মা এক। দেবকীনন্দনের জন্মের আগেও শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অর্থাৎ আত্মা এবং পরমাত্মা ছিলেন। তিনি মহাভারতের কালেও ছিলেন, আজও আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন কারণ তিনি অজর, অমর, অনাদি এবং সর্বত্র আছেন।

এইজন্য আমরা সবাই কৃষ্ণ। আমাদের পূর্বে যাঁরা জন্মেছেন, সেই পূর্বপুরুষরাও কৃষ্ণ ছিলেন। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম, সন্তানরাও কৃষ্ণই হবেন। এই সমস্ত সংসারই কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু নয়।

যেহেতু আমরা সবাই কৃষ্ণ, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের জীবন-চরিত আমাদের সকলের জীবন-চরিত। মালবীয়জি যখন বলেছিলেন 'জীবন-চরিত পড়তে হয় তো ভাগবত পড়ো' তখন তাঁরও বলার উদ্দেশ্য ছিল এই-ই যে এই সব মহাপুরুষদের জীবন-চরিত আমাদের জীবন-চরিত থেকে আলাদা নয়।

সমুদ্রের তরঙ্গ ছোট হোক বা বড়, স্বচ্ছ শুভ্র হোক বা অস্বচ্ছ নোংরা মলিন, শেষ অবধি তা তো সমুদ্রই। একজন মানুষ সাধু আর একজন অ-সাধু কিন্তু দুই-ই ঈশ্বরের অন্তর্গত।

নরসিংহ মেহতা বলেছেনঃ

রকম রকম গয়না গড়ালে তাদের অনেক নাম, অনেক রূপ হয়ে থাকে কিন্তু শেষে তো সব গয়নাই সোনা ছাড়া আর কিছু নয়। এই সব জীবন-চরিত থেকে আমাদের এইটিই শিখবার।

যা কিছু আমি লিখলাম এ আমার বুদ্ধির কোনো নতুন উপলব্ধি বা দৃষ্টিভঙ্গী নয়। যেমন আচার্য ঋষি বলেছেনঃ 'শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে', অর্থাৎ এ-সব আমি ধীর পুরুষদের কাছ থেকে শুনেছি, যাঁরা

আমাকে এ-সব বুঝিয়েছেন। এইজন্য যা কিছু আমি পড়েছি এবং যেমন আমি বুঝেছি তেমনিই লিখেছি।

আত্মা (কৃষ্ণ) এবং পরমাত্মা সর্বত্র সর্বব্যাপক অনাদি অজর ও অমর। দেশ ও কালের দ্বারা তা অবাধিত। এইজন্য মহাপুরুষদের কথা এই বিশ্বেরই কথা, এইরূপ বুঝে আমি এখন উপসংহারে সেই কৃষ্ণেরই বন্দনা করি, যিনি সর্বত্র আছেন, আমাতে আছেন, আপনাতে আছেন।

"কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্"